গোমতী গঙ্গা

শ্রীবাসব

বিশ্ববাণী
১১।এ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী
১১।এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী ঃ
গণেশ বসু

॥ আট টাকা ॥

বাবার স্মৃতি পূজায়—

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

দেওয়ান বাড়ি

নাজমা বেগম

আনন্দী কল্যাণ

একমুঠো মাটি

কত বিনোদিনী

সুন্দর পাহাড়ী ঈস্ট

দূর কিনারে

একাকার

গোমতী গঙ্গা

Gomati Ganga
A Novel
by
Sri Basab
8·00

॥ এক ॥

১৯২০ সালের বড়দিন।

তখনকার কলকাতার চেহারার সঙ্গে এখনকার কলকাতার যেমন কোন মিল নেই,—তেমনি তখনকার বড়দিনের সঙ্গে এখনকার বড়দিনের একান্ত গরমিল। গোঁজামিল দিয়েও তাদের কোনদিক থেকে মিল করা চলে না। তুলনা করাও চলে না। বড়দিনের কলকাতা ছিল বিশাল ভারতের আনন্দোৎসবের স্বর্গোদ্যান। সারা ভারতের দেশ বিদেশের ধনী রাজা মহারাজা, নেটিভ প্রিন্সরা এসে কলকাতায় ভিড় জমাত। কুলিন হোটেল গুলো যাত্রিতে ভরে যেত। নেটিভ এস্টেটের বৃহদাকার ঝকঝকে মোটরে কলকাতার পথ ঘাট থৈ থৈ করত। সারা ভারতটা যেন কলকাতার পথে হেসে খেলে বেড়াত। বরোদা, গাইকোয়ার, হায়দরাবাদ, গোয়ালিয়র, ধেনকেনল, মায় নেপাল পর্যন্ত। কুচবিহার, পঞ্চকোট, ময়ুরভঞ্জ, বর্দ্ধমান, ঝাড়গ্রাম তো আমাদের ঘরের লোক।

ডিসেম্বরের কলকাতা ছিল ভারতের প্রমোদ তীর্থ। উৎসব আয়োজনের বৈচিত্র্যে প্রজাপতির মত পাখা মেলে দিত। সার্কাস, থিয়েটার, ঘোড়-দৌড়, কার্ণিভ্যাল, নাচ, গান, তামাসা যত কিছু পর্ব, মেলা মায় রাষ্ট্রিয় আন্দোলন অধিবেশন সবই এই বড়দিনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় জমে উঠত। যেখানে যত ফাঁকা মাঠ-ময়দান আর পোড়ো জমি আছে সব তাঁবুতে আর উৎসব মণ্ডপে ভরে যেত। চৌরিঙ্গীর হোটেল অঞ্চল, দোকান পসারী আর হগ

মার্কেটের তো কথাই নেই। একটা মহোৎসবের মহা আয়োজনে সব মেতে উঠত।

খৃষ্টের জন্মোৎসবকে ঘিরে বড়দিন। উৎসবের নায়ক নায়িকা প্রধানতঃ সাহেব মেম ও খৃষ্টান সম্প্রদায় হলেও বড়দিন ছিল সর্বজনীন উৎসব। আপিস আদালত, স্কুল কলেজের ছিল দীর্ঘ ছুটি। সর্বসাধারণে তাই যোগ দিত এই বড়দিনের আনন্দোৎসবে। উপভোগ করতো শীতের মোলায়েম আনন্দমুখর দিনগুলি। খৃষ্টের জন্মোৎসব সার্বজাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছিল ইংরেজের আমলে।

ইংরেজের সঙ্গেই সে-সব আড়ম্বর আয়োজন শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস কিন্তু এখনো ভুলতে পারেনি ভারতবাসী। এখনো বড়দিনের হাওয়া এসে গায়ে লাগে। এখনো উৎসবের লীলাভূমি হগ মার্কেটে ছোটে ছেলেদের জন্য ছুটো কেক্ কিনতে। ফুলের স্টলে ঘোরাঘুরি করে চোখ জুড়োতে। চোখ কিন্তু জুড়োয় না। জ্বালা করে। মনকে সান্ত্বনা দেয় স্বাধীনতা পেয়েছি বলে।

দেশের চেহারা গেছে বদলে। ও-সব বিলাসব্যসন আর চলবে না। চোখকে আরাম দেবার কথা ভাবতে গেলে, স্বাধীনতার অর্থ থাকে না যে। সৌন্দর্য পিপাসা নাকি স্বাধীন মনের অন্তরায়। অগ্রগমনের বাধা। সৌন্দর্য লাঞ্চন স্বাধীন দৃষ্টির লাঞ্ছনা। তাইত দেশের সৌন্দর্যভূমিকে সমূলে ধ্বংস করে একে একে উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে।

দেশ হবে কারখানা।

নতুন যুগের নতুন মানুষের চোখে কারখানাই হবে দেশের সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের পিপাসায়, চিত্তরহস্য মেটানোর জন্য তো রাষ্ট্রের সম্পদকে অপচয় করা চলে না। উদ্যান ভ্রমনের বিলাস মেটানোর জন্য কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখবার জন্য লালদিঘীর বৃহৎ ভূভাগকে অনর্থক ফেলে রাখার কোন অর্থ হয় নাকি ? তাইতো সেখানে ট্রামের লাইন পাতা হল। মন্ত্রীদের

আক্ষেপের আবেগে হয়তো ক্ষুণ্ণ হলো সাহিত্য রস। মার্জনা করবেন।

স্বাধীন যুগের আলো থেকে চলুন আমরা ফিরে যাই অতীত ১৯২০ সালের অন্ধকারে। ইংরেজ আমলের আনন্দ-মথিত কলকাতার ডিসেম্বরে। আমাদের কাহিনীর পটভূমিতে।

লক্ষ্ণৌ-এর সার্থকনামা গায়িকা কেশর বাঈ এল বড়দিন উপলক্ষে কলকাতা বেড়াতে। নিছক আনন্দ ভ্রমন এবং কিছুটা বিশ্রামের পারিকল্পনা নিয়ে। অর্থাৎ কর্মজীবন থেকে দূরে সরে এল ক-টা দিন হাঁপ ছাড়তে। উঠল এসে বন্ধু সমব্যবসায়ী এবং সগোত্র রতন বাঈ-এর বাড়িতে।

রতন তার বাল্যের বন্ধু। সমবয়সী এবং দূরে থাকলেও তার জীবনের বাস্তব চেহারাটা তার কাছে অস্পষ্ট নয়। দূরে থেকেও তাদের অন্তরঙ্গতার সুর কেটে যায়নি। তাদের চিরদিনের অভ্যাসে কোথাও ছন্দহানি হয়নি।

রতন খুশী হল কেশরকে পেয়ে।

কেশর মুক্তির স্বাদে আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিশ্রামে শরীর আনল শিথিল করে ফুটন্ত রজনীগন্ধার পাপড়ির মত।

রতন তারপানে চেয়ে হাসতে বললে, টাকার কুমীর হয়ে রূপনদীতে সাঁতার কাটছিস! ব্যাপার কী বলতো, বয়েস যতো বাড়ছে ততই যেন রূপ তোর ঢেউয়ে উঠছে।

হাসল কেশর। স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে মুখ ভরে বললে, আমার যে খরচ নেই। না টাকার, না রূপের। যৌবন যে আমার স্থির হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়সের স্রোতে তো ভেসে যাচ্ছে না।

—যাবে কেমন করে? এদেহ ছেড়ে সরে যাওয়া কি এতো সহজ না কি?

রতনের মুখের হাসি নিভে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, পূর্বজন্মের সুকৃতি আর এ জন্মের সাধনা।

কেশর রতনের গায়ে লুটিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলে, আমাদের বয়স কতো হলো লা ?

—তা মেঘে মেঘে বেলা হলো বইকি। আমার তো এই বত্রিশ চলছে।

—আমারো তা হলো একই।

—না। বোধ হয় তুই আমার চেয়ে বছর দুয়ের ছোট।

—ঘর গেরস্তি করলে এতদিনে আমরা ফুরিয়ে যেতুম, কি বলিস ?

—না করেও তো আমি ফুরিয়ে ফতুর হয়ে গেলুম।

কেশর তার মুখপানে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, ইস্! ফুরিয়ে অমনি গেলেই হলো ? এখনো যা আছে তাতেই রাজ্য জয় করা চলে! কে বলবে যে তোর পনেরো বছরের ছেলে ?

শুকনো মুখে ক্ষীণ একটি হাসির রেখা এঁকে রতন বললে, এখন তো ঐ আমার একমাত্র পরিচয়। আমি এখন লক্ষ্মী মা। জানিস, এই দুবচ্ছর হলো আমি একেবারে ভালো হয়ে আছি। একেবারে একা। কোনো পুরুষের সংস্পর্শে আসিনি। কাউকে ছুঁইনি।

—সত্যি ? হঠাৎ এমন সুমতি হলো কেন ?

—সুমতি হলো ঘেন্নায় আর দৈন্যে দুর্দশায়। জানিস তো আনন্দের জন্যে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। বুকের রক্ত জল করে রোজকার-করা টাকা অনর্থক অপচয় করেছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও অপচয় করেছি। যে আনন্দের লোভে, যে সুখের আশায় পাগল হয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি তার চেহারা দেখতে পাইনি। একবার নয়, এমন বহুবার ব্যর্থ হয়েছি। আমি তো পুরুষ চাইনি। চেয়েছিলুম মহব্বৎ।

মিঠে হাসিতে রাঙা ঠোঁট ভিজিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে কেশর বললে, কেন মহব্বত বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না ?

তার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে রতন হাসতে হাসতে বললে, না। পুরুষ কিনতে পাওয়া যায়। মহব্বৎ কিস্মতে মেলে না।

—তবে ?

—কিসমৎ চাই। কিসমৎ ভালো না হলে মহব্বৎ মেলে না।

কেশর বোধ হয় প্রসঙ্গটা শেষ করবার জন্যই বলে উঠলো, তা হলে অপেক্ষা করতে হবে সেই কিসমতের জন্যে। দৌড়ঝাঁপ করে লাভ কি ? বেগর কিসমৎ যা মিলবে না তার জন্যে মাথা খুঁড়লে শুধু কপালই ফুলবে। মাথা খুঁড়লেও যেমন টাকা মেলে না।

—মেলে না জেনেও তো তামাম দুনিয়া তার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।

—নাগাল না পেলে হাত বাড়িয়ে লাভ কি ?

—স্বভাবের দোষ। বদ অভ্যেস। শূন্য মাঠের মতো মন খাঁ খাঁ করে।

চোখ মটকে হাসল কেশর।

রতন বললে, একবার রক্তের স্বাদ পেলে ভোলা মুস্কিল। পুরুষের রক্তের স্বাদ মেয়ে দেহের হাড়ে গিয়ে বাসা বাধে।

খিল খিল করে হাসে কেশর। বলে, হাড়ে ঘুন ধরিয়ে ছাড়ে।

—তা সত্যি। বিষ জেনেও খেতে হয়। সেই বিষের মাঝে জীবনের মন্ত্র আছে। সেই বিষই অমৃতলোকের সন্ধান দেয়।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কেশর জিজ্ঞেস করলে, তুই কারুকে ভালবেসেছিলি ? সত্যিকার প্রেম ?

—তা না হলে এতো গায়ের জ্বালা কিসের ? আমি নিজেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি কেশর, নিজেকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছি। তবু সুখি হতে পারিনি। জীবনে এমন কেউ এলোনা যে আমাকে ভালোবাসাতে পারলে। এখন কারুর দেখা পেলুম না যে আমার প্রেমকে কেড়ে নিতে পারলে। যদি কেউ পারতো, সে তো আমাকে সর্বস্বান্ত করে আমার নাক ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতো।

কেশর নিঃশব্দে মৃদু হাসল। রতন বললে, ভালোবেসে ও সুখি হওয়া যায় না। সুখি হয়েও আবার ভালোবাসা যায় না। সুখ

আর ভালোবাসা একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে আসে না। যদি আসে, সে একটা অত্যাশ্চর্য, অলৌকিক ঘটনা। আমার অদেষ্টে তা ঘটেনি।

—তারি জন্তে এতো মনস্তাপ?

—সত্যি কেশর, একটা ভয়াবহ বিভীষিকার মতো এই চেতনা আমার নিঃসঙ্গতা কে তাড়া করে। মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাবো।

—পাগল হতে কি তোর বাকি আছে নাকি? ছেলেকে কাছে নিয়ে আসিস না কেন?

—বাসরে! তা হলে আর সে ছেলে থাকবে না। তার বাপজান হয়ে যাবে।

—তার বাপের খবর কি লা?

—খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে গোয়ালিয়রে আমার বাবা সেজে বসে আছে।

কেশর তার পিঠে একটা আলতো চাপড় দিয়ে বললে, রক্ষে কর। আর বলতে হবে না।

তুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। রতনের হাসিটা করুণ কান্নার মতো শোনাল।

কেশর স্তব্ধ বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকাল। রতনের মুখখানা মোমের মত শক্ত আর বিবর্ণ হয়ে গেছে। তার অন্তরের পুরোনো ক্ষতটা একটা তীব্র খোঁচায় রুধিরাক্ত হয়ে উঠেছে। তার জীবনের চরম পরাজয়ের অপমানটা যেন নতুন করে তার বুকের তলায় ধুঁইয়ে উঠেছে। তার মুখ দেখে কেশরের মনে হল, কান্নায় তার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে অথচ সে লজ্জায় কাঁদতে পারছে না।

কেশর তার হাত তুটি চেপে ধরে স্থির হয়ে রইল। কেউ কোন কথা বললে না।

নাম-ডাকের মহিমা আছে বই কি! পসরার চেয়ে পসারের দাম বেশী। মূলধনের চেয়ে গুড-উইল সুনাম বা খ্যাতি মানুষের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য। নামী ডাক্তার বা নামী উকিল বিশ্রাম বা নিজের শরীর মেরামত করতে বাইরে গেলেও যেমন রেহাই পায় না তেমনি কেশর বাঈ-এর কলকাতা আগমনের সংবাদ প্রচার হতেই বহু গ্রাহক এসে রতন বাঈ-এর দোরে ধর্না দিল। কেশর হাসিমুখে সবিনয়ে তাদের প্রত্যাখ্যান করল: মুজরো করবো না বলেই কলকাতায় পালিয়ে এসেছি। আমাকে মার্জনা করবেন।

কিন্তু ক-জনকে ফেরাবে সে? কাকে ফেরাবে? তার পুরোনো খদ্দের এক নেটিভ প্রিন্সের সুপারিশ নিয়ে লোক এল। তাঁদের সম্বর্ধনার জন্য জলসার আয়োজন হয়েছে, কাজেই পুরোনো খদ্দেরের সম্মান রাখতে হয়। তা ছাড়া সব চেয়ে বড় কথা, রতন। তার দৌলতে রতনের প্রচুর সম্ভাবনা। রতনকে বঞ্চিত করতে তার মন চাইল না। সে গেলে রতন যাবে সঙ্গে। রতনের মুখ চেয়ে সে সম্মত হল। ক্রিষ্টমাস ইভে মল্লিক বাড়ির মুজরো সে গ্রহণ করতে বাধ্য হল। অগ্রিম এক হাজার এক টাকা বায়না পেল। ফুরোনের চুক্তি হল রতনের সঙ্গে। রতন হাসতে হাসতে বললে, টাকা তোর পেছনে দৌড়োয়, আমি কি করবো বল। একেই বলে কিসমৎ।

হাসতে হাসতে কেশর বললে, আমি তোকে বলিনি, আমার খরচ নেই। সবটাই সঞ্চয়।

—তাই দেখছি।

কেশর বললে, ঢেঁকি সগ্‌গে গেলেও ধান ভানে।

এক সময় কেশর রতনকে জিজ্ঞেস করলে, সবতো হলো রতন কিন্তু গাইবো কি নিয়ে? সঙ্গতের ব্যবস্থা কি হবে? উটকো সারেঙ্গী তবলচির সঙ্গে কি গাওয়া চলে নাকি? আমি তাদের বুঝি না, তারা আমায় বোঝে না, একেবারে ঢং করে গিয়ে আসরে নামবো?

—ভাববার কথা বটে। সারেঙ্গীর জন্তে ভাবনা করতে হবে না। আমার সারেঙ্গী উমাশঙ্কর,—উমাশঙ্করের নাম শুনিসনি ?

কেশর বললে, আমি তাঁকে চিনি। আমার সারেঙ্গী ভবানী বাজপেয়ীর শ্বশুর। লক্ষ্ণৌ-এ আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। গুণী লোক।

—কিন্তু তবলচির কথা ভাবতে হবে। এখানকার বিখ্যাত তবলচি নেপালের ওঙ্কার বাহাদুর, সে তো কলকাতায় নেই। কাশী না কোথায় গেছে। যে আছে সে চলনসই। তোর সঙ্গে সঙ্গত করতে পারবে না। দেখি উমাশঙ্করজী কি বলেন ?

কেশর বললে, দেখ ভাই। যা হোক একটা ব্যবস্থা কর। মাঝে এখনো একটা দিন আছে—একটু তালিম নিতে চায় তো বরং কাল একবার আসতে বলেদে।

উমাশঙ্কর কেশরের আগমন সংবাদ আগেই পেয়েছিল এবং ইতিমধ্যে তার কাছেও একটা পাটি গিয়েছিল কেশর বাঈজী মুজরো করবে কি না তদারক করতে। কিন্তু সে তাদের চেষ্টা করতে মানা করেছিল। সে ভাবতেই পারেনি যে কেশর মুজরো করতে সম্মত হবে কলকাতায়। তার আভিজাত্য সম্বন্ধে উমাশঙ্করের প্রচুর শ্রদ্ধা। সাধারণ বাঈজীদের সঙ্গে তার একটা শ্রেণীগত পার্থক্য আছে।

উমাশঙ্কর হৃষ্টচিত্তে প্রসন্নমনে তাকে সাদর সম্ভাষন জানাল: তোমার সঙ্গে বেটি বাজাতে পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা।

রতন বললে, কিন্তু সঙ্গত করবে কে ? ওঙ্কার ওস্তাদ তো এখানে নেই। আমি তো ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না। তোমার ও কালুকে নিয়ে চলবে না।

—রাম কহো। কালু বাজাবে কেশর বাঈয়ের সাথে। আমি খোঁজ করে দেখি। যা হোক একটা উপায় হবেই।

প্রবীন উমাশঙ্কর ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে আপন মনে হাসল। অকুলে কুল পেলে মানুষ যে-ভাবে হাসে, হাসির চেহারাটা

প্রায় সেই ধরনের। সে হাসতে হাসতে বললে, ভাবনা কি বেটি।
এ-তো আমার কাজ। আমি ভাববো। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

আশ্বাস পেয়ে প্রসন্ন মনে তার মুখ পানে চেয়ে হাসল কেশর।

সাত্বিক ব্রাহ্মণ এই উমাশঙ্কর। কাশীতে পৈতৃক বাসভূমি। সংসারের জীব। জীবিকার জন্য তাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে এই সারেঙ্গীর পেশা। আসলে সে সুর-সাধক। সুরের যাতুকর। তার জীবনকাল, যৌবনকাল কেটেছে সুরের সাধনায়। শুধু সারেঙ্গ নয়, বেহালা, সেতার ও এস্রাজে তার সমধিক দক্ষতা। তার খ্যাতি বহু প্রচলিত। তার বহু শিষ্য। বহু ছাত্র। বহু ভক্ত। কিন্তু তবু তুঃখ ঘুচত না। অভাব মিটত না। তখন তো সিনেমার এত প্রচলন হয়নি। সেটা সিনেমার শিশুকাল। মুখে কথা ফোটেনি। সে-কালে গুনের আদর ছিল গুনীর কাছে। সাধারণ্যে নয়। আর যা-বা মর্যাদা ছিল, যোগ্য মূল্য ছিল না। অন্তরের ঐশ্বর্যের মত অন্তর্লোকে ছিল তার অধিষ্ঠান। অন্তরের নিভৃত গুহায় ছিল তার আনন্দলোক। প্রকাশ ছিল না। প্রচার ছিল না। অবগুণ্ঠিত সে সৌন্দর্য সৌরভ লোকালয়ে এসে পৌছত না। যেমন নারীর রূপ ছিল অন্তঃপুরের আলো। তার পরিচয় ছিল পরিজনের মাঝে সীমাবদ্ধ। রূপের প্রচারের জন্য রূপালী পর্দার আশ্রয় নিত না। রূপছায়াকে পণ্য করত না।

সে যুগের সৌন্দর্য চর্চা, কারুকলা নৃত্যগীত ছিল অন্তর্মুখি। অন্তস্তলের অন্তর্ভাগে ছিল তার স্থান। স্বপ্নের মত, গোপন প্রেমের মত, দেবতার পূজার মত সে ছিল একটা অন্বেষণ। অচেনাকে চেনবার, অজানাকে জানবার, দূর তুর্গমের তীর্থে পৌছবার একটা আকুল পিপাসা। সেই পিপাসার তৃপ্তি নেই। চলার ক্ষান্তি নেই। সন্ধানের শেষ নেই। তার জন্য কত তুঃখ কষ্ট সয়েছে। নৈরাশ্যের ক্লান্তিতে জর্জরিত হয়েছে। তবু সে সাধনায় বিরত হয়নি। অবচেতন চিত্তের অবরুদ্ধ বাসনাকে নিরস্ত করতে পারেনি।

সে নিজেকে প্রচার করবার জন্য ব্যস্ত হয়নি, অর্থের জন্য হা-হুতাশ করেনি। প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধানে, মহৎ ও বৃহৎ কিছুর আশায় সে তপস্যা করেছে নিজের নিভৃত তপস্যালোকে।

এখনকার দিনের মত রাতারাতি ভুঁইফোড় সুরশিল্পী বনে যেত না। কলকাতায় না হলো তো বোম্বাই বেঁচে থাক। বোম্বায়ে অচল কিছুই নয়।

আসলে তখনকার দিনে লোকে সঙ্গীত বিদ্যাকে বিদ্যা হিসাবেই গ্রহন করত। বিত্তের আশা করত না। ঈশ্বর সাধনার মত গুরুগৃহে বসে শিক্ষা করত। সাধনা করত। সত্যের দিকে, গভীরের দিকে অতন্দ্র দৃষ্টি রেখে তারা যোগাসনে বসে ধ্যান করত; সুখদুঃখের কথা ভাবত না, লাভালাভের হিসাব করত না। অন্তিমের মৃত্যুশ্বাসের মত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের ফাঁকে ফাঁকে তখনো একটা ক্ষীণ স্পন্দন জেগেছিল। সিনেমা রেডিয়ো তার অপঘাত ঘটাতে পারেনি।

বিশেষ করে বাঙলার গীতবাদ্য সমাজে অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলি শা একটা নূতন প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। সঙ্গীত সাধনার যে একটা স্বর্ণযুগ। কলকাতায় এবং আশেপাশে সেযুগে বহু বিশিষ্ট সাধকের একত্র সমাবেশে একটা অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। বোধ হয় সেই অবিস্মরনীয় অতীতের কঙ্কালটা তখনো বাঙলার বুকে ঘোরাফেরা করছিল।

সারেঙ্গী উমাশঙ্কর সেই অতীতের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

॥ দুই ॥

মানুষ তার পরিচয় রেখে যায় বংশ পরম্পরায়। প্রতিভা রক্তের মাঝে মুখ লুকিয়ে থাকে। সহজে নিশ্চিহ্ন হতে চায় না। পূর্বপুরুষের প্রতিভা সংক্রামিত হয় উত্তর পুরুষে। পুত্রের মাকে নাহলেও অনেকক্ষেত্রে পৌত্র প্রপৌত্রের মাঝে তার লক্ষণ দেখা দেয়। গড়পারের বিধু মুখুজ্জে ছিলেন বিখ্যাত তবলচী। তাঁর বহুশিষ্য এবং অগনিত ভক্ত ছিল। কথিত আছে তিনি বহু রাজা মহারাজার সঙ্গীতের আসরে তবলা বাজিয়ে প্রচুর খাতি ও সমাদর লাভ করেছিলেন এবং নবাব ওয়াজিদ আলি শার সঙ্গীতের আসরেও তাঁর নিমন্ত্রন হতো; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই বংশের সে ঐতিহ্য লোপ পেয়েছিল। তাঁর একমাত্র সন্তান অশ্বিনী পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়ে জন্মগ্রহন করেনি। গান বাজনার ওপর তার কোন অনুরাগ ছিল না। বরং বীতরাগই ছিল। বীতরাগের কারণ ছিল বই কি। গড়পারের মুখুজ্জেরা কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা, যাকে বলে অবস্থাপন্ন আহেলী। বাড়ি ঘর কোম্পানীর কাগজ সোনাদানা এবং নগদ টাকা ছিল প্রচুর। অমিতাচারী বিধু বাবুর সৌখিন বাদশাহী মেজাজ সে-সব অপচয় করে অশ্বিনীকে ঋণের চোরা-বালিতে ডুবিয়ে রেখে যায়। বাড়িঘর বেচে, পিতার ঋণ পরিশোধ করে অশ্বিনীকে ভাড়া বাড়িতে মাথা গুঁজতে হল এবং চাকরি নিতে হল বেঙ্গল ব্যাঙ্কে। প্রাক স্বাধীনতা যুগের ইম্পিরিয়াল এবং স্বাধীনতা যুগের স্টেট ব্যাঙ্ক। কাজেই তার গীতবাদ্যের উপর বীতরাগ জন্মানো স্বাভাবিক।

কিন্তু তার পিতার রক্তের মাঝের মাইক্রোবগুলো ধ্বংস হল

না। অশ্বিনীর দেহের মাঝে ক্ষেত্র তৈরি করতে না পারলেও, তার পুত্রের মাঝে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

অশ্বিনীর প্রথমার পুত্র দেবশ্রী ছেলেবেলা থেকেই সুকণ্ঠ এবং শ্রুতিধর গায়ক। স্কুল কলেজের ফাংশনে ছেলে গান গায় পিতা শুনতে পেত। ছেলে লেখাপড়ায় ভালো, ভালোভাবেই পরীক্ষায় পাশ করছে কাজেই পিতার উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন পিতার কানে খবর পৌঁছল যে দেবশ্রী অল ইণ্ডিয়া মিউজিক প্রতিযোগিতার তবলায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। এবং সংবাদপত্রে তার ছবি ও সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচিতি বেরিয়েছে। অশ্বিনী আকাশ থেকে পড়ল। শিখল কবে? শিখল কার কাছে?

কন্যা দেবিকারানী বললে, তুমি জানোনা বুঝি বাবা। ও অনেকদিন শিখছে। কে হীরু মিত্তির ওস্তাদের কাছে শিখেছে তারপর ছুটিতে মামার বাড়ি—কাশীতে গিয়ে সেখানকার খুব বড় ওস্তাদ মুরাদ আলিখাঁর কাছেও শিখেছে। এবার আসবার সময় মুরাদ আলি খাঁ ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিল, তুই বেটা দু'মাসে আমার কাছে যা আদায় করে নিয়ে চললি, দু'বছরেও আর কোন সাকরেদ তা পারেনি।

অশ্বিনী তাজ্জব-ভরা বড় বড় চোখে তার পানে চেয়ে রইল। অশ্বিনীর দ্বিতীয়া হাসতে হাসতে বললেন, ঠাকুর্দার হাওয়া লেগেছে ওর গায়ে। বংশের ধারা বজায় রাখতে পারবে। তোমার দ্বারা তো কোন কিছুই হলো না।

অশ্বিনী মৃদু হাসল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ও ফেলল। আনন্দিত ও হল না। দুঃখিত হল বলে মনে হল না।

অশ্বিনীর প্রথমার দুটি সন্তান! দেবশ্রী আর দেবিকারানী। দেবশ্রী জ্যেষ্ঠ। অশ্বিনীর প্রথম সন্তান। ভাইবোন দুজনেই অপূর্ব সুন্দর। স্বাস্থ্যে, লাবণ্যে, সৌকুমার্যে অসামান্য।

দেবিকা হাসতে হাসতে দাদাকে এসে বললে, তোমার ছবিখানা বাবাকে দেখিয়ে এলুম।

—কী বললেন ?

—কী আর বলবেন, গুণী ছেলের গৌরবে পিতার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—তুই আর বকিস নে দেবি। বাবা খুশি হবেন তবলায় ফার্স্ট হয়েছি বলে। বাবাকে চিনি না কিনা। বাবা গান বাজনার ওপর হাড়ে চটা। ওঁর ধারণা গান বাজনা করে বকা ছেলেরা। নিষ্কর্মা হতভাগা যারা তারাই গান বাজনার আড্ডা জমায়। খুব বকাবকি করলেন তো ?

—সত্যি বলছি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দাদা একটুও রাগ করেনি। বাবা কাগজ খানা পড়ে শুধু মুচকে একটু হাসল। মুখ দেখে তো মনে হলো, খুশির ভাব।

—তুই তো সব বুঝিস ? চিনলি না তো এখনো বাবাকে।

দেবিকা নিঃশব্দে দাদার মুখপানে তাকাল। অভয় দিয়ে বললে, কিন্তু দেখো তুমি, বাবা তোমাকে কিছু বলবে না। ইচ্ছে থাকলেও ছোট মা কিছু বলতে দেবে না। ছোট মা কিন্তু খুব খুশি হয়েছে। মার্কেটে কখন নিয়ে যাবে বলো ?

—কাল। কাল খৃষ্টমাস ইভ। কাল কিন্তু দুর্জয় ভিড় হবে।

—তা হোক। আর সার্কাস কবে দেখাবে ?

দেবশ্রী বাঁকা চোখে হাসতে হাসতে বললে, টিকিটের দাম দেবে কে ?

—কেন তুমি ?

—আমি পাবো কোথা ? আমি কি রোজগার করি ?

বাইরে দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে বিস্মিত হলো দেবশ্রী। দোরে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো উমাশঙ্কর।

বিস্মিত হবারই কথা। তার বাড়িতে সারেঙ্গী উমাশঙ্করের

আগমন যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রীতিকর। বাইরে তার সঙ্গীত সাধনার স্বপ্নময় জগৎ। বাড়ির সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। বাড়িতে সে ছাত্র। পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্র।

অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে হয়। সৌজন্যের খাতিরে দ্বিধাজড়িত হাসি দিয়ে দেবশ্রী উমাশঙ্করকে অভ্যর্থনা জানাল।

—বড় বিপদে পড়ে তোর কাছে আসতে হলো রে দেবু। আমার মান রাখতে হবে।

—কী বলুন।

—একটা জলসায় কাল সঙ্গত করতে হবে। আর কারুকে খুঁজে পেলুম না। হঠাৎ তোর কথা মনে পড়তেই তোর কাছে ছুটে আসছি। তুই পারবি। আর কেউ সে আসরে বাজাতে পারবে না।

উমাশঙ্কর খোলাখুলি তাকে কেশর বাঈয়ের কথা বলল এবং তাকে অনুরোধ জানাল তার সঙ্গে বাজাবার জন্য।

কেশর বাঈয়ের নাম শুনেই সে চমকে উঠল। লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত বাঈজী কেশর বাঈ-এর খ্যাতির সৌরভে কাশী ভরপুর। ঠুংরির অদ্বিতীয় গায়িকা সুধাকণ্ঠি কেশর বাঈ। দেবশ্রীর তরুন রক্তে দোলা লাগে। কেশর বাঈয়ের ঠুংরি শোনবার শখ তার বহুদিনের। সুযোগ সুবিধা হয়নি। সেই কেশর বাঈ আজ উমাশঙ্করের হাত ধরে তার দোরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ করতে এসেছে। তার বুকের মাঝে একটা বিপ্লব বাধিয়ে দিয়েছে উমাশঙ্কর। তাকে আলোড়িত করে তুলেছে। এ তার সৌভাগ্যের পরম দান। তার সাধনার অশেষ সম্মান।

তার আর্ট পিপাসু অন্তরে প্রচণ্ড উৎক্ষেপ। কী যে বলবে সে উমাশঙ্করকে ভেবে পাচ্ছেনা। এ সম্মানকে, এত বড় সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবে কেমন করে তার ভেতরের সঙ্গীতজ্ঞ কলাবিদ মানুষটা। আবার পেশাদার বাঈজীর আসরে সে নিজেকে একীভুত

করে দেবেই বা কেমন করে? তার সংস্কারে বাধে। তার ছাত্র-মন সঙ্কুচিত হয়।

তার মনের ভিতর দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সে একটা অনিশ্চিতের দোলায় দুলতে থাকে।

বহুদর্শী উমাশঙ্করের চোখে পড়ে বই কি? তার মনের এই আন্দোলনটা।

মনে মনে হাসে উমাশঙ্কর।

উমাশঙ্কর তাকে অভয় দিল। সাহস দিল। কেউ জানবে না। পরিচিত কেউ সে আসরে থাকবে না।

একসময় উমাশঙ্কর তার পিঠ চাপড়ে তাকে উৎসাহ দিলঃ লোকলজ্জার ভয় করলে তো বেট্টা, সাধনার সিদ্ধি খুঁজে পাবি না। ভগবানকে খোঁজার মতোই এ কঠোর তপস্যা। তপস্বীর আবার লজ্জা কি? লজ্জা তপস্যার সব চেয়ে বড়ো বিঘ্ন। বৈরাগী মন নিয়ে নির্বিকার চিত্তে সাধনার দুর্গম পথ পেরিয়ে যেতে হবে। তবে না লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবি? পথের চারিপাশে কাঁটা। দুর্গম, দুশ্চর পথ। ভয় করলেই তো থামতে হবে। থামলেই তো সাধনার ঘটবে অপমৃত্যু।

না। থামতে সে পারবে না। এই হবে তার জীবন সাধনা। সুখ দুঃখ, মান অপমান, লজ্জাভয় জয় করে, জীবন পণ করে সে এই দুরারোহ দুর্গম শিখরে উঠবে। পেছন পানে তাকালে চলবে না।

স্বীকৃত হলো দেবশ্রীঃ কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গে বাজাতে পারবো কি?

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তার মাথায় হাত রেখে উমাশঙ্কর বললে, তুই-ই পারবি বেটা। আর কেউ পারবে না। ওঁঙ্কার থাকলে অবশ্য কথা ছিল না।

—তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা করো না ওস্তাদ। তিনি আমার নমস্য।

কপালে হাতদুটি ঠেকিয়ে উদ্দেশে তাকে প্রণাম করল দেবশ্রী।

উমাশঙ্কর বললে, আজ একবার তালিম দিয়ে নিতে হবে। গাইয়ে আর বাজিয়ের পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। দুজনকে দুজনের ধাত চিনতে হবে। নইলে আড়াআড়ি হবে।

হাসল দেবশ্রী: তা ঠিক।

—বাঈজীও একবার তালিম দিতে চায়। আমিও তো কখনো তার সঙ্গে বাজাইনি,—আমাকেও ওর গলার সঙ্গে সারেঙ্গের সুর বেঁধে নিতে হবে।

—বাঈজী কি কোন হোটেলে উঠেছে নাকি?

প্রশ্ন করল দেবশ্রী।

—না। রতন বাঈজীর বাড়িতে। সেখানে কোন ঝামেলা নেই। তার নিজের বাড়ি। কোন রেইয়ত নেই।

দেবশ্রী মাথা হেঁট করে কি ভাবছে মনে হল। উমাশঙ্কর বললে, আমার সঙ্গে যাবি, তোর ভাবনার কি আছে? বাপ ছেলেতে একসঙ্গে যাবো—

অপ্রতিভ দেবশ্রী কুণ্ঠিত স্বরে বললে, না। সে কথা আমি ভাবিনি ওস্তাদ।

ঠিক হলো বিকেলে তারা রতন বাঈজীর বাড়িতে যাবে মহড়া দিতে।

শীতের অপরাহ্ণ বড় স্বল্পায়ু। মধ্যাহ্ণ আর সায়াহ্ণের মধ্যে যে ক্ষনিকের ঝিকিমিকি তারি নাম অপরাহ্ণ। অন্তিম হাসির মত বেলাশেষের একটা ঝলকানি। নেভবার আগের প্রদীপ শিখার মত। শীতের দিনের বেলা পড়ে আসতেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। বিকেলকে আমল দেয় না।

বাইরে দিনের আলো নেভেনি, কিন্তু ঘরের মাঝে জমাট

অন্ধকার। ঘরের দরজা খুলে চাকর আলো জেলে দিল। ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে দেবশ্রী ঘরখানাকে তন্ন তন্ন করে দেখে নিল। সুন্দর সাজানো সুবৃহৎ ঘর। বড়লোকের নাচ ঘরের কায়দায় সাজানো। ঘরের মেঝে-জোড়া বিচিত্র কার্পেট। দেয়ালের ধারে কৌচ আর সোফা। ঘরে রকমারি বাদ্যযন্ত্র। তানপুরা, সুরবাহার, সেতার, এস্রাজ। তিন চার জোড়া তবলা। আর খোল, পাখোয়াজ।

রতন আর কেশর গা-টেপাটিপি করল দেবশ্রীকে দেখে। মুগ্ধ হল তার অনুপম দেহ সৌষ্ঠবে। তার কমনীয় মুখ কান্তি দেখে। কিন্তু এআবার তবলা বাজাবে কি ? এই তো বয়েস, তবলা শিখলো কবে ?

বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল দুজনে। তাদের মুখভাব দেখে উমাশঙ্কর মনে মনে হাসল।

দেবশ্রীর হাত ধরে উমাশঙ্কর হাসতে হাসতে কেশরকে উদ্দেশ করে বললে, বেটি ভড়কে গেছেরে দেবু, তোর কচি উমর দেখে। মনে ভাবছে কাকে আমি ধরে নিয়ে এলুম।

—সত্যিই তাই ভাবছি ওস্তাদজী।

একগাল হেসে মিনতির কণ্ঠে দেবশ্রীকে কেশর বললে, আমার গোস্তাকী মাপ করবেন বাবুজী, কিছু মনে করবেন না যেন আপনি। আবার ওস্তাদজীর দিকে চেয়ে বললে, একে বাঙালী, তার ওপর এই বয়েস—অথচ তবলায় বিচক্ষণ না হলে ওঁকে আপনি নিশ্চয়ই নির্বাচন করতেন না।

হাসল উমাশঙ্কর। ঘাড় দুলিয়ে বললে, না মাই-জি বুড়োর নির্বাচনে ভুল হয়নি।

কথা বলল দেবশ্রী। ভুল হওয়া আশ্চর্য নয় বাঈজি। ওস্তাদজী আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। ওঁর স্নেহ ভুল করেছে হয়তো। কিন্তু ওস্তাদজী, আমিও যে ওঁরই মতো চমকে গেছি।

কেশর প্রশ্ন করলে, কেন ?

মৃদু হেসে দেবশ্রী বললে, এই কি কেশর বাঈ নাকি ? আমার ধ্যান ধারণার লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত বাঈজী কেশর বাঈ-এর সঙ্গে যে এঁর কোন মিল নেই। তার খ্যাতির বয়স যে এর শরীরের বয়সের চেয়ে অনেক বেশী।

খিল খিল করে সশব্দে হেসে উঠল, কেশর বাঈ। হাসতে হাসতে বললে, আপনার কি ধারণা ছিল যে বাঈজী হবে ইয়া লম্বা চওড়া পালোয়ান ?

—তা-না হলেও, যার এতো নাম ডাক সে যে এতো অল্পবয়সী আর এতো সাদাসিধে ভাববো কেমন করে ?

হাসল বাঈজী। মধুর প্রসন্ন হাসি।

দেবশ্রী বাঈজী দেখেছে মুজরোর আসরে। দূর থেকে তাদের নৃত্যগীত দেখেছে। কিন্তু এমন একান্তে তাদের ঘরোয়া রূপ দেখবার সুযোগ তো হয়নি কখনো। তাই সে নিতান্ত বালিকার মত কেশরের এই অনাড়ম্বর ও অসজ্জিতা রূপ দেখে চমকে গেছে। আর কেশর যে এত সুন্দর, এত রূপবতী সে ধারণা করবে কেমন করে ?

কেশর পা-দুটি দুমড়ে অপরূপ ভঙ্গিতে দেবশ্রীর সামনে বসেছে। দেবশ্রী তবলার উপর হাত রেখে অপলকে তার মুখের পানে চেয়ে আছে। কেশরের দৃষ্টি তার সঙ্গে আলাপ করছে। দুপাশে দুজন সারেঙ্গী। উমাশঙ্কর এবং আরেকজন।

কেশর হঠাৎ চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেল। ভেসে উঠল তার ঠোঁটেরই ফাঁকে হাসির মৃদু কম্পন। সেই কম্পিত হাসি প্রাণ পেল সুরে। ধ্বনিত হল কণ্ঠের ঝঙ্কার। সে আবেশ ভরা চোখে দেবশ্রীর পানে চেয়ে হাসল। সে হাসিতে সুর মাখান। সে দৃষ্টিতে সুদূরের মায়া।

দেবশ্রীর বুকের রক্ত তোলপাড় করছে। তার নিটোল নৃত্য চঞ্চল আঙুলগুলো তবলার বুকের উপর ছটফট করছে। সকলেই

উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে তার মুখের পানে। কেশরের মধুর কণ্ঠের সুরতরঙ্গে ঘরখানা ভরে গেছে।

হঠাৎ দেবশ্রীর আঙুলের আঘাতে উচ্চারিত হয়ে উঠল তবলা। সুরে লয়ে মিলেমিশে এক অসীম রূপ পরিগ্রহ করল। তার অনর্গল হাতের মিঠে বোল, তার সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান কেশর বাঈজীকে চমকে দিল। সে গানের মধ্যেই আনত মুখের মধুর হাসি দিয়ে দেবশ্রীকে অভিনন্দন জানাল।

তারা দুজনেই মেতে উঠেছে। সুরের রূপে তাদের মনের আকাশ আলো হয়ে উঠেছে। সত্য হয়ে উঠেছে তাদের সাধনার অন্তরলোক। আর সব চেতনা তাদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

গায়ের সাদা আলোয়ানখানা কোলের উপর বিছিয়ে দিয়ে বাঈজী বসেছে যেন রাশীভূত শ্বেতপদ্মের মত। তার সৌন্দর্য যেন দৈব আবির্ভাব। সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র। তার নিজস্ব মহিমা আছে। স্বকীয়তা আছে। দেবশ্রীর শরীর মন পুলকিত হয়ে ওঠে। ওর তপস্যার প্রভাবে সরস্বতী শুধু ওর কণ্ঠলোকেই আর্বিভূত নয়, দেহকে রূপময়ী করেছে তাঁর রূপ দিয়ে। ওর অন্তরের শূন্যতা ভরে দিয়েছে।

কেশর তন্ময় হয়ে গাইছে ঃ

"বাবুল মোরি নৈহারা ছুট যায়..."

বহুপ্রচলিত ঠুংরি। অনেকের মুখে দেবশ্রী শুনেছে এ গান। কিন্তু এমন ভাবে এ গানকে রূপায়িত করতে আর কেউ পারেনি। এর চাল আলাদা, রীতি আলাদা, স্বর বিস্তারের ভঙ্গি আলাদা। ঠুংরির এ এক নতুনতর রূপ। নতুন গমক। নতুন ঠমক। এ অঞ্চলে এ রীতির প্রচলন নেই। এ এক অভিনব উন্নত ধরনের ঠুংরি।

দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে গীত। বাঈজী ঝোঁকের মুখে নৃত্যের তালে মেঝের উপর চরনাঘাত করছে। দ্রুততার দীপ্তিতে

তার সমস্ত শরীর আন্দোলিত হচ্ছে। সুরের আরোহ অবরোহের সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লাবণ্য রেখাগুলো লীলায়িত হচ্ছে। মাথা দুলছে। কাঁধের উপর আকুলি বিকুলি করছে মাথার এলো খোঁপাটা। চোখের কটাক্ষে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে।

দেবশ্রী মেতে উঠেছে। শরীর তেতে উঠেছে। তার আঙুলগুলো যেন তবলার বুক নিঙড়ে বোল বের করছে। তার আঙুলের যাদুস্পর্শে তবলাটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাচাল হয়ে উঠেছে। অবাক হয়ে সকলে তার পানে চেয়ে আছে। দুনের মুখে দুজনেই যেন ক্ষেপে উঠেছে। বেহুঁস হয়ে গেছে। দ্রুততালে বাজনা বাজছে। মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলছে। বাজনার দ্রুততার সঙ্গে কণ্ঠের দ্রুততাও বেড়ে চলেছে। তাল আর সুরের স্বাতন্ত্র্য লয় হয়ে গেছে। দুয়ে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। এই মিলনের নামই সঙ্গত।

এই দ্রুততার মুখে হঠাৎ একসময় দেবশ্রী অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, হুঁসিয়ার বাঈজী!

গান থেমে গেল। বাঈজী হেসে উঠল। অপ্রতিভের হাসি। বিজিতার হাসি।

—সাবাস! আপনাকে আর কষ্ট দেবনা। আপনাকে আমি পরাভূত করতে চেয়েছিলুম। পরাজিত হয়েছি।

সকলে হেসে উঠল। আনন্দের হাসি। অভিনন্দনের হাসি।

কেশর সহসা দেবশ্রীর হাত ধরে বললে, চলুন, একটু আলাপ করি গে। রতন, তুমি চায়ের ব্যবস্থা করতে বলো।

রতন মৃদু হেসে দেবশ্রীর পানে চেয়ে বললে, আমারো যে বাবুজীর সঙ্গে একখানা গাইবার লোভ ছিল।

দেবশ্রী রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে, বসুন, আক্ষেপ থাকে কেন?

কেশর বললে, আজ না।

উমাশঙ্করকে অভিনন্দন জানিয়ে কেশর বললে, মাপ করবেন ওস্তাদজী। আমার ভুল ভেঙেছে। আপনার বিচারে ভুল হয়নি।

দেবশ্রী কেশরকে বললে, আপনি বড্ড বেশী উচুঁতে তুলে দিচ্ছেন আমাকে। আমার তো এই হাতেখড়ি। আপনি চালিয়ে নিয়ে গেলেন, তাই—

—ঠিক আছে। আমিই চালিয়ে নিয়ে যাবো। দয়া করে কাল আমায় উদ্ধার করে দেবেন। কলকাতায় এসে যেন বে-ইজ্জত না হতে হয়।

দেবশ্রী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলে, কলকাতাকে এতো সমীহ কেন বাঈজি? বাঈজীর কি ধারনা কলকাতা গুনী গাইয়ে বাজিয়ের একটা পীঠস্থান?

—বাবুজীকে দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

কেশর চকিত বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে তারপানে তাকাল। তার দুই চোখ আনন্দে ও স্নেহে জ্বলজ্বল করে উঠল।

দেবশ্রী হেসে উঠল। হাসল রতন।

রাস্তায় নেমে এল দেবশ্রী একটা চাপা রঙিন স্বপ্নের ঘোরে। ফিরিঙ্গী পাড়ার উৎসব-মুখরিত রাত্রি। রাত্রি ঘনীভূত হয়ে এসেছে, শীতল কনকনে হাওয়া বইছে। তবুও পথ জনাকীর্ণ। যানবাহনে দুর্গম। বড়দিনের আনন্দ রাত্রে। পথের চেহারা দেখে মনে হয়না যে রাত বেড়েছে।

উৎসব-ঘন জনবহুল পথে চলতে চলতে তার মনে হল আজকের সন্ধ্যাটি তার জীবনের স্মৃতিপটে দীর্ঘদিন চিহ্নিত হয়ে থাকবে। একটি বিশিষ্ট স্মরনীয় সন্ধ্যা। কেশরের মত খ্যাতনামা বাইজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই শুভলগ্নটিকে সে ভুলবে কেমন করে! তার কেমন আশ্চর্য ঠেকে। কেমন করে এ অঘটন ঘটল, কেমন করে সম্ভব হল এ অসম্ভব তাই ভেবে সে আশ্চর্য হয়ে যায়।

আশ্চর্য হবার কথা। তখনকার দিনে নারীসঙ্গ এখনকার দিনের মত অবারিত হয়নি। বেড়া ছিল। পর্দা ছিল। কলেজে কো-এডুকেশন প্রচলিত হয়নি। পথচারিনী ছাত্রী বা সম্ভ্রান্ত মহিলা চোখে পড়ত কচিৎ। ট্রামে, বাসে মেয়েদের অবাধ বিচরণ ছিল না। মেয়েরা তখনো আপিসের কেরানী হয়নি। সিনেমা তারকা হয়নি। রেডিয়ো গায়িকা হয়নি। মেয়েরা তখনো সুলভ হয়নি। অন্তঃপুরে তাদের দাম ছিল। অক্ষুন্ন মর্যাদা ছিল। কাজেই তখনো নারীসঙ্গ ঠেকাবার পাঁচিল ছিল। অবাধ মেলামেশার এমন সুযোগ ছিল না।

তাই নারী সম্বন্ধে দেবশ্রীর কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। চেতনার ও-দিকটা ছিল শক্ত আগল দিয়ে আঁটা। নারী সম্বন্ধে মনে ছিল সঙ্কোচ আর কৌতূহল। মনের স্পর্শ-বোধ ছিল ভীরু আর শ্রদ্ধায় অবনত। কিন্তু কেশরের পরিচয় তার সংস্কারের আগল ভেঙে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো এক নতুন পৃথিবীতে। সন্ধান দিল এই আবিল সংসারের ঊর্দ্ধে, দূর আকাশের ওপারের এক বিরাট ও মহান আনন্দলোকের। তার চারিপাশে অনেক জায়গা, অনেক আলো, আর অফুরন্ত অমৃতের আস্বাদ। স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন গভীর চেতনা কেশরের নারীসত্তাকে কাঁপিয়ে তোলে, রাগিনীর ঝঙ্কারের মত। দেবশ্রীর মনে হয় কেশর একটা সুর। একটা রাগিনী একটা গানের মূর্চ্ছনা। সুরের মত সূক্ষ্ম তার দেহশ্রী। তার হাসিতে সুর। বচনে সুর। তার নয়নে সুরের বহ্নি। কেশরের সঙ্গে আলাপ করতে পাওয়া একটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। সে তার পরম মূল্য উপলব্ধি করেছে। সে তাকে উৎসাহ দিয়েছে। উদ্বুদ্ধ করেছে। তার হাত ধরে তাকে সাধনার পথে এগিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, সে তার হাত ধরেছিল। তার অতর্কিত উচ্ছ্বসিত স্নেহ স্পর্শ দেবশ্রীর শরীরে রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল। সেই স্পর্শের সুখাবেশে তার দেহ সঙ্গীত-স্পন্দিত হয়েছিল। তার রক্তে সঞ্চারিত করেছিল, সঙ্গীতের পিপাসা।

চলতে চলতে তার মনে হচ্ছিল কেশর তাকে অনুসরণ করছে। তার কণ্ঠের ঝঙ্কার তার মর্মের মাঝে অনুরনিত হচ্ছে। তার হাসির কলধ্বনি তার হৃৎপিণ্ডে বেজে উঠছে। তাকে চকিত করে তুলছে। তাকে পিছু ডাকছে। কেশর তার সঙ্গে রয়েছে।

সে লজ্জিত হল নিজের এই বিসদৃশ মনোভাবে। সে পথের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে রিকসা নিল। সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু তখন প্রস্তুতির পথে।

কাল তার জীবনের একটা ভীষন পরীক্ষা। প্রতিযোগিতার পরীক্ষার চেয়েও দুরূহ। দুস্তর। তাকে পার হতেই হবে। এ সুযোগ জীবনে দুবার আসবে না। কেশর বাঈ-এর মত গায়িকার সঙ্গে আসরে বাজাতে পাওয়া নিছক ভাগ্যের মহিমা। ওঁকার ওস্তাদ বাইরে গেছে তার ভাগ্যের চক্রান্তে। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে তারিফ করে দেবশ্রী। কেশরকে খুশি করতে পারলে লক্ষ্ণৌ-এ পর্যন্ত সে তাকে জাহির করবে। তার যশোসৌরভ বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করবে।

কেশর তার ভবিষৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষন করে।

দেবশ্রী নিজেকে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েটের কৃতি ছাত্র। ভুলে গেছে বিদ্যামন্দিরের পবিত্রতা ও শুচিতার কথা। ভুলে গেছে সে বাড়ির কথা। গান বাজনার প্রতি পিতার বীতরাগের কথা। তার মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে সব কিছু। সে শুধু ভাবছে কেশরকে আর স্বপ্নময় সঙ্গীত জগৎকে। কেশর তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে এক গীতিমুখর নতুন জগতে।

বাড়ি ফিরতেই তার সামনে মুখভার করে দাঁড়াল দেবিকা।

অপ্রস্তুত হলো দেবশ্রী। কিন্তু সে নিজেকে সামলাবার জন্যই হো হো করে হেসে উঠল। দেবীকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললে, তুই রাগ করছিস কেন ভাই? আটকে পড়েছিলুম। সময় করতে পারলুম না। তার জন্যে মুখভার কেন? বড়দিন তো

ফুরিয়ে যায়নি। আর সার্কাস ও উঠে যায়নি। ভাবনা কিসের? সার্কাস ও দেখাবো। মার্কেটেও নিয়ে যাবো। কালকে কিন্তু আমাকে ছুটি দিতে হবে। খাস এক্স মাসের দিন তোকে নিয়ে বেরুবো।

—কেন কাল আবার কি?

—কাল ভাই এক জায়গায় বাজাতে হবে। ভয়ানক ধরেছে।

দেবিকা হেসে ফেলল্ঃ তুমি ঐ ঢুলিই হবে। তবলাই যদি পিটবে, এতো কষ্ট করে বি-এ পাশ করবার কি দরকার ছিল?

দেবশ্রী গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল, তারপর একখানা হাত তার চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলে, কথাটা কার? তোর না বাবার?

দেবিকা একগাল হেসে এ-দিক ও-দিক চেয়ে চাপা গলায় বললে, বাবার। বাবা আজ ছোট-মার কাছে বলছিল।

তার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে দেবিকা বললে, ঠিক ধরেছো তো! খুব ধুর্ত্ত তো?

—তুই কি ভাবতিস আমি খুব বোকা?

—বোকা হলে কি আর অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করতে পারতে?

—তোমার মতে তা হলে বি-এ যারা পাশ করেনি তারা সব বোকা?

—তা তো বলিনি।

—বলছো বই কি।

—কী বলছি?

—বলতে চাইছো যে তোমার বর সিলেকট করবার সময় প্রথমেই দেখতে হবে তার বি-এ ডিগ্রি আছে কিনা। ডিগ্রি যার নেই তাকে সরাসরি রিজেকট করতে হবে।

মুখ ঘুরিয়ে দেবিকা বললে, হবেই তো। আর তোমার বিয়ের এমন কণে সিলেকট করতে হবে যে তবলা বাজাতে পারে।

কপালে চোখ তুলে ভুরু কুচঁকে দেবশ্রী বললে, গাইয়ে হলেও চলবে—

—তা ঠিক। সে গাইবে তুমি বাজাবে।

ঘাড় দুলিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে দেবশ্রী সম্মতি জানাল, হ্যাঁ।

হেসে উঠল দেবিকা। বললে, আচ্ছা দাদা, সে যদি খুব কালো হয়, অথচ খুব ভালো গাইয়ে হয়?

—ওঃ! তোমার বর বুঝি বি-এ পাশও চাই আবার খুব সুন্দর হওয়া চাই?

দেবিকা গম্ভীর হয়ে বললে, আমার কথা এখনো আমি ভাবিনি। তোমার কথা তুমি বলোনা।

—আমার কথা তো তুই জানিস। আমি রূপের চেয়ে গুণের পক্ষপাতী। আর আমার একার যা রূপ আছে তাই-দুজনের পক্ষে প্রচুর।

—ওই গুমরেই গেলে তুমি।

গায়ের উপর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল দেবিকা।

ভাই-বোনের এই প্রীতি দুজনের মাঝে একটা প্রাণময় পরিবেশ রচনা করেছিল। তাদের দুজনের ভালোবাসার মাঝে কোন ফাঁক ছিল না ফাঁকি ছিল না। শৈশবে মাতৃহীন দেবিকাকে যেন দৈবের বঞ্চনা থেকে পূর্ণ করবার জন্যই এই ভাইটি তার হৃদয়ের স্নেহপাত্র উজার করে ঢেলে দিয়েছিল। বিমাতার সংসারে প্রতিপালিত ভাইবোনের মনে স্বতঃই একটা বিচরণের গোপন ক্ষেত্র ছিল। যেখানে আর কারুর অস্তিত্ব ছিল না। যেখানে তারা তাদের মায়ের নিরবয়ব উপস্থিতি অনুভব করত। মায়ের অশরীরী আত্মার স্নেহস্পর্শ পেত।

দেবশ্রী স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতির। তার অন্তরের প্রীতি-উচ্ছ্বাস শুধু এই বোনটির কাছেই অনর্গল হয়ে উঠত।

॥ তিন ॥

ভোরে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল কেশরকে। মনে পড়ল আজ তাকে বাজাতে যেতে হবে কেশরের সঙ্গে। কেশর বাঈজির মুজরো। কত সঙ্গীত রসজ্ঞ, কত বিশিষ্ট ধনী, কত রাজা মহারাজা, কত সাহেব সুবো উপস্থিত থাকবে সেই আসরে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, সাধ্য-সাধনা সুপারিশ করে তবে কেশরকে সম্মত করতে হয়েছে এই মুজরোতে। কে জানে কত বড় আসর হবে, কত লোক আসবে, তার জানা-চেনা কেউ হাজির থাকবে কিনা। ভাবতে তার হৃৎকম্প হয়। আবার আনন্দ ও হয়। শুধু আনন্দ নয় তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ তার রক্তের মাঝে ছুটোছুটি করে। একটা অভিনব উত্তেজনা তার শরীরটাকে ধনুকের ছিলার মত আঁট করে তোলে।

সে শুয়ে শুয়ে ভাবে। নোঙর খুলে নৌকোর পাল তুলে দিয়েছে উদ্দাম হাওয়ার মুখে। ভেসে চলেছে সে বিরামহীন ভাবের খরস্রোতে। না। আর সে কোন বাধা মানবে না। বন্ধন মানবে না। অপ্রতিহত গতিতে সে ভেসে চলবে উদার উন্মুক্ত আকাশের নিচে। পাড়ি দেবে তার সাধনার তীর্থঘাটে। তার বৃহত্তরো পরিচয়ের সাধনা।

জানলা খুলতেই তার মনে হল নতুন আলো গায়ে মেখে রাত্রি প্রভাত হল। নতুন হাসির ঢেউ তুলে বিছানার উপর এক ঝলক রোদ ছড়িয়ে পড়ল। আকাশকে অনেক বড় মনে হল। সকালটিকে বিশেষ ভাবে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন মনে হল।

তার অনেক কাজ। তার ব্যক্তিত্বের আজ অনেক দাম।

সে গায়ে একখানা আলোয়ান জড়িয়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে

দাঁড়াল। এত সকালে সে সচরাচর ওঠে না। চা হাতে নিয়ে দেবিকা তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। আজকের সকালটি তার প্রাত্যহিকতার বাইরে। একটি বিশেষ সকাল। প্রায় সরস্বতী-পূজার সকালের মত। মনে তার পূজোর হাওয়া। শুচিশুদ্ধ ভাব। প্রসন্নমনে, নির্মলচিত্তে, শুদ্ধান্তকরণে সে দেবীর চরনে পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সে ধ্যানস্তিমিত লোচনে যেন সেই মন্দিরের পানে চেয়ে আছে।

তার চিন্তার নির্জনতা ভেঙ্গে যায় দেবীর কণ্ঠস্বরে।

—কী গো, এতো সকালে ঘুম ভাঙ্গলো যে?

—চা হয়নি এখনো?

—জল চেপেছে। হলো বলে। কেন তুমি কোথাও বেরুবে নাকি?

—অনেক কাজ তোর সঙ্গে। তুই শীগগিরী আয়।

ঘরে ঢুকে আর্শির সামনে দাঁড়াতেই মনে হয় আজ একটু নিজেকে গোছগাছ করে যেতে হবে। চিবুকে গালে হাত বুলিয়ে মনে হল কামাতে হবে। চুলটা কাটলেও মন্দ হয় না। জুতো জোড়াটা পালিশ করতে হবে। এখনকার দিনের মত চপ্পল পায়ে দিয়ে তখন রাজত্ব জয় করা চলত না। স্যাণ্ডালের তখন জন্ম হয়নি।

তারপরেই মনে পড়ে জামা-কাপড়ের কথা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে দেবশ্রী। ধুতি আছে। ভালো দিশীধুতি। সাদা স্নুতি পাঞ্জাবীও আছে। কিন্তু এই দুরন্ত শীতে সাদা পাঞ্জাবী গায়ে? গরমের সাট, পাঞ্জাবী তো তার নেই। একটা কোট আছে, তাও রঙ-জ্বলা, জীর্ণ। আর ধুতির সঙ্গে কোট গায়ে দিয়ে সে বড় বিশ্রী লাগে। তা ছাড়া আলোয়ান নিতেই হবে। শীতের রাতে বাড়ি ফেরা।

এখনকার দিনের মত তখন প্যাণ্ট পায়জামা আর সার্টের রেওয়াজ হয়নি। স্কুল কলেজেও প্যাণ্টের সাক্ষাত মিলত কচিৎ।

ধুতি এবং সার্ট পাঞ্জাবীই ছিল বাঙালীর চিরকালীন পোষাক। আপিসে প্যাণ্ট কোট পরত। অনেকে কোট পরত ধুতির সঙ্গে। আর শীতের দিনে। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্ট পায়জামা হয়ে গেল সর্বভারতীয় ন্যাশন্যল ড্রেস। বিড়িওয়ালা থেকে কলেজের ছাত্র সকলেরি ঐ এক পোষাক। প্যাণ্ট, সার্ট আর পায়ে স্যাণ্ডাল। প্রভাত থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত এবং বিয়ে বাড়ি ঠাকুর বাড়ি থেকে শ্মশান ঘাট পর্যন্ত। সাহেবরা দেশ থেকে চলে গেল। দেশের লোক সাহেব বনতে ট্যাঁস বনে গেল।

দেবিকা চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেবশ্রী বলে উঠল, কী করি বল তো দেবি, রাজা মহারাজার অতো বড়ো আসরে কী পরে যাই বলদিকি ?

চোখে ঝিলিক দিয়ে চোরা হাসি হাসতে হাসতে দেবিকা বললে, সেখানে তো রাজপোষাক পরে যেতে হয়। একটা বরের রাজপোষাক ভাড়া করতে হয়। রাজা মহারাজা যখন আসবে !

—তোর সবতাতেই ফাজলামী।

—তোমার কথা শুনে যে গা জ্বলে যায়। ধুতি পাঞ্জাবী পরে, গায়ে শাল দিয়ে ভদ্রলোকের মতো যাবে—

—আরে তাই বা কোথায় ? গরমের পাঞ্জাবী সার্ট কিছুই যে নেই। এই দূরন্ত শীতে তো ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে যাওয়া চলে না ?

—না। তা চলে না। তাইতো !

আনতমুখে বির-বির করে দেবিকা বললে তোমার গরমের তো শুধু ঐ একটা কোট। সার্ট, পাঞ্জাবী তো নেই ?

একটা অস্ফুট বিরক্তির আওয়াজ করল দেবশ্রী,—হুঁ !

—বাবার পাঞ্জাবী তোমার গায়ে হবে না ?

মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল দেবিকা।

দেবশ্রী তার মাথায় একটা চাঁটি মারলে: ইয়ারকির জায়গা পাওনি?

খিল খিল হেসে উঠল দেবিকা।

হাসি থামিয়ে বললে, একটা কিনে আনো সার্জের পাঞ্জাবী।

—টাকা কোথায়? মাসের শেষ। লম্বা ছুটি। বাবার কাছে চাইতে গেলে মারমুখী হবে।

—ক-টাকাই বা লাগবে?

—তা পনেরো টাকার কমে কি হবে? ভায়েলার সার্ট কিনলে কমে হতে পারে।

—তোমার ফাণ্ডে ক-টাকা আছে?

—দশটাকার বেশী নয়। তাও তো তোর জন্যে রেখেছি। সার্কাস—

দেবিকা বাধা দিয়ে মাঝপথে বললে, সে হবে এখন। নিউ ইয়ার্সে গেলেও চলবে। আমার দশটা টাকা আছে দিচ্ছি। একটা ভালো পাঞ্জাবী চাঁদনী থেকে কিনে আনো।

—তাই দে। আমি টুইশানির মাইনে পেলেই দিয়ে দেবো।

—সুদ শুদ্ধ। মনে থাকে যেন।

—আচ্ছা তাই হবে। তুই আমার ভাই হলে হতিস আদর্শ লক্ষ্মণ ভাই।

—বোন বলেই বুঝি যতো জ্বালা?

—তোমার মতো লক্ষ্মী বোন পাওয়া ভাগ্যের কথা।

—কেন টাকা দিচ্ছি বলে?

এক সুরে বাঁধা দুটি এস্রাজের মত এরা দুটি ভাই-বোন। দেহের মতই এদের মনও এক ছাঁচে ঢালা। এই মেয়েটির যত কিছু আনন্দ আবদার সব এই দাদার কাছে। আর বোনের উপর দেবশ্রীর একান্ত নির্ভর। সে না হলে তার একদণ্ড চলে না।

জামা-কাপড়, বইখাতা, ঘর গোছানো সব কিছু দেবিকার হাতে। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজে তার হাতের স্পর্শ।

সারাটা দিন কেটে গেল একটা রঙিন ভাবের ঘোরে। একটা বৃহত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে। মনে তার মুক্তির স্বাদ। অন্তর বাহির তার মুক্তিতে উজ্জ্বল। সেভ করেছে, চুল ছেটেছে। মেজে ঘষে নিজেকে চকচকে করে তুলেছে। ফন্ কলারের একটা সার্জের চুরিদার কিনেছে। দিশী জলচুড়ির ধাক্কা দেওয়া কালাপার ধুতি, কুঁচিয়ে দিয়েছে দেবিকা। পায়ে গ্রিসিয়ান স্লিপার। গায়ে বাদামী রঙের সরু বেলদার শাল। অপূর্ব তাকে মানিয়েছে। তাকে সাজিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে দেবিকা সরে দাঁড়াল। খাসা মানিয়েছে। চমৎকার মানিয়েছে।

হঠাৎ বক্রদৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললে, আমার মন কিন্তু কু গাইছে দাদা!

—কেন রে? চমকে উঠল দেবশ্রী।

—মনে হচ্ছে যেন মেয়ে ভোলানো সাজ। সেখানে কোন মেয়ে গাইয়ে নেই তো?

—থাকলেই বা।

—ফল ভালো হবে না। বেচারী গান ভুলে যাবে।

—সাট-আপ্।

তার খোঁপাটা নেড়ে দিল দেবশ্রী। কিন্তু তার বুক কেঁপে উঠল এই অশুভ ইঙ্গিতে।

কাল যাকে দেখেছে আজ তাকে দেখে চিনতে পারে না দেবশ্রী। কাল যে কেশরকে সে দেখেছিল তাকে এই সুসজ্জিতা বাঈজির রূপসজ্জার মাঝে খুঁজে পায় না। তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। অথবা এ আলাদা মানুষ। কিংবা এ মানুষই নয়। এ অপ্সরা।

এ অপ্রাকৃত। এ অপ্রমেয়। এ মর্তের মানবীর রূপ নয়। এ নন্দনের নর্তকী। অমরেশের প্রেয়সী। ললিতকলার প্রতীক। ওর অধরে নতুন হাস্য। ওর দেহে নতুন লাস্য। ওর কণ্ঠে নতুন ভাষ্য। ওর রূপে প্রখর ব্যঞ্জনা। ওর রূপ যেন জ্বলে উঠেছে। সবটাই যেন একটা আলোর তীব্র ছটা। সবটাই স্পষ্ট। কোথাও নেই কোন প্রচ্ছন্নতা। ওর দেহের তটভূমিতে রাগিনীর অশ্রুত হিল্লোল। ও দীপক। ও হিন্দোল। ও মেঘ। মেঘ-মল্লার। ওর দেহের লাবণ্য জলে রাগিনীর তরঙ্গ। দেবশ্রী তারপানে চোখ তুলে চাইতে পারে না। তার চোখ বুজে আসে। তার অন্তর ভরে যায় রাগিনীর ধ্যানরূপে। সে যেন ধ্যানস্তোত্র মালা।

"সংচুম্বিতাস্যা কমলায়তাক্ষী। স্বর্ণচ্ছবিঃ কুঙ্কুমলিপ্তদেহা।"

আবার মনে হয়ঃ "পীনস্তনী শুভ্র বিলাসনেত্রা,

নিতম্ববিম্ব প্রতিবদ্ধকাঞ্চী।
মুখারবিন্দ সুরগীতরম্যা
নৃত্যানুগা মালবিকা..."

সে বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে তারপানে চেয়ে চেয়ে দেখে। তার চোখে সে বিস্ময়।

আর এক বিস্ময় এই গানের আসর। প্রসিদ্ধ মল্লিকবাড়ির বিরাট হলঘর। স্থাপত্য হিসেবে কলকাতার বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিচিত্র মর্মর মণ্ডিত মেঝের উপর মির্জাপুরি কার্পেট। এক পাশে জলসার আসর। সামনে দর্শকের আসন। নির্বাচিত ও নিমন্ত্রিত আভিজাত্য সমাজের দর্শক। তবুও জনসমাগম প্রচুর। তার বুক দুর-দুর করে। আসরের হল-সংলগ্ন একখানা ঘরে কেশর বাঈজির বিশ্রাম। অনেকটা থিয়েটারের গ্রীনরুমের মত। পরিচ্ছন্ন। কৌচ সেটি দিয়ে সাজানো। টেবিলের উপর শ্বেতপাথরের নগ্ন মূর্তি কিউপিড ও সাইকে। একটি বৃহৎ ভাসে তাজা ফুলের বোকে। ক্রিশানথিমাম ও গোলাপ।

কেশর দেবশ্রীকে ডেকে পাঠাল। দেবশ্রী ঘরে ঢুকতেই কেশর হাসিমুখে তার একখানা হাত ধরে বললে, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছো? বসো এইখানে।

দেবশ্রী নিঃশব্দে তার সামনে একখানা কৌচে বসল। দুজনে দৃষ্টির সজ্ঘর্ষ হল। দুজনেই হাসল।

কেশর দৈবাৎ প্রশ্ন করলে, তোমার বয়স কতো?

—তেইশ।

বিস্ময়ে তার মুখপানে চাইল দেবশ্রী। হাসিতে পেণ্ট করা ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে কেশর বললে, সুন্দর বয়স। আমার হিংসে হয়। আমার বত্রিশের কাছাকাছি। একত্রিশই হোক আর ত্রিশই হোক তোমার চেয়ে বড়ো। এবং তোমার যখন বড়ো, তখন তোমায় যদি আমি তোমার নাম ধরে দেবু বলে ডাকি, তোমার অসম্মান হবে কি?

অপূর্ব মুখ ভঙ্গি করে হাসিভরা নয়নে তার পানে তাকাল কেশর। অসামান্য সুন্দর সে মুখ। বিদ্যুৎ চমকের মত তাকে আকর্ষণ করল।

—মোটেই না। আমি খুশিই হবো।

—খাসা। সুন্দর ছেলে। দেবু নামটা ভারি মিষ্টি। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে নামটা অনেকবার মনে মনে উচ্চারণ করেছি। বড়ো ভালো লেগেছিল।

দেবু সম্মোহিতের মত নিঃশব্দে তারপানে চেয়ে রইল।

কেশর তার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তোমার মুখখানা এতো শুকনো কেন দেবু? কাল বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। ভয়ে নয়তো?

—সত্যি ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

—সর্বনাশ। ভয় কিসের? আসরে নেমে নার্ভাস হলেই বিপদ। খবর্দার! মনকে শক্ত করো। ভয় কিসের?

—ভয় তোমাকে। আমার সর্বশরীর অবশ হয়ে আসছে।

আতঙ্কিত হল কেশর: সে কি? কেন গো? আমাকে আবার ভয় কিসের?

মাথা নিচু করে অস্ফুটস্বরে দেবু বললে, তুমি এত সেজেছো কেন বাঈজি?

বিস্ময়ে মুহূর্ত হতবাক হয়ে গেল কেশর। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠল: পাগল।

—সেই-তো ভয়। তোমার রূপ যদি তোমার কণ্ঠকে ছাপিয়ে কলরব করে তা হলে বাজাবো কার সুরে? আঙুল যে বেতালা হয়ে যাবে। কান বেসুরো হয়ে যাবে।

দেবুর ছেলেমানুষী মুখভাবে, তার সরল স্বীকৃতিতে বাঈজীর বুকের রক্ত তোলপাড় করে উঠল। সে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখের অবিচলিত দৃষ্টি দিয়ে তার পানে চেয়ে রইল। তার চোখদুটো জ্বালা করে জলে ভরে এল। সে কৌচের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল।

দেবশ্রী অপ্রস্তুত হল। ওভাবে কথা বলা বোধ হয় উচিত হয়নি। নিজেকে তার অপরাধী মনে হল।

—বাঈজি!

গাঢ়স্বরে ডাকলো দেবু।

মুখ না তুলেই চোখ বুজে আদেশের কণ্ঠে বললে, কেশর বলো।

দ্বিধা জড়িত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে দেবু তার হাত দুখানা চেপে ধরে বললে, আমাকে মার্জনা করো। আমি নারী সমাজে অপাঙক্তেয়। মেয়েদের সঙ্গে কখনো মেলামেশা নেই।

চোখ তুলে হাসল কেশর।

মধুর ভঙ্গিতে তারপানে. চেয়ে চোখের বিষণ্ণ কুয়াশা শুকিয়ে ফেলল তার স্পর্শের কবোষ্ণ উত্তাপে। তারপর হাসতে হাসতে

তার হাতদুখানি ধরে মধুর কোমল স্বরে বললে, আমার রূপ তো তোমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে আমার গান।

অভয় পেল দেবশ্রী : তা ঠিক।

—তবে তুমি ভয় পাচ্ছো কেন আমার রূপের কলরবকে ?

মাথা হেঁট করে দেবু বললে, আমি কথা বলতে শিখিনি মেয়েদের সঙ্গে। আমার মনে যা হলো মুখে তাই বলে ফেললুম। আমি একদম আনাড়ি। মনে কিছু করো না।

দুজনে একসঙ্গে হাসল।

কেশর ঠোঁট মুচড়ে হাসল : ভয় কেটেছে তো ?

—হ্যাঁ, কেটেছে।

তার গায়ে একটা মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে কেশর জিজ্ঞেস করলে, কী করে কাটলো ?

দেবু হাসিমুখে উত্তর দিল, তোমার অভয় পেয়ে। তোমার যাদুস্পর্শে।

—খুব দুষ্টু আছো।

তার মর্মমূল কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সে বললে, আসলে আমার এতো সাজগোছ তোমার ভালো লাগেনি, —না দেবু ?

স্পষ্ট গলায় দেবশ্রী উত্তর দিল, না।

—আমি জানি।

হেসে উঠল কেশর।

—কাল বেশ ভালো লেগেছিল, না ?

—চমৎকার। সে চোখ-জুড়ানো রূপ, প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর মতো।

—আর এখন ?

—চোখ-ঝলসানো পাঁচশো বাতির আলো। চোখকে তৃপ্তি দেয় না।

হেসে ফেলল কেশর ঃ তুমি কবিতা লেখো দেবু ?

—না লিখিনা। এইবার হয়তো লিখবো।

—কেন ?

—তুমি আমায় কবি বানিয়ে দিলে।

কেশর দাঁতে জিব কেটে খিল-খিল করে হেসে উঠল। জল-তরঙ্গের উচ্ছি্ত হাসি। দেবশ্রীর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে পড়ল সে হাসি।

বাইরে গান আরম্ভ হয়েছে। জাহানারা বেগম গাইছে।

দেবশ্রী বললে, বাইরে যাই—

—না। এইখানে বসেই শোনো। বাইরে ভিড়ে যেতে হবে না। ওদের মাঝে বসে নিজের সম্মান খুইয়ো না। আমার ডাক পড়লে, আমার সঙ্গে যাবে। আমার শেষ হলে আমার সঙ্গে উঠে আসবে।

দেবশ্রী চমকে গেল। কেশরের ভঙ্গিটা আদেশের। কণ্ঠে অভিভাবিকার সুর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দুজনে গান শুনল। গান শেষ হলে দর্শকেরা হর্ষধ্বনি করে উঠল। কেশর উৎসুক চোখে প্রশ্ন করল, এইবার কি আমার পালা নাকি, না রতন গাইবে ? বাইরে একজন বলে উঠল, লক্ষ্ণৌর পর আর কোন গান জমবে না। এদের আগে গাইতে দাও।

কেশর বিরক্তির কণ্ঠে বললে, এ আবার কি। ছিঃ!

রতন গাইছে। ওর আলাদা তবলচি। বাঁচা গেল।

কেশর বললে, রতনের গান তো শোননি-বেশ গায়।

চা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে কেশর বললে, রতন কি রকম সেজেছে দেখেছো ?

নিঃশব্দে তার পানে তাকাল দেবশ্রী।

কেশর বললেল, না সেজে উপায় নেই। এটা আমাদের পেশা।

এ পেশার সাফল্য প্রথমত রূপে, তারপর সঙ্গীতে ও নৃত্যে। কী ব্যবসায়, কী বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের জীবন রূপসর্বস্ব! আগে রূপ তারপর আর সব। কাজেই সাজতে হয় রূপকে উসকে দেবার জন্যে।

হেসে উঠল কেশর!

দেবশ্রী বললে, তুমি কি সেই থেকে ওই কথাই ভাবছো বুঝি? কী মুস্কিল! মনে থাকে যেন—এখুনি গাইতে হবে!

—তুমিই তো ভাবিয়ে দিয়েছো। বাঙালীরা বড়ো ভাবুক।

চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে হাসল কেশর।

ভাসের ফুলগুলো আঙুল দিয়ে ছুঁতে ছুঁতে কেশর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, তুমি কোন ফুল ভালোবাসো, গোলাপ না চন্দ্রমল্লিকা?

—সব ফুলই আমি ভালোবাসি।

—এ-দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী পছন্দ?

—দুটোই। কারুর মনে আমি ব্যথা দিতে চাই না।

ভ্রূভঙ্গি করে তারপানে তাকাল দেবশ্রী।

চোখের কোণ দিয়ে তাকে শাসাল কেশর।

দেবশ্রী হাসতে হাসতে বললে, গোলাপ হলো মেয়েদের লজ্জা। আর চন্দ্রমল্লিকা মেয়েদের যৌবন আর শুচিতা।

—তুমি স্বভাব কবি দেবু। যেমন তুমি জন্ম তবলিয়া।

—অর্থাৎ আমি ভুঁইফোড়?

হেসে উঠল কেশর।

রতনবাঈ কাওয়ালি গাইছে।

দেবশ্রী বললে, খাসা গাইছে তো?

কেশর বললে, কাওয়ালি আর গজলে ওর জুড়ি নেই। তেমনি নাচে আর ভাউয়ে। ও একটা মজলিসী বাঈজী।

কেশরের ডাক পড়তেই সে দেবুকে বললে, তুমি আগে গিয়ে তবলা ঠিক করে নাও। আমি আসছি। কালী মায়িকে আর তোমার মা-র চরণে প্রণাম করো।

দেবশ্রীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে ভক্তিভরে প্রণাম করে কেশরের পানে চেয়ে হাসল। তার চোখ দুটি অশ্রুতে ভিজে উঠেছে। কেশর নিঃশব্দে নিজের ওড়নার আঁচলে—তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, তোমার জন্যে কি গাইব বলো?

—শেষে একখানা ভজন গেয়ো।

—যাও। আর বুক কাঁপবে না।

দেবশ্রী কম্পিত পায়ে আসরে গিয়ে বসল। উমাশঙ্কর তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

দর্শকেরা স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। লক্ষ্ণৌ-এর দুলালী বাঈজীকে দেখবার আশায়! কেশর এসে দর্শকদের অভিবাদন করতেই তারা উল্লাসধ্বনি করে উঠল।

দেবুর কর্ণকটু শোনাল। মনে হলো যেন কতকগুলো ক্ষুধিত রক্তপায়ী বন্য জন্তুর মাঝে একটুকরো মাংস ছুড়ে দিল।

কেশর দৃপ্তভঙ্গিতে রাণীর মত তাদের অভিবাদন জানিয়ে দেবীর মত আসন গ্রহণ করল। মনে হল যেন এতক্ষণে আসরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। দর্শকদের ঔৎসুক্যকে উসকে দিয়েছে দেবশ্রী। সকলেই কৌতুকভরা একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে দেবশ্রীকে দেখছে। একটা অল্পবয়সী বাঙালীর ছেলে প্রসিদ্ধা বাঈজী কেশর বাঈয়ের সঙ্গে তবলা বাজাবে। সকলেরি কৌতুহল উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সুন্দর সুকুমার ছেলেটি। চোখ দুটি বুদ্ধির প্রতিভায় জ্বল জ্বল করছে। অধরে কম্পিত হাসি। তার রূপ মাধুর্য ও দেহ সৌষ্ঠব নারী মনে কাঁপন ধরায়।

কেশরের কণ্ঠ ধ্বনিত হতেই বিরাট হলটা স্তব্ধ হয়ে গেল। কেশর ঠুংরি গাইছে। সেই গান : বাবূল মোরি নৈহারা ছুট যায়…

সুধাকণ্ঠি কেশরের সুরের ঝঙ্কার আর তার মিঠি উর্দু বুলি শ্রোতাদের শ্রবণে ইন্দ্রজাল রচনা করল। আনুষঙ্গিক গীতি-সহায় সারেঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সুরে আর তবলার মধুর সঙ্গতে তার সুরকে প্রাণবন্ত করে তুলল। ঘরের মাঝে এক সুরস্বর্গ রচনা করল। সুরের তরঙ্গ ঘরের দেয়ালে আর ছাদে আহত হয়ে এক অননুভূত বেদনায় থর থর করে কাঁপছে। স্তম্ভিত হয়ে শ্রোতারা তবলার সঙ্গত শুনছে। সে তো তবলার বোল নয়। রাগিনীর পদধ্বনি। সে অভ্যর্থনা করে, আমন্ত্রণ করে সুরদেবীকে আবাহন করছে। সুরলোক থেকে নামিয়ে আনছে সুরশ্রীকে এই সুর সাধিকার কণ্ঠস্থলীতে। শ্রোতাদের গহনতম অন্তরের তন্ত্রীগুলিকে সে কাঁপিয়ে তুলছে। আনন্দ বেদনার ঝড় তুলে দিয়েছে গায়িকার সাধনার পঞ্চবটীতে। তার চোখে মুখে, ললাটে—স্ফূর্তির ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তার সর্বাঙ্গের প্রতিটি অবয়ব গীতিমুখর হয়ে উঠেছে। শ্রোতারা আচ্ছন্নের মত অভিভূতের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

গান থামল। সুরের মূর্চ্ছনা ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটছে। বিপুল হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। তারপর এক সমারোহ ব্যাপার। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে অনেকে এগিয়ে এলো আসরের দিকে, কেউ ফুলের মালা, ফুলের তোড়া নিয়ে, কেউ নোট টাকা নিয়ে। দেবশ্রীর মনে মনে হাসি পেল। যেন পূজারীর দল দেবী দর্শন করছে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে। প্রণামী দিয়ে। হাত পেতে দেবীকে নিতে হলো সেই পূজা সম্ভার, আনত মধুর একটু হাসি ছড়িয়ে দিয়ে।

সর্ব জাতের দর্শক। সাহেব মেম, মাড়োয়ারী, পার্শি, গুজরাতি, বাঙালী। সকলেরি জাতিগত বিশেষ বিশেষ প্রচ্ছদ। সাহেব মেম কেশর ও দেবশ্রীর সঙ্গে শেক্ হ্যাণ্ড করল। দেবশ্রীকে ও অনেকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানাল। অনেকে তার সঙ্গে পরিচয় করতে এগিয়ে এলো।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, মাপ করবেন। ওঁর পরিচয়

কেশরের ডাক পড়তেই সে দেবুকে বললে, তুমি আগে গিয়ে তবলা ঠিক করে নাও। আমি আসছি। কালী মায়িকে আর তোমার মা-র চরণে প্রণাম করো।

দেবশ্রীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে ভক্তিভরে প্রণাম করে কেশরের পানে চেয়ে হাসল। তার চোখ দুটি অশ্রুতে ভিজে উঠেছে। কেশর নিঃশব্দে নিজের ওড়নার আঁচলে—তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, তোমার জন্যে কি গাইব বলো ?

—শেষে একখানা ভজন গেয়ো।

—যাও। আর বুক কাঁপবে না।

দেবশ্রী কম্পিত পায়ে আসরে গিয়ে বসল। উমাশঙ্কর তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

দর্শকেরা স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। লক্ষ্ণৌ-এর দুলালী বাঈজীকে দেখবার আশায়! কেশর এসে দর্শকদের অভিবাদন করতেই তারা উল্লাসধ্বনি করে উঠল।

দেবুর কর্ণকটু শোনাল। মনে হলো যেন কতকগুলো ক্ষুধিত রক্তপায়ী বন্য জন্তুর মাঝে একটুকরো মাংস ছুড়ে দিল।

কেশর দৃপ্তভঙ্গিতে রাণীর মত তাদের অভিবাদন জানিয়ে দেবীর মত আসন গ্রহণ করল। মনে হল যেন এতক্ষণে আসরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। দর্শকদের ঔৎসুক্যকে উসকে দিয়েছে দেবশ্রী। সকলেই কৌতুকভরা একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে দেবশ্রীকে দেখছে। একটা অল্পবয়সী বাঙালীর ছেলে প্রসিদ্ধা বাঈজী কেশর বাঈয়ের সঙ্গে তবলা বাজাবে। সকলেরি কৌতুহল উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সুন্দর সুকুমার ছেলেটি। চোখ দুটি বুদ্ধির প্রতিভায় জ্বল জ্বল করছে। অধরে কম্পিত হাসি। তার রূপ মাধুর্য ও দেহ সৌষ্ঠব নারী মনে কাঁপন ধরায়।

কেশরের কণ্ঠ ধ্বনিত হতেই বিরাট হলটা স্তব্ধ হয়ে গেল। কেশর ঠুংরি গাইছে। সেই গান ঃ বাবুল মোরি নৈহারা ছুট যায়···

সুধাকণ্ঠি কেশরের সুরের ঝঙ্কার আর তার মিঠি উর্দু বুলি শ্রোতাদের শ্রবণে ইন্দ্রজাল রচনা করল। আনুষঙ্গিক গীতি-সহায় সারেঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সুরে আর তবলার মধুর সঙ্গতে তার সুরকে প্রাণবন্ত করে তুলল। ঘরের মাঝে এক সুরস্বর্গ রচনা করল। সুরের তরঙ্গ ঘরের দেয়ালে আর ছাদে আহত হয়ে এক অননুভূত বেদনায় থর থর করে কাঁপছে। স্তম্ভিত হয়ে শ্রোতারা তবলার সঙ্গত শুনছে। সে তো তবলার বোল নয়। রাগিনীর পদধ্বনি। সে অভ্যর্থনা করে, আমন্ত্রণ করে সুরদেবীকে আবাহন করছে। সুরলোক থেকে নামিয়ে আনছে সুরশ্রীকে এই সুর সাধিকার কণ্ঠস্থলীতে। শ্রোতাদের গহনতম অন্তরের তন্ত্রীগুলিকে সে কাঁপিয়ে তুলছে। আনন্দ বেদনার ঝড় তুলে দিয়েছে গায়িকার সাধনার পঞ্চবটীতে। তার চোখে মুখে, ললাটে—স্ফূর্তির ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তার সর্বাঙ্গের প্রতিটি অবয়ব গীতিমুখর হয়ে উঠেছে। শ্রোতারা আচ্ছন্নের মত অভিভূতের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

গান থামল। সুরের মূর্চ্ছনা ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটছে। বিপুল হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। তারপর এক সমারোহ ব্যাপার। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে অনেকে এগিয়ে এলো আসরের দিকে, কেউ ফুলের মালা, ফুলের তোড়া নিয়ে, কেউ নোট টাকা নিয়ে। দেবশ্রীর মনে মনে হাসি পেল। যেন পূজারীর দল দেবী দর্শন করছে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে। প্রণামী দিয়ে। হাত পেতে দেবীকে নিতে হলো সেই পূজা সম্ভার, আনত মধুর একটু হাসি ছুড়ে দিয়ে।

সর্ব জাতের দর্শক। সাহেব মেম, মাড়োয়ারী, পার্শি, গুজরাতি, বাঙালী। সকলেরি জাতিগত বিশেষ বিশেষ প্রচ্ছদ। সাহেব মেম কেশর ও দেবশ্রীর সঙ্গে শেক্ হ্যাণ্ড করল। দেবশ্রীকে ও অনেকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানাল। অনেকে তার সঙ্গে পরিচয় করতে এগিয়ে এলো।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, মাপ করবেন। ওঁর পরিচয়

জানতে চাইবেন না। উনি চোরাই মাল। আমি ওঁকে গায়েব করে এনেছি। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন। উনি পেশাদার নন। এটা ওঁর শখ। উনি কলেজের ছাত্র। আমার ওপর মেহেরবান তাই ওঁকে আনতে পেরেছি।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললে, আমরাও আপনার দয়ায় ওঁর বাজনা শুনতে পেলুম।

দেবু কেশরকে চোখের কোণ দিয়ে শাসাল।

একটি মেম সাহেব—তিনি কলকাতার এক বিখ্যাত সওদাগরী আপিসের বড়ো সাহেবের পত্নী এবং মল্লিকদের চৌরিঙ্গীর বাড়ির ভাড়াটে—এসে কেশর আর দেবশ্রীর গলায় ছুগাছি মালা পরিয়ে দিয়ে ছুজনের হাতে ছুটি গিনী দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, অন বাহাপ অব মাই ল্যাণ্ডলেডি মিসেস মল্লিক আই হ্যাভ দি প্লেজার অব অ্যানউন্সিং হার হার্টি অ্যাপরিসিয়েশন অব ইয়োর চার্মিং মিউজিক—

করতালি দিয়ে দর্শকেরা হর্ষধ্বনি করল। মেম সাহেব হাসতে হাসতে বললে, আই ডু অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়োর উর্দু সঙ। ইট'স এ টি ট্। ইটস্ লাভলি।

তাদের সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করে বললে, ইউ আর এ লভলি পেয়ার।

তারা ছুজনে আরক্ত মুখে মেয়েদের আসনের পানে চেয়ে মিসেস মল্লিকের উদ্দেশে অভিবাদন জানাল।

দেবশ্রী গলা থেকে মালাটা খুলে গিনী খানা কেশরকে দিতে গেল। কেশর চাপা গলায় বললে, পকেটে তুলে রাখ। প্রথম আশীর্বাদ।

কেশরের ইচ্ছা ছিল পর পর তিনখানা গেয়েই সে শেষ করবে। কিন্তু দেবশ্রীকে শোনাবার জন্য সর্বশেষে যখন সে মীরার ভজন গাইল নারীমহল থেকে তুমুল আনন্দ হিল্লোলের সঙ্গে অনুরোধ

এল আর একখানা ভজন গাইবার। বাধ্য হয়ে তাকে আরেক-খানা ভজন গাইতে হলো। কেশরের মুখপানে চেয়ে দেবশ্রী এমনি ভাবে হাসল মনে হলো সে ও তাদের অনুরোধকে সমর্থন করল।

অভূতপূর্ব আনন্দ সাফল্যে গানের আসর ভাঙল। বিপুল সম্বর্দ্ধনার মধ্যে তারা বিদায় নিল।

গাড়িতে রাশীভূত ফুলের মধ্যে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল কেশর। তারপর অধরে হাসি ফুটিয়ে একটা চন্দ্রমল্লিকার গোছা হাতে নিয়ে আপন মনে বললে, বাঈজী কেশরের কণ্ঠকে ফুল দেবার লোকের আজ অভাব নেই—কিন্তু যে দিন নীরব হয়ে যাবে তার কণ্ঠ সে দিন ফুল দেওয়া দূরে থাক তার শিয়রে বসে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার মতো বন্ধু থাকবে না। থাকবে না কারুর মনে তার এক কণা স্মৃতি।

দেবশ্রী অবাক হয়ে তার মুখপানে তাকাল, মনে যেন তার কিসের একটা ভার রয়েছে মনে হল। সে কোন কথা বললে না।

কেশরের অনুরোধে তাকে এক গোছা, চন্দ্রমল্লিকা আর সেই মল্লিক গিন্নীর দেওয়া মালাটা বাড়ি নিয়ে যেতে হল।

॥ চার ॥

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিল দেবশ্রী। দেবিকা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে ঘরে ফুল আর মালা দেখে সে চমকে গেল এবং আনন্দিত ও হল।

দেবশ্রী হাসতে হাসতে বললে, কিনে আনিনি। দস্তুর মতো জয় করে এনেছি।

দেবিকা মালাটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে, মালা দেখেই তা বুঝেছি। জয় মাল্য গলায় নিয়ে বাড়ি ফিরেছো রাতদুপুরে।

—রাত অনেক হয়েছিল, তাই তোকে আর জাগালুম না। শুধু ফুল নয়। আরেকটা জিনিষ দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

—কী গো দাদা? মেডেল বুঝি?

দেবশ্রী বালিশের নিচে থেকে বের করলে সেই গিনিখানা। রাত্রে সে ভালো করে দেখেনি। দিনের আলোয় দেখলে, ভিকটোরিয়া ফুল গিনি।

আনন্দে নাচতে নাচতে গিনিখানা হাতে নিয়ে দেবিকা বললে, বাবাকে আর ছোট মাকে দেখিয়ে আসি।

দেবশ্রী তার হাত চেপে ধরে বললে, কিন্তু বাবাকে তুই বলবি কী? হয়তো রাগারাগি করবেন।

—ইস্! অমনি আর কি? বলবো, একজন খুব বড়ো ওস্তাদের সঙ্গে বাজিয়েছিল, খুশি হয়ে দিয়েছে বাড়ির মালিক। মেডেল না দিয়ে গিনি দিয়েছে।

দেবিকাকে সেই কথাই সে বলে গিয়েছিল, একজন ওস্তাদ গাইয়ের সঙ্গে বাজাতে যাচ্ছে। মিছে কথা তো নয়।

দেবশ্রী বললে, গিনিটা তুই নে। তোর হারের লকেট করে নিস।

দেবিকা লুব্ধ চোখে একবার হাতের তালুর উপরের গিনিখানার পানে তাকাল। তার চোখদুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল কিন্তু কি ভেবে সে বললে, বারে, এ আমি নোব কেন? এ তোমার প্রথম আশীর্বাদ। মায়ের বাক্সয় তুলে রাখবো।

দেবশ্রীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, এ যেন কেশরের কথার প্রতিধ্বনি। কেশর-ই যেন তার মুখ দিয়ে কথা বললে।

কেশর তার মনের মাঝে ফেনিয়ে উঠল। একটা স্বপ্নের মত কালকের সন্ধ্যাটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেশরের কণ্ঠ তার হৃদয়ের তারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

কেশর অনন্যা। কেশর অপরূপ। তার প্রতিভা বিস্ময়কর। তার খ্যাতি দূর বিস্তৃত।

কেশর তার গুণগ্রাহী। কেশর তাকে স্নেহ চক্ষে দেখেছে!

কেশরকে ভাবতে তার আনন্দ লাগে।

দেবিকা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললে, বাবা তোমায় ডাকছে দাদা। বাজার যেতে হবে। মাংস আনতে হবে। আজ বড়দিন মনে আছে? নিজে তো কাল পেট উলটে খেয়ে এসেছো।

—আজো তো আমার নেমন্তন্ন।

—তাই বুঝি? বেশ আছো।

অশ্বিনী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কম কথা কয়।

দেবশ্রীকে দেখে মৃদু হাসল। বললে, গান বাজনা করতে গিয়ে যেন লেখাপড়ার ক্ষতি না হয়। এম-এ টা ভালো করে পাশ করে তারপর যা হয় করো। আর গানবাজনার আবহাওয়াটা দূষিত আর বিষাক্ত। খুব সাবধানে পা বাড়াবে। বড়ো হয়েছো। বুঝতে শিখেছো। লেখাপড়া শিখেছো। তোমাকে বেশী বলা উচিত নয়।

ছোট-মা আর দেবিকা মুখটিপে হাসল।

ছোট-মা বললেন, কতো সম্মান বলোতো, অতো লোকের সামনে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে গলায়, হাতে দিয়েছে গিনী।

হাসল অশ্বিনী। বললে, সম্মান তো আছেই। বড়ো হতে পারলে সব কাজেই সম্মান। বড়ো না হতে পারলে কোন কাজেই সম্মান নেই। কর্তা বলতেন, মুটে হলেও মুটের সর্দার হোস।

সকলে হাসল। দেবশ্রী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো, কথাটার সত্যতা।

বড়ো হতে হবে। টপে উঠতে হবে।

রতন কেশরকে জিজ্ঞেস করলে, তুই কি ছেলেটাকে ভালোবাসলি নাকি ?

কেশর কুটিল কটাক্ষ হেনে উত্তর দিল, কেন, তোর জেনে লাভ ?

—লাভ না থাকলেও লোভ তো থাকতে পারে।

—আমি ওকে ভালোবাসলে তুই কি করবি ?

—লোভ সামলাবো। ও-দিকে হাত বাড়াবো না।

—নইলে হাত বাড়াবি ?

খিল খিল করে হাসল রতন : নইলে কী করবো বলা যায় না। তবে তোকে মিছে কথা বলবো না। চোখে ভালো লেগেছে। চোখে নেশা ধরেছে।

কেশর বললে, তোমার চোখ গেলে দোব, ও-দিকে চোখ দিলে। হাত মুচড়ে ভেঙ্গে দেবো ও-দিকে হাত বাড়ালে।

হেসে উঠল রতন : তাই বলনা মুখ ফুটে। আমি তো শুনতেই চাই। আমার কাছে বলতে লজ্জা কি ?

ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দিল কেশর, কী আমার গুরুঠাকুর যে তোমাকে বলতে আমার লজ্জা হবে। আমার মনের কথা আমি

এখনো জানি না। তবে তোকে সত্যি আমি মানা করছি। নিজের শখ মেটাবার জন্যে ওকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করিসনি কোনদিন! বড়ো ভালো ছেলে। গরীব গেরস্তর গুণী ছেলে। ওকে নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা করিসনি। লোভ দেখালে ওকে পেতে দেরী হবেনা। তা ছাড়া সব চেয়ে ওর বড়ো লোভের জিনিষ এই গানবাজনার শখ। আসল শিল্পী মন। ওকে নষ্ট করলে গুনাহ্ হবে। আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগবে। আমাদের উচিত ওর শিল্পীমনকে বাঁচিয়ে রাখা। ওর প্রতিভাকে জাগিয়ে রাখা।

রতন বললে, সে কথা খুব সত্যি। আমাকে তোর ভয় নেই। আমি এত বড়ো পাপিষ্ঠা নই যে তোর সঙ্গে ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো। আর করলেই কি পেরে উঠবো নাকি?

খিল খিল করে হাসল রতন। হাসি থামিয়ে একটু পরে বললে, তা হলে তোর গায়েও হাওয়া লাগলো?

—কিসের হাওয়া?

—প্রেমের হাওয়া। মহব্বতের হাওয়া আর আশনাই করবার নেশা?

কেশর মাথা দুলিয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, নারে, না। এ মেয়ে পুরুষের আশনাই নয়। আমার মন লোহার সিন্দুক। ও পুরুষ হলেও ওর পৌরুষ সেখানে সিঁদ দিতে পারবে না। সে বিষয় আমি নিশ্চিন্ত।

—তবে?

কী বলতে গিয়ে জিব থেকে কথাটা ফিরিয়ে নিল কেশর। মৃদু হেসে বললে, তবে আবার কি?

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই মুখ ঘুরিয়ে বললে, ছিঃ! একটা বাচ্চা ছেলে। আমাদের চেয়ে কমসে কম দশবছরের ছোট, তাকে নিয়ে এ-সব রঙ্গ করাও অন্যায়।

গলার স্বরটা কেশরের ভিজে। সে হাসল। হাসিটাও কেমন করুণ শোনাল।

রতন মনে মনে হাসল।

কেশরকে কেমন বেসুরো মনে হয় রতনের। তার স্বভাব গম্ভীর মুখখানা যেন আর এক পোঁচ রঙ মেখে কঠিন হয়ে উঠেছে। সে যেন সদাই অন্যমনস্ক। মনে যেন একটা ভার রয়েছে।

রতন বড় একখানা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজছিল। তার মুজরো আছে একটা বাগান পার্টিতে। কেশর ঘরের মাঝে পায়চারি করছিল। রতন মাঝে মাঝে আড়চোখে তারপানে চেয়ে দেখছিল। কেশরের আয়ত চোখদুটিতে একটা কাতরতার কুয়াশা। একটা ভাবের ঘোরে সে মগ্ন। নিজের মনের অতলে সে যেন ডুব দিয়ে আছে।

রতন বললে, আজ আমার না গেলেই ভালো হতো।

—কেন ?

চমকে তারপানে মুখতুলে তাকাল কেশর। তার সজ্জিত রূপের মহিমায় তার চোখদুটি আনন্দে জ্বলে উঠল। ঘরের মাঝে থেকেও এতক্ষণ কিছুই তার চোখে পড়েনি। সে তার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, না গেলেই ভালো হতো কেন ?

—তুই একলা থাকবি।

—তাই বলে তুই এতগুলো টাকা লোকসান করবি ? আমি একলা থাকবোই বা কেন। খুব সম্ভব দেবু আসবে।

—ও, তাই বল। তার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করেছিস ?

—এনগেজমেণ্ট আবার কি ? তাকে আসতে বলেছি। তাকে তো টাকাকড়ি কিছু দিতে হবে।

—তবে আর কি ? তাহলে তো আমার যাওয়াই উচিত।

বাঁকা চোখের কোণ দিয়ে সে এক ঝলক বিদ্যুৎ বর্ষণ করল।

—কেন ?

—নিরিবিলি বাড়িতে খোকা বাবুর সঙ্গে চোর-চোর কিংবা ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে পারবি।

—মরণ তোমার!

রতন নাচের ভঙ্গিতে একটা ঘুরপাক দিয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠল, ঠিক হ্যায়!

—আ মলো! এখন থেকেই নাচছিস কেন? পা ভেড়িয়ে যাবে যে।

—কুছ পরোয়া নেই। সেখানে পা টেপাবার অনেক লোক জুটবে।

—ওঃ! তাই বুঝি?

—ভুলে যাচ্ছিস কেন, এটা বাগান পার্টি। এটা মাইফেল।

কেশর জিজ্ঞেস করলে, ফিরতে কতো রাত হবে?

—তা বলা যায় না। মাতালের কারখানা তো।

কপাল কুঁচকে ভুরু বেঁকিয়ে কেশর বললে, মরতে ও-সব জয়গায় যাস কেন?

রতন কাজল ভরা টানা চোখে ঝিলিক দিয়ে বল্লে, উপরি পাওনার লোভে।

—ঐ লোভেই তুমি মরবে।

—কী করবো বল। আনন্দপিয়াসী মন রস খুঁজে বেড়ায়।

কেশর মুখ বেঁকালেঃ নিজে যেন মদ গিলোনা।

—পাগল। নিজে মদ না খেলে মাতাল ভোলানো যায় নাকি? এ তুই বুঝবি না। এখানে স্রেফ গজল আর টপ্পা। সঙ্গে জিপ্‌সী ড্যান্স।

—বাজারের মাগি নিয়ে গেলেই পারে। বাঈজী খোঁজে কেন?

—এ যে মালদার মজলিস। যতো রেহিস—শায়েব সুবোর পার্টি। কাজেই দামি জিনিষে ঝোঁক।

কেশর নিঃশব্দে তার মুখপানে চেয়ে কি ভাবছে মনে হল রতন তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললে, তুই বরং এক কাজ করনা, তোর খোকাবাবুকে পাশে বসিয়ে মোটরে খুব খানিক ঘুরে আয়।

—পাগল ? ওকে নিয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানো যায়। যদি কেউ দেখে ?

—গাড়ির ভেতর আবার কে দেখছে ?

—ছিঃ! ওর লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। ওর সাহস বেড়ে যাবে। আমি তা-র ওর মন ভোলাতে চাই না।

—তবে কি চাস তাই বল ? মনের এমন উদাস ভাব কেন ?

কেশর তার মুখপানে চেয়ে বিরক্তির কণ্ঠে বলে উঠল, আমি কি চাই তা তোর জেনে কি হবে ? আমাকে বোঝবার চেষ্টা করিসনা রতন। বুঝতে পাররি না! ঐ এক জায়গায় তোব সঙ্গে আমার গরমিল।

তার গলার ঝাঁজে রতন মুষড়ে গেল' কিন্তু তবু সে মুখে হাসল। হাসতে হাসতে মুখ ঘুরিয়ে বললে, এ-সব কিন্তু ভালো-বাসার লক্ষণ। কেশর মৃদু হেসে বললে, তুই আমায় জ্বালাস নে রতন। যেখানে যাচ্ছিস যা।

রতন হাসতে হাসতে তার গলা জড়িয়ে ধরল। তার গালে চুম্বন করল।

কেশর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার গাল গড়িয়ে ছুটি অশ্রুর ধারা নামল।

রতন আশ্চর্য হয়ে গেল ঃ ওকি, কাঁদছিস কেন ভাই ?

মুখ ঘুরিয়ে গদগদ স্বরে কেশর বললে, তোর জন্যে আমার দুখ্যু হয় রতন।

—আমার সৌভাগ্য। আমার জন্যে দুখ্যু করবার লোকও দুনিয়ায় আছে।

খিল খিল করে হাসল রতন।

শীতের রাতে আটটা অনেক রাত বই কি।

দেবু বোধ হয় আসতে পারলে না।

কেশর সাজপোষাক করে অনেকক্ষণ তার প্রতীক্ষায় বসে আছে।

ঘড়িতে আটটা বাজল।

কেশরের প্রতীক্ষা অধৈর্য হয়ে উঠল। নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে সে যেন হাঁপিয়ে উঠছিল। সে বাইরে এসে দাঁড়াল। শীতের এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তার গালে মুখে চুমো খেয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে সে নিচে কুয়াশাচ্ছন্ন পথপানে তাকাল। কেশরের মুখে হাসি ফুটল। ঐ তো স্কুলের ছেলের মত হেলে দুলে নাচতে নাচতে দেবু আসছে। সারা দেহ হিল্লোলে দুলছে। মাথার ঝাকড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ছে।

কেশর সিঁড়ির মাথায় গিয়ে হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। দেবশ্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, দেরী হয়ে গেল। আমার বোনকে বিকেলে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম। তার যতো আব্দার আমার কাছে। ফিরতে দেরী হয়ে গেল।

—বোন? তোমরা ক-টি ভাই বোন দেবু?

গভীর আত্মীয়তার সুরে প্রশ্ন করল কেশর।

একখানা সোফায় বসে দেবশ্রী হাসতে হাসতে বললে, ভাই বলতে আমি আর বোন ঐ দেবিকা।

—কী নাম বললে?

—দেবিকা রাণী।

—বেশ নাম তো তোমাদের ভাই বোনের। দেবশ্রী আর দেবিকারাণী। তোমাদের বাঙালীরা যেমন ধর্ম-নিষ্ঠ তেমনি ভাবুক। তোমার বোনটিকে নিশ্চয় খুব ভালোবাসো?

দেবু ঘাড় নাড়ল, হাঁ। আমাদের তো মা নেই। বিমাতা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেশর বললে, ওঃ। তাই বুঝি?

—হাঁ। বেচারী মার স্নেহ তো পায় নি। আমার তবু কিছুটা মা-কে মনে আছে। সে মাকে মনেই করতে পারেনা।

—তোমার চেয়ে কতো ছোট ?

—তা বছর তিন চারের হবে।

—তা হলে আঠারো উনিশ হলো। বিয়ের বয়েস হয়েছে।

—হ্যাঁ! বিয়ে দিলেই হয়। বাবা তো ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ভালো পাত্র চাইতো। খুব সুন্দরী মেয়ে।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, ভাইকে দেখেই সেটা অনুমান করা যায়।

দেবশ্রী তার চোখে চোখ রেখে বললে, আমি কী সুন্দর নাকি ? আমার চেয়ে সে ঢের সুন্দর।

—তাতো হবেই। সে মেয়ে যে। দেবশ্রী কি বুঝল, কিংবা কিছু বুঝল কিনা সেই জানে। তার আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখদুটো তীরের ধারালো ফলার মত কেশরের মুখের উপর বিঁধে গেছে। অদ্ভুত সে চোখের দৃষ্টি। পলকহীন সে চোখের দৃষ্টি যেন কেশরের মর্মমূলে গিয়ে পাষানের মত স্থির হয়ে গেছে। কেশরকে সম্মোহিত করে দিল। তার দেহের তপ্ত রক্তের জোয়ার মুখের উপর আছড়ে পড়ল। তার মুখ জ্বালা করে উঠল।

সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দেবুও উঠে দাঁড়িয়ে অধীর আবেগে বললে, আজ সুন্দর সেজেছো তো। অপরূপ মানিয়েছে। এর কাছে তোমার বাঈজীর সাজ। কেশরের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জেগেছে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেছে। সে হাসতে হাসতে বললে, সে তো আমার ছদ্মবেশ। আমার মেক-আপ। আমি তো বাঈজী হয়ে জন্মাইনি।

—ঠিক যেন আমাদের বাঙালী ঘরের মেয়েটি।

কেশর আজ কেন-কে-জানে ইচ্ছে করেই শাড়ির আঁচলটা বাঙালী মেয়েদের মত বাঁ দিকের বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

চুল বেঁধেছে এলো খোঁপা করে। খোঁপায় দিয়েছে একটি গোলাপ ফুল। কপালে কুঙ্কুমের টিপ।

কেশর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে দেবশ্রীর অনর্গল উচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপা দিতে চায়। সে ছটফট করতে করতে বললে, খিদে পায়নি দেবু? আমার কিন্তু ভারি খিদে পেয়েছে। চলোনা কোন ভালো হোটেলে গিয়ে আমরা খেতে খেতে গল্প করিগে।

—রতন বাঈ কোথায়?

—তার মুজরো আছে। ফিরতে অনেক দেরী হবে।

একগাল হেসে দেবু বললে, তা হলে আমরা দুজনে একা?

কেশর বাঁকা চোখে তারপানে চেয়ে ঘাড় নাড়লে, হ্যাঁ।

দেবশ্রী কী ভেবে মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললে, তোমার যখন খিদে পেয়েছে যেতেই হবে। কিন্তু তা হলে আজ আর গান শোনা হলো না।

তার কণ্ঠে নিরাশার অতল সুর।

কেশরের চোখ দুটি আনন্দ বিহ্বল হয়ে উঠল। তার বুঝতে বাকি রইল না দেবুর মনে নেশা ধরিয়েছে যে মদ, সে তার দেহ সৌন্দর্য নয়। তার সান্নিধ্য নয়। সে তার কণ্ঠ-সঙ্গীত। সুরের পিপাসায় তার অন্তর উদ্বেল। তার বড় বড় চোখ দুটি জ্বলছে এক অনির্বাণ অদৃশ্য শিখায়।

কেশর যেন তার মধ্যে একটি পরম আশ্বাসের সন্ধান পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। তার মনের ভার নেমে গেল। প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে সে মৃদু হাসল। তাকে নিরাশ করতে প্রাণ চাইল না।

—তবে আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই, কী বলো?

মাথা নেড়ে দেবশ্রী বললে, আমার তাই ইচ্ছে। হোটেলে বেজায় ভিড়। যতো মাতাল আর টমির হুল্লোড়। ছোটলোক

বেটারা সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলেই শেয়াল কুকুরের মত চিৎকার করে ওঠে। ভারী বিশ্রী লাগে।

কেশর মুগ্ধ প্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে মিটি মিটি হাসে। তার ভাল লাগে ওর এই ছেলেমানুষী মুখভাব। ওর এই অনর্গল কলমান উচ্ছ্বাস।

কেশর হাসতে হাসতে বলে, তবে থাক। এইখানেই কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে বলি। তারপর দুজনে বসে রেওয়াজ করব।

—সেই বেশ হবে।

আনন্দ উতল কণ্ঠে দেবশ্রী বলে উঠল। তার দুচোখ কেশরের সর্বাঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করল।

কেশর নিঃশব্দে মনে মনে হাসল।

কেক, প্যাটিস, স্যাণ্ডুইচ, ডালমুঠ আর চা। খেতে খেতে দেবশ্রী কেশরকে তার ঠাকুর্দার গল্প শোনায়। বিধু মুখুজ্জে বাঙলার সঙ্গীত সমাজে ছিলেন বহু বিশ্রুত। শুধু বাঙলায় কেন সারা ভারতে বলা যেতে পারে। তবলার ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা।

—তাঁরই আশীর্বাদে তোমার এই কৃতিত্ব। জন্মের সুকৃতি না থাকলে এতো অল্পবয়সে এমন কৃতবিদ্য হওয়া যায় না।

হাসল দেবশ্রী ঃ আমার বয়সটা বুঝি খুব অল্প? কিন্তু তোমার বয়সটা সে-দিন তুমি বাড়িয়ে বললে কেন বলতো?

—বাড়িয়ে বললুম?

—না তো কি? তোমার বয়স নাকি তিরিশ?

হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, কেউ বিশ্বাস করবে না, আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

তার হাসি দেখে কেশরও হাসল। জিজ্ঞেস করলে, কত মনে হয় তোমার?

—আমারি এক বয়েসী। খুব বেশী হলে পঁচিশ।

—পাগল!

কেশর একটা হাসির ঢেউ তুলল।

—ব্যবসার জন্যে বুঝি তোমরা বয়স বাড়িয়ে বলো?

কেশর গম্ভীর হয়ে বললে, বাড়িয়েও বলি না, কমিয়েও বলি না। সত্যিকার যা বয়স তাই বলি।

দেবশ্রী বললে, তা হলে তুমি বর্ণচোরা।

তুজনেই একসঙ্গে হাসল।

কেশর তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললে, খুব তুষ্টু!

—তুমি যদি খুঁড়িয়ে বড়ো হতে চাও, কি বলবো বলো?

—আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো না?

—নিশ্চয় করি।

—তবে? আমি যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমার বয়স তিরিশ।

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে দেবশ্রী বললে, কিন্তু দেখায় না।

আরেকটা হাসির ঢেউ তুলে কেশর বললে, তা বলতে পারো। সকলেই তাই বলে।

তুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

চায়ের কাপে লিকর ঢালতে ঢালতে কেশর মাথা নিচু করে বললে, তুদিনে আমাদের তুজনে খুব ভাব হয়ে গেল, না দেবু?

—খুব। তুমি প্রাণখুলে ভাব করলে তাই ভাব হলো। তুমি ডাকলে তাই আসতে পারলুম।

দেবুর গলার স্বরটা আর্দ্র। ভারি কোমল আর মোলায়েম।

কেশর তার পানে চাইল। হাসল মৃতু রেখায়। আবার মাথা হেঁট করে চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বললে, কিন্তু তুদিন পরে যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে, তুজনেরি মনে ব্যথা লাগবে—

—তোমার কি আমাকে মনে থাকবে নাকি?

—সারাজীবন কারুকে কারুরি মনে থাকবে না—কথাটা শেষ করতে দিল না। দেবশ্রী উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, থাকবে। তোমাকে আমার মনে থাকবে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। তবে যদি কখনো গানবাজনার নেশা কেটে যায়—যদি তবলা ভুলে যাই তাহলে তোমাকেও ভুলে যেতে পারি।

কেশর যেন ভাবাবেগ রুদ্ধ করবার জন্য দাঁতে ঠোঁট কামড়ে অপলকে তার উত্তেজনারক্ত মুখের পানে চেয়ে রইল। গলায় ভাষা পেলে না।

দেবু বললে, তোমার সঙ্গে পরিচয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় পরমাশ্চর্য ঘটনা। এ যোগাযোগ আমার বিধাতার পরম দান। আমি তোমার স্মৃতিকে চিরদিন পূজা করবো।

শুনতে ভাল লাগছে কেশরের। কিন্তু তার বুক কাঁপছে ভয়ে আর উত্তেজনায়। মনের আবেগে কী বলতে কী বলে বসবে। নারীমন ওর কাছে অজানা অনাবিষ্কৃত দেশ। ও অন্ধকারের অবগুণ্ঠন তুলে ধরতে চায়। অন্ধকারের গহন পেরিয়ে আলোর দেশে এসে দাঁড়াতে চায়। ওর উদ্ধত, দুঃসাহসী তারুণ্যকে রুখতে পারছে না। চেপে রাখতে পারছে না তার উচ্ছৃঙ্খল আবেগকে। প্রবল জলধারার মত সে অনর্গল আর মুখর হয়ে উঠেছে।

কেশর তাকে থামাতে চায় না। তাকে উৎসাহ দিতেও পারে না। ভয়ে তার বুক কাঁপে। কোথায় যেন একটা বিপদের সঙ্কেত রয়েছে। একটা বিস্ফোরণের ইশারা রয়েছে। কী যে করবে, কী যে বলবে সে ভেবে পেলে না। দেবশ্রীই তাকে রক্ষা করল। সে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কেশরের চোখে চোখ রেখে হাসতে হাসতে বললে, ও-কথা মনে করিয়ে দিও না। মনে করে কোন লাভ নাই। মরবো বলে আগে থেকে শ্মশান ঘাটে গিয়ে বসে থাকার মতো পাগলামি।

সশব্দে হেসে উঠল। বললে, চলো গান গাইবে।

কেশর অভিভূতের মত মৃদু হাসল।

গান শেষ করে কোল থেকে তানপুরাটা নামিয়ে কেশর হাসতে হাসতে বললে, যেমন মিষ্টি হাত তোমার দেবু, তেমনি মাত্রাজ্ঞান। তোমার বাজনার সঙ্গে গেয়ে আনন্দ আছে।

—সত্যি? ঠাট্টা করো না বা মন রাখা কথা বলো না।

কেশর বললে, গান বাজনার কথা নিয়ে আমি তামাসা করি না। গান বাজনা আমার ঈশ্বর।

দেবশ্রী বললে, তোমার মতো গাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন বাজাতে পেলে কিছুটা শিখতে পারি।

কেশর জিজ্ঞেন করলে, তুমি লক্ষ্মৌ গেছো?

—না। কাশী পর্যন্ত আমার দৌড়। তাও মামার বাড়ি বলে।

—সুবিধে হলেই এসো। কোন দ্বিধা করো না। বন্ধুর বাড়ি ভেবে আসবে। আসবার আগে আমাকে চিঠি লিখে জানিও। কোন অসুবিধা হবে না। আমার বাড়িতে কোন ঝামেলা নেই।

—তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিও। আর একটা জিনিষ আমায় দেবে কেশর?

—কী গো?

—তোমার একখানা ফটো?

—মা গো! আমার ফটো নিয়ে তুমি কি করবে?

মুখ টিপে হাসল কেশর।

—ফটো নিয়ে আবার মানুষে করে কী?

—কেউ দেখলে কী বলবে?

—তোমার পরিচয় দিয়ে বলবো আমার বন্ধু।

কেশর তারপানে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, আমার মতো বন্ধু কিন্তু লোকচক্ষে তোমার পক্ষে গৌরবের হবে না।

দেবশ্রী দৃপ্ত ভঙ্গিতে সতেজ গলায় বললে, আমার পক্ষে কী গৌরবের আর কী অগৌরবের আমি জানি। লোকে কি বলবে না বলবে আমি গ্রাহ্য করি না।

—সে কি কথা? তুমি সমাজে থেকে লোকনিন্দাকে ভয় করো না?

—আমার নিজের বিবেক ছাড়া আমি কারুকে ভয় করি না। যাক ও নিয়ে তর্ক করা চলে না। তুমি দেবে কি না দেবে তাই বলো।

—কিন্তু এখানে তো আমার ফটো নেই। সেখানে গিয়ে পাঠিয়ে দোব। বাঈজী কেশরকে।

দেবু মাথা নেড়ে বললে, না। আমি আজকের, এই কেশরের ছবি চাই। বলোতো আমি তুলিয়ে নোব।

কেশর কটাক্ষ হেনে বললে, আচ্ছা সে হবে এখন। তুমি বাড়ি যাও। অনেক রাত হয়ে গেল।

ঘড়িতে এগারোটা বাজল। কেশর বললে, এই ঠাণ্ডায় হেঁটে যেয়োনা। ট্যাকসি নিয়ো। টাকা আছে তো? আমার কাছে তোমার টাকা রয়েছে। টাকাগুলো নিয়ে যাও।

—কিসের টাকা?

বিস্ময়ে তারপানে চাইল দেবশ্রী।

কেশর বললে, কেন, মুজরোর টাকা? তোমার টাকা যে আমাকে দিয়েছে। তা ছাড়া পেলার টাকার ও তোমার অংশ আছে।

হেসে উঠল দেবু। হাসি থামিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে তাকাল তার পানে। বললে, অর্থ-বৈরাগী নই আমি নিশ্চয়ই। অতো বড়ো লোভকে জয় করবার দুরাশাও আমার নেই। তবে এ ক্ষেত্রে টাকার কথা আমার মনেও পড়েনি। এবং টাকার লোভে আমি বাজাতে আসিনি। আমি তোমার নাম শুনে তোমার লোভেই—

কথাটাকে সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে বললে, অর্থাৎ তোমাকে দেখবার আর তোমার গান শোনবার লোভে—

কেশর চোখে বিদ্যুৎ হেনে বললে, আমার লোভে বললেই বা এমন অপরাধটা কি হতো ?

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করে দেবু বললে, তা একটু হোতো বই কি। সেটা তো সত্যি কথা নয়। তোমার লোভ ও যা চাঁদের লোভ ও তাই। হাত বাড়ালেই তো চাঁদকে ছোঁওয়া যায় না।

—যায় না বুঝি ?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল কেশর, কিন্তু চোখদুটি তার অশ্রুতে আকুল হয়ে উঠল।

॥ পাঁচ ॥

রতন কেশরের কথাই ভাবছিল। মেয়েটা যেন ক্ষণজন্মা। লক্ষ্মীকপালে। কদিন বাড়িখানাকে যেন ভরে ছিল। তার গায়ের আলো লেগে বাড়িখানা যেন উথলে উঠেছিল। সর্বাঙ্গে লক্ষ্মীশ্রী। যেন একটা হাসির ঝরনা। একটা তৃপ্তির আকাশ। মুখ দেখলে মনে হয়না যে জীবনে তার কোথাও কোন অভাব আছে। কোথাও কোন অপূর্ণতা আছে। অথচ রতন যতোটুকু জানে, তাতে এক জায়গায় সে একান্ত রিক্ত ও সঙ্গীহীন। সাথিহারা পাখির মত আকাশের শূন্যতায় সে অন্ধ। সে দিকভ্রান্ত। প্রবাহিত স্রোতধারা যেন মাঝপথে শুকিয়ে গেছে। অত রূপ, অত স্বাস্থ্য, জোয়ান বয়স। অথচ শরীরে নেই কোন চাঞ্চল্য। নেই কোন অস্থির আন্দোলন। আশ্চর্য লাগে, অদ্ভুত মনে হয় রতনের। যৌবন তো বন্ধ্যা নয়। নিষ্ফলা নয়। শরীর তো নিস্পৃহ নয়। সে যৌবনের নেই কোন উচ্চারণ। দেহের নেই কোন ক্ষুধা। জীবনে এলো না প্রেম। পুরুষের স্পর্শে ধন্য হোলো না দেহ। তা হলে জীবনের সার্থকতা কী? নারীজীবনের চরম পরিণতি তো পুরুষের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া।

সেই পুরুষের পরশ পেলো না কেশর। অবজ্ঞা করল পুরুষকে। অবহেলা, অস্বীকার করল প্রেমকে।

রতনের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে কেশর দেবশ্রীতে অনুরক্ত ও আসক্ত। আর দেবু তাকে মনে মনে সমাদরে পূজা করে। ইচ্ছে করলেই কেশর তাকে পেতে পারত নিজের ভোগে লাগাতে পারত। অপূর্ব সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান ছেলে। দেখলেই মনে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে।

আসলে প্রথম দর্শনেই রতনের মনে লোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু কেশর তার কামনা বহ্নিতে ছাই-চাপা দিল। তাকে সাবধান করে দিল। স্পষ্টই তাকে বুঝিয়ে দিল যে তার মনে দেবুর জন্য নরম মাটি আছে। এবং তাকে সে বিপথে নিয়ে গেলে কেশর মনে প্রচণ্ড ব্যথা পাবে। এ ধরনের সূক্ষ্ম অনুরাগের সঙ্গে রতনের পরিচয় ছিল না তাই রতন বুঝতে পারেনি কেশরের এই নির্মল স্নেহানুরাগকে।

রতনের দৃষ্টিভঙ্গ আলাদা। প্রেম তার কাছে ভোগাসক্ত মনের দেহাশ্রয়ী কামনা। দেহ সম্ভোগের সঙ্কীর্ণতার মাঝেই তার প্রেমের পরিমণ্ডল। পুরুষই তার ভোগের উপকরণ। তার যৌবন প্রদীপ ধরবার পিলসুজ। তার যৌবন পিপাসার ফেনিল সুরা।

কেশর লক্ষ্ণৌ ফিরে গেছে।

রতন ফিরে এসেছে আলোক মণ্ডিত উৎসব আসর থেকে তার নির্জনতার নিতল অন্ধকারে। ক-টা দিন কেশর তার আনন্দ পিয়াসী মনকে উতরোল করে তুলেছিল। তার আনন্দঘন মনের পায়ে নূপুর পরিয়ে দিয়েছিল। শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গিনী পরম প্রীতিভাজন বন্ধুটিকে বহুদিন পরে কাছে পেয়ে তার প্রীতিউচ্ছ্বাস অনর্গল হয়ে উঠেছিল। তার ভবনে কেশরের আগমন ও অধিষ্ঠান তাকে সম্মানিত করেছে। তার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

অতিথির পরিচর্যায়, আদরে, আপ্যায়নে নিজেকে সে কদিন ডুবিয়ে রেখেছিল। স্বপ্নের ঘোরে দিন গুলো কেটে গেছে। তাই কেশরের বিচ্ছেদ ব্যথা তাকে আকুল করে তুলল। একটা শোকঘন বিষাদের কালো ছায়ায় বাড়িখানা ডুবে গেল। তার মনে হল যেন কেশর তাকে জনহীন সমুদ্রদ্বীপের নির্জনতায় নির্বাসিত করে গেল। চারিদিকে শুধু সমুদ্র তরঙ্গের অশ্রান্ত গর্জন। আর উন্মত্ত বাতাসের হাহাকার। প্রাণের চিহ্ন নেই। লোকালয় নেই। দিগন্তে নেই কোন শ্যামলতার আভাস।

নিঃসঙ্গতার চাপে রতনের দম আটকে আসে। আলস্যে শিথিল হয়ে আসে তার প্রাণ-স্পন্দন। তার সাগ্নিক সতেজ যৌবন। নিথর হয়ে আসে তার প্রকাশের প্রগলভ বন্যতা। ক্লান্তিতে তার মেরুদণ্ড বেঁকে যায়। শীতে তার রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়। বাইরের পৃথিবীর দিকে চেয়ে নিজেকে তার অত্যন্ত একাকী আর বিচ্ছিন্ন মনে হয়। অথচ চিরদিন সে একাই থাকে। মাঝের ক-টা দিন না হয় কেশর এসে তাকে সঙ্গ দিয়েছিল।

আবার সেই দুঃসহ নির্জনতা। সেই আকাশহীন অন্ধকার দিন। নির্জীব নিঃস্তব্ধ রাত্রি। তার নিঃসঙ্গতা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে এই একাকীত্বের অকুল অন্ধকারে বসে নিশ্চল তপস্যা করতে চায় না। পারে না সে একঘেয়ে নিয়মের দাসত্ব করতে। দীর্ঘ দুটি বছর সে অদ্ভুত সংযমের মধ্যে কাটিয়েছে। কাটাল কেমন করে? নিজেরি তার আশ্চর্য ঠেকে। নিজেকে তার কৃত্রিম মনে হয়। অস্বাভাবিক মনে হয়। শরীর ধর্মকে সে মানে নি। শরীরকে সে অনশনে শুকিয়ে মারছে।

তার শরীর জুড়ে জেগে ওঠে আদিম শূন্যতার হাহাকার।

মেয়ে জীবনের সন্ধান ও সমাপ্তি পুরুষ। পুরুষের বলিষ্ঠ স্পর্শের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করা।

না। আর সে নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখতে পারবে না এই স্তব্ধতার অন্ধকারে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতেই সে সাজসজ্জা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। অপূর্ব রূপসজ্জা দিয়ে রূপকে উসকে তুলল। সাজলে তাকে সুন্দরী পার্শি মহিলার মত দেখায়। সুন্দরী সে নিঃসন্দেহ। চিকন গৌর তার গায়ের বর্ণ। দীঘল তনু দেহ। মেদের আক্রমন নেই। তার মুখখানিকে সব চেয়ে সুন্দর করে তুলেছে তার অপরূপ নাকটি। ইহুদী মেয়েদের মত সোজা টিকলো নাক।

মদির নয়নে দীর্ঘ কালো পল্লব। ভুরু দুটি লিপ্সার কাজলে আঁকা। শরীরময় একটা বন্য মাদকতা। দৃষ্টি ভরা যৌন আবেদন।

গায়ে একটা কালো লম্বা ভেলোর কোট চাপা দিয়ে অভিসারিকা কুয়াশা-ঘেরা ধূম ধূসর শীতার্ত রাতে নিরুদ্দিষ্ট নায়কের সন্ধানে বের হল।

হগ মার্কেটে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে শিকারের সন্ধান মিলল না। হতাশ হয়ে সে ইম্পিরিয়াল হোটেলে প্রবেশ করল। হিম জর্জর শরীরকে উত্তপ্ত করবার জন্য।

বাঈজী হোটেলের নিয়মিত গ্রাহক। সকলের পরিচিত। বাঈজী সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং এ দাঁড়াতেই ম্যানেজার সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল এবং অভিবাদন জানাল। রতন স্মিত হাসিতে ঘাড় দুলিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে তার অভ্যর্থনাকে স্বীকৃতি দিল। ক্ষিপ্র গতিতে হেড্-ওয়েটার আব্বাস তাকে সসম্মানে উপরে নিয়ে গিয়ে একটি আরাম নিবিড় নিভৃত কেবিনে স্থান করে দিল।

—ভারমুথ মেম-সাব ?

সবিনয়ে প্রশ্ন করলে আব্বাস।

রতন বললে, আগে তুমি এক প্যাকেট ভালো সিগারেট আনো দেখি। শীতে জমে গেলুম।

—হাঁ। বড়ি জাড়া মেমসাব।

ম্যানেজার উঠে এসেছে।

—বাঈজী আমাদের ভুলে গেলেন।

অনুযোগের কণ্ঠে ম্যানেজার বললে।

—কেন ?

তির্যক ভঙ্গিতে রতন মুখ তুলে তাকাল।

—এতো বড়ো একসমাসে একদিন পায়ের ধুলো পড়লো না আমাদের হোটেলে।

হাসল রতন। ভুরু বেঁকিয়ে অর্ধ-নিমিলিত চোখে : কিন্তু খাবার তো কদিনই গেছে বাড়িতে।

—তা গেছে। বাড়িতে আপনার অতো বড়ো অতিথি এলো। আমাদের একদিন তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করবার সুযোগ দিলেন না তো?

—কী করবো বলুন। সে একটু অন্য টাইপের। বাইরে হৈ হুল্লোড় মোটেই পছন্দ করে না। তা ছাড়া—

চোখের কোণ দিয়ে হাসল রতন। বললে, এ-সব ড্রিঙ্কের ধার দিয়েও যায়না। একেবারে গোঁড়া। আমি যে মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক করি তাও সে জানে না।

—তাই নাকি? আপনার আত্মীয়া না বন্ধু?

—বন্ধু হলেও আমার পরমাত্মীয়।

কথায় কথায় রতন বললে, কি দেবেন বলুন তো? আজ আর ভারমুথে শানবে না।

মৃদু হাসল রতন।

হাসল ম্যানেজার : না না। ভারমুথ শীতের ড্রিঙ্ক মোটেই নয়। হুইস্কি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ব্ল্যাক লেবেল জনি ওয়াকার। খুব ভালো ব্রাণ্ড।

—কিন্তু নেশা হয়ে যাবেনা তো?

—দু এক পেগে কিছু হবে না। তবে একসঙ্গে খাবেন না। একটু একটু করে খাবেন। শরীর তেতে যাবে। নেশা বুঝতে পারবেন না। আনন্দ পাবেন।

ঠোঁট মুচড়ে হাসল রতন। একটা দীর্ঘশ্বাস ও উথলে উঠল তার বুকের তলা থেকে।

এক পেগ হুইস্কি। গরম সোডা। আর এক প্লেট স্যাণ্ডুইচ। সঙ্গে পোটেটো চিপস। বয় টেবিল সাজিয়ে দিল।

লিপস্টিক আঁকা ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত একটা সিগারেট চেপে ধরে রতন মনে মনে হাসে আর ভাবে।

এক জন সঙ্গী। নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য একজন পুরুষ সঙ্গী। মনের অকূল স্তব্ধতা ভাঙ্গবার জন্য পুরুষের উচ্চকিত হাসি। বলিষ্ঠ উপস্থিতি। উচ্ছ্বসিত স্পর্শ।

মধুর চুম্বনের মত ওষ্ঠাগ্রে গ্লাস তুলে ধরে ধীরে ধীরে পান করে আঙুরের রক্ত।

মধুর স্বাদ।

আতপ্ত আবেশ।

কবোষ্ণ প্রবাহ যৌবনের জমাট তুষার গলাতে থাকে। হিমশীতল রক্তস্রোতে প্রাণ ফিরে আসে। শিরায় স্নায়ুতে রক্ত কথা কয়ে ওঠে।

চুপচাপ একা বসে বসে সুরার সঙ্গে প্রেম করতে ও আনন্দ আছে বই কি!

বয় এসে মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যায়।

শূন্য গ্লাস পূর্ণ করে দিয়ে যায়।

কিন্তু মনের শূন্যতা তো পূর্ণ হয় না।

অভাব তো মেটে না। শূন্যতার হাহাকার তো ঘোচে না। আকাশের নিচে মাঠে বসে শরীর তার আর কাঁদতে চায় না। সে চায় মিবিড় সুখস্পর্শ, নিশীথ তপ্ত একটু আশ্রয়। তার কামনা আর শরীরের স্তব্ধতায় স্বপ্ন হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে চায় না। সে চায় সম্পূর্ণ বিশাল একটা জাগরণ।

—ভেতরে আসবো?

রতন সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মদের গ্লাস হাতে অপরিচিত একটি তরুণ মিটিমিটি হাসছে।

ঘটনাটা ঠিক চোখ খুলে হয়তো রতন বিশ্বাস করতে পারলে না। উপযুক্ত অভ্যর্থনা করে ভেতরে ডাকবার মত উৎসাহ বা সাহস হল না। উত্তেজনার [illegible] তার সমস্ত শরীর মুহূর্ত কেঁপে উঠল। মুখে ফুটে উঠল, শীতল এক ঝলক হাসি।

কী বুঝল সেই তরুণ কে জানে, সে একান্ত পরিচিতের মতই ঘরে ঢুকে তার সামনে দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করল, বসতে পারি?

প্রার্থনা মঞ্জুর হল কি নাকচ হল জানবার তার অপেক্ষা নেই, সে সরাসরি সামনের চেয়ার খানা টেনে নিয়ে আঁট হয়ে বসল।

রতন বাঁকা চোখে তারপানে চাইল। সে চাউনিতে স্পষ্ট সম্মতি না থাকলেও অসম্মতি নেই। অভ্যর্থনা না থাকলেও ঔদাসীন্য নেই। তরুণ দেশলাই-এর বুকে একটা সিগ্যারেট ঠুকতে ঠুকতে বললে, আমার নাম দিনেশ। তোমার নাম আমি জানি। তোমাকে আমি চিনি।

মদির চোখের কোণ দিয়ে রতন তারপানে চাইল। নির্জলা মদের মতই উদ্দীপক সে চাউনি। নায়িকার প্রথম প্রেমের ভ্রুভঙ্গি করে মধুর কণ্ঠে মিহিসুরে রতন বললে, কিন্তু আমি তো আপনাকে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দিনেশ বললে, আমাকে চেনো না। চেনো না বলেই তো অপরিচিত পরিচয় পেশ করে চেনা করলুম। আর তো চিনতে বাকি নেই। আমি দিনেশ। দিনেশ হলেও বিচরণ করবার বিশাল আকাশ নেই। একান্ত একা। তোমার শূন্য আকাশে তাইতো প্রদক্ষিণ করবার লোভ হলো। তুমিও একাকী, আমিও একাকী। আমার নিবেশে দুজনেরি নিরাকুল একাকীত্ব ঘুচলো। দুজনেরি দোসর জুটলো। পানশালার দোসর চাই বাঈজি। একা একা পান করা প্রায় কান্নার-ই সমগোত্র।

রতন ঘাড় দুলিয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, তার চেয়ে বলুন না বিষ খাওয়া—

—রাইট! বিষের জ্বালা ভোলবার জন্যে বিষ খাওয়া।

মুচকি হেসে রতন জিজ্ঞেস করলে, কিসের জ্বালা?

এক নিশ্বাসে গ্লাসটা নিঃশেষ করে দিনেশ রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে, জ্বালা? ঐ যে বললুম একাকীত্বের রুদ্ধশ্বাস। শূন্যতার হাহাকার।

—সাথির অভাব ?

বয় এসে দুজনারই গ্লাস পূর্ণ করে দিল।

ম্যানেজার এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। বাঈজীর সঙ্গে দিনেশের পরিচয় করিয়ে দিল, অলরাউণ্ড স্পোর্টসম্যান। ফুটবলে এ ডিভিসনের শিলড্ প্লেয়ার।

রতন প্রশংসাভরা দীপ্ত চোখে দিনেশের পানে তাকাল।

দিনেশ হাসতে হাসতে বললে, তাবলে বাঈজীর খ্যাতির মতো খেলার মাঠের খ্যাতি অতো দূরপ্রসারী নয়।

ঠোঁট মুচড়ে হাসল রতন ঃ দেখেই মনে হয়েছিলো খেলোয়াড় লোক।

সশব্দে হেসে উঠল দিনেশ। তার হাসির ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে দিল রতন। তার ভাল লাগল দিনেশের জোরালো পৌরুষ হাসি। সে হাসি ভরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলো দিনেশকে। তাজা বলিষ্ঠ চেহারা। শরীরে মেদের চিহ্ন নেই। দীঘল ছিপছিপে গড়ন। যেন ছাঁচে ঢালাই করা নিরেট দেহ। হাতের পেশীগুলো সতেজ ও সবল। খাঁটি পুরুষ চেহারা। তার হাসিতে, কথা বার্তায় এমন একটা সহজাত দম্ভ আছে, এমন একটা প্রভুত্বের ভাব আছে যা মেয়ে মনকে সহজেই অভিভূত করে ফেলে।

ভাল লাগল রতনের।

হাসি থামিয়ে দিনেশ বললে, খেলার মাঠে খলিফা খেলোয়াড় বলে আমার সুনাম আছে কিন্তু একদম আনাড়ি আমি মেয়েদের আসরে। সেখানে আমি কাণামাছি হয়ে মাথায় চাঁটি খেয়েই মলুম।

হেসে ফেললে রতন।

দিনেশ মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললে, হাসির কথা নয় বন্ধু। হাসছি শুধু মদের মহিমায়। নইলে এই হাসির পেছনে লুকিয়ে আছে কান্নার তলাও।

দিনেশের গলার স্বরটা কেমন তরল আর বিষণ্ণ মনে হল। রতন অবাক হয়ে তার পানে তাকিয়ে রইল।

বিষণ্ণ আবহাওয়াটার কুয়াশা কাটাবার জন্যেই যেন দিনেশ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল, কই তুমি তো খাচ্ছো না বাঈজি?

—প্রচুর খেয়েছি। আর খেলে বাড়ি যেতে পারবো না।

দিনেশ হাসতে হাসতে বললে, নো ফিয়ার্স। আমি তোমায় এসকর্ট করে বাড়ি পৌঁছে দোব। আর একটা পেগ। লাষ্ট পেগ। ফর মাই সেক।

এমনি একটা আকুল পিপাসায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে উঠেছিল। পুরুষের নিবিড় সান্নিধ্যের পিপাসা। একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে সে নিজের জীবনে ঝড় তুলতে চায়।

একটু হেসে দিনেশের দিকে তাকিয়ে রতন বললে, বেশ। আমি তোমার অনুরোধ রাখবো তুমি যদি আমার একটা কথা রাখো।

—সার্টেনলি। কী এমন কথা—

রতন বাঁকা চোখে কটাক্ষ হেনে বললে, ওই যে বলছিলে হাসির পেছনে কান্নার তলাও লুকিয়ে আছে। সেই তলাওটা যদি দেখাও।

দিনেশ তার চোখে চোখ রেখে সোজা তারপানে তাকাল। রতনের সুন্দর দেহের মধ্যে চোখদুটি তার সব চেয়ে বেশী সুন্দর। তার সেই সুন্দর চোখ নেশার আমেজে আরো সুন্দর দেখাল।

দিনেশ বললে, সে একটা কবিতা বাঈজি। ব্যথার একটা গান।

—প্রেমের ব্যথা নিশ্চয়ই।

নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মত মাথা নেড়ে দিনেশ বললে, হ্যাঁ। আমি একজন প্রেমের শহিদ।

রতন বললে, মদের সঙ্গে মহব্বতের কহানী সবচেয়ে ভালো চাঁট।

প্লেট থেকে একখানা স্যাণ্ডুইচ তুলে নিয়ে দিনেশ জিজ্ঞেস করলে, স্যাণ্ডুইচের চেয়ে মুখরোচক?

খিল খিল করে হেসে উঠল রতন: মহব্বৎ আর স্যাণ্ডুইচ?

—হ্যাঁ গো বিবি সাহেব। স্যাণ্ডুইচ। চোখ থাকলে মাই ডিয়ার এই স্যাণ্ডুইচের মাঝেই খুঁজে পেতে মহব্বতের মধুপুরী।

রতনের মনে হলো দিনেশ নেশার ঝোঁকে বেতাহাস বেতালা হয়ে পড়েছে। সে ধমকের সুরে বললে, বাজে কথা রেখে নিজের কথা বলোনা দোস্ত। বলবে না তোমার মহব্বতের কহানী?

রতনের ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে অধিকারের আবদার। দিনেশ মিইয়ে গেল। জোলো গলায় বললে, সেই পুরোনো আস্থি কালের কাহিনী। নারীর নির্মম বঞ্চনা। আর প্রবঞ্চিত পুরুষের মর্মবেদনা। প্রণয়ের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে নির্বোধ পুরুষকে করেছে ছলনা। তার হৃদয় দিয়েছে ভেঙ্গে। জীবনকে করেছে মরুভূমি। তবু সেই নির্বোধ পুরুষ তাকে নিয়েই করেছে কত কাব্য রচনা। তারই স্মৃতির মাঝে হতভাগ্য অন্বেষণ করেছে জীবনের সুষমা আর সান্ত্বনা। বঞ্চিত হয়েও বঞ্চককে করেনি লেশমাত্র ঘৃণা। হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারেনি তার অনুধ্যান।

রতন বললে, একটি মেয়েকে ভালোবেসে তার প্রতিদান পাওনি? উপেক্ষিতের মর্মজ্বালা? মনে দাগা দিয়েছে? মেয়েটা কি খুব সুন্দরী দোস্ত?

দিনেশ চোখ বুজে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অতল হতাশার সুরে বললে, খু-ব।

রতন জিজ্ঞেস করলে, চিড়িয়া কি একেবারে নাগালের বাইরে উড়ে গেছে বন্ধু?

—সে এখন পরস্ত্রী। আমার চোখে মৃত।

—কুছ পরোয়া নেই। যে গেছে তাকে যেতে দাও।

গায়ে ধাক্কা দিয়ে জোর গলায় উত্তর দিল রতন।

বিল নিয়ে এসেছে বয়।

রতন ব্যাগ থেকে টাকা বের করল। দিনেশ তার হাত চেপে ধরে বললে, আমি দেবো।

—চোপ! বেয়াদপি করো না।

বয় চলে গেলে রতন বললে, রতন বাঈজী পেশা করে না। টাকার জন্যে। এটা তার শখ। পেশা নয়।

দিনেশকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে রতন তার বাড়িতে। নিজের হাতে তার গায়ের কোটটা খুলে দিয়ে দুজনে পাশাপাশি বসেছে একখানা কৌচে। রতনও নিজের কোটটা খুলেছে। হালকা শাড়ির নিচে দেহের লাবণ্য রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাজ-সজ্জার তীক্ষ্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে যেন তার সৌন্দর্যের আস্ফালন স্তিমিত ও স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। ভালো লাগল দিনেশের চোখে। ঘরের পরিব্যাপ্ত নির্জনতায় দুজনের এই নিবিড় সান্নিধ্য তাদের মাঝে একটা আত্মীয়তার সুর তুলেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে যেন দুটি পূর্ব প্রণয়ী অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মিলিত হয়েছে। মুখে তাদের ভাষা নেই। অন্তর তাদের ফেনিল উন্মুখর হয়ে উঠেছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের মত।

কিছুক্ষণ পরে দিনেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন করলে, এ-টা তোমার নিজের বাড়ি?

মাথা নেড়ে হাসিমুখে রতন উত্তর দিল, হ্যাঁ গরীবের দৌলতখানা।

—এ দৌলতখানায় আমার মত দীন কৃপাপ্রার্থীয় মাঝে মাঝে শুভাগমন হয় নাকি?

—অর্থাৎ?

বাঁকা চোখে ক্রুর দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল রতন।

দিনেশ চাপা গলায় বললে, মাঝে মাঝে বাইরে থেকে এ-রকম লোকজন ডেকে আনো নাকি?

—না। কখখনো না।

ক্ষিপ্তের মত মাথা তুলিয়ে রূঢ় শানিত কণ্ঠে উত্তর দিল রতন।

সশব্দে হেসে উঠল দিনেশ। বললে, রাগ করোনা বাঈজি। তোমাকে অপমান করবার জন্যে বলিনি। তোমার জন্যে আমার অশেষ কৌতূহল। হয়তো তোমায় আমি ভালোবেসেছি।

উদ্ধত ফণা সাপিনীর ফণা গুটিয়ে এলো বাঁশীর সুরে। অধরে ভেসে উঠলো শীর্ণ হাসির রেখা। দিনেশের কাঁধে একটা ঝাঁকানী দিয়ে কৃত্রিম ক্রোধের কণ্ঠে ঝলসে উঠল, তুমি আমাকে ভেবেছো কী?

দুহাতে তার কণ্ঠবেষ্টন করে প্রেমার্দ্র কণ্ঠে দিনেশ বললে, তুমি স্বর্বেশ্যা। তুমি অপ্সরা। তুমি উর্বশী।

রতন নিস্পন্দের মত তার আয়ত বুকে মাথা রেখে চোখ বুজল।

দিনেশ নিঃশব্দে তার মাথায় হাত রাখলে।

রতন তার বুকের মাঝে মুখ ডুবিয়ে একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করল। সে যেন গভীর আরামে তার বুকের উত্তপ্ত আশ্রয়ে গভীরতর আলস্যে ডুবে গেল।

ঘনীভূত হয়ে উঠেছে মধ্যরাতের স্তব্ধতা। সেই নিবিড় স্তব্ধতার কুহকিনী মায়ায় আর রতনের স্পর্শের উচ্ছ্বাসে দিনেশের মনের কামনা ফেনিল হয়ে ওঠে। তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে আর ভয়ে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। সে রতনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে আবেশ ভরা কণ্ঠে বললে, ঘুম পেয়েছে রতন, ওঠো।

রতন মুখ তুলে তার পানে তাকাল উল্লোল ফুলের মত।

দিনেশ বললে, তুমি ঘুমোও গে। আমি চললুম।

—কোথায়?

চমকে উঠে দাঁড়াল রতন।

—বাড়ি যাই।

হাসল দিনেশ।

রতন তার হাত চেপে ধরে ধমক দিল: দুষ্টুমী করো না। ঘরে চলো।

একটি দীর্ঘ কুটিল ইঙ্গিতভরা দৃষ্টি দিয়ে দিনেশের মর্মমূল স্পর্শ করল। সে ম্লান হয়ে গেল।

দিনেশ কৌতুক করে বললে, আজ এই পর্যন্ত। একদিনে সব ফুরিয়ে দিলে কোন বৈচিত্র্য থাকবে না। ধীরে—বন্ধু ধীরে।

এতো আলো তবু চোখে অন্ধকার দেখল রতন। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে নির্লজ্জের মতই বললে, বাড়ি যাওয়া আজ চলবে না। সকালে উঠে যাবে। এখন এই অবস্থায় পথে বেরুলে পুলিশের হাতে পড়বে।

হাসল দিনেশ: সে ভয় নেই। কিন্তু আজ এখানে রাত কাটানো অসম্ভব। আমায় যেতেই হবে।

দিনেশের কণ্ঠের দৃঢ়তা রতনকে চমকে দিল। রতন এতটা ভাবতে পারেনি। তার নেশা গেল চোখ থেকে মুছে। ক্ষুধিত বন্যপশুর মত চোখদুটো আগুনের শিখায় জ্বলে উঠল। তার স্খলিত আঁচলে, বিস্রস্ত চুলে যেন হঠাৎ ঝড় উঠল। দিনেশ চোখ মেলে তার মুখের পানে তাকাতে পারল না।

রতন তার পথ আগলে সামনে দাঁড়িয়ে বললে, অসম্ভব যদি তবে এলে কেন? কে তোমায় আসতে সেধেছিলো?

দিনেশ তাকে কাছে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে সোহাগের কোমল কণ্ঠে বললে, পুরুষই চিরকাল মেয়েদের সেধেছে। প্রেম ভিক্ষা করেছে। আমাকে যে তুমি আসতে দিয়েছো, নিজের সঙ্গ দিয়ে এতোক্ষণ আনন্দ দিয়েছো, আমার নিঃসঙ্গতার শূন্যতাকে ভরে তুলেছো তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

রতন ভঙ্গিটাকে কোমল করে এনে বললে, খুব হয়েছে। আর দর বাড়াতে হবে না। আমি স্বীকার করছি গো, তুমি খুব দামি।

ঘরে চলো। এই শেষরাতে আমি তোমায় পথে বের করে দিতে পারবো না। তার চেয়ে—

একটা লজ্জালু কুটিল কটাক্ষ হানলে রতন। তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিনেশকে লেহন করতে লাগল। দিনেশ তার সেই রহস্য-প্রচ্ছন্ন নির্বাক দৃষ্টির ফুঁয়ে সহসা যেন নিভে গেল। সে এক মুহূর্ত নিঃশব্দে তার বেদনাবিদ্ধ অসহিষ্ণু মুখের পানে চেয়ে রইল। তারপর সবলে তাকে আকর্ষণ করে বুকের কাছে টেনে নিল। শান্ত গাঢ় গলায় বললে, ভুল করো না-[illegible]। ক্ষণিকের এই আলাপের মাঝে তুজনের মনে যে প্রীতির আলো জ্বলে উঠেছে তাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়ো না। অধৈর্য হয়ে আমাদের নতুন পথকে অন্ধকারে কলুষিত করে দিও না।

দিনেশ তার মাথার আলুথালু চুলের মাঝে আঙুল ডুবিয়ে প্রেমনম্র আর্দ্র কণ্ঠে বললে, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে রতন। আমার সেই ভালো লাগার মধুর চেতনাকে জোর করে বিকৃত করে দিও না। পারো তো জয় করে নিও। জোর করে কেড়ে নেওয়ায় সুখ নেই। আনন্দ নেই। সে বড়ো জঘন্য। বড়ো কুৎসিত।

রতন যেন নিমেষে তার শরীর থেকে মুছে গেল জলের আল-পনার মত।

কেটে গেল সুর। নির্লজ্জতার কুয়াশা জমাট বেঁধে অশ্রু হয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ল। দিনেশের রূঢ় নির্মম প্রত্যাখানের মাঝে সে প্রত্যক্ষ করল দ্যুতিমান অখণ্ড পৌরুষ। যে পৌরুষ নিস্পৃহ নয় অথচ লোভীও নয়। যার নিষ্ঠুরতায় মহত্ব আছে। সম্ভোগের চেয়ে যার কাছে সাহচর্যের মূল্য বেশী।

রতন তার দৃপ্ত পৌরুষকে শ্রদ্ধা না করে পারল না।

॥ ছয় ॥

রতনের হাত পুড়েছে।

আতস বাজির আগুনে হাত পুড়েছে। সদ্য পোড়া হাত জ্বালা করে আগুনকে মনে পড়িয়ে দেয়। আগুন নিয়ে অনেক খেলা খেলেছে সে। অনেককে পুড়িয়েছে সে। নিজে পোড়েনি।

এবার সে নিজে পুড়েছে।

অনবধানে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে। আতসবাজির চোখ-ঝলসানো আগুনে। ব্যথা আছে। ব্যথার মাঝে একটা আনন্দেরও স্বাদ আছে। বিরহের মাঝে ক্ষীণ মিলনের প্রতিশ্রুতির মত। বিরহ যদি মিলনের পশ্চাৎভূমি হয় বিরহের মাঝেও নিশ্চিত আনন্দের স্বাদ আছে।

রতন এতোদিন শিকার করে এসেছে। নির্দয় হয়ে নির্বিচারে শিকার করেছে। মায়া মমতা করেনি। কারুকে ক্ষমা করেনি। এইবার সে নিজে শিকারীর জালে পড়েছে। পরিত্রাণের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

পুরুষের উপর চিরদিন সে প্রভুত্ব করেছে। রাণীর মত আদেশ করেছে। নিজের শখ মিটিয়েছে। তারপর দূরত্বের পার থেকে শুষ্ক অভিবাদন করে তাকে বিদায় দিয়েছে। কারুর সঙ্গে জীবনের কোন প্রান্তে ছন্দের মিল খুঁজে পায়নি। সে হতাশ হয়েছে। তাই সে সে-দিন কেশরকে দুঃখ করে বলেছিল, জীবনে এমন কারুর দেখা পেলুম না যে আমাকে ভালোবাসাতে পারলে, যে আমার ভালোবাসা কেড়ে নিতে পারলে।

রতনের অন্তর্যামী বোধ হয় তার আন্তরিক ক্ষোভটা শুনতে পেয়েছিলেন। তাই সে-দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন একজন

বলিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন যে প্রথম দিনটিতে পরিচয়ের আদি পর্বেই তার উপর রীতিমত প্রভুত্ব করে গেল। তার চোখে আঙুল দিয়ে তার ব্যভিচারকে ধিক্কার দিয়ে গেল। অথচ তার অনাবৃত কলঙ্ককে সে ঘৃণা করল না। তার সৌজন্যের অন্তরালে ছিল একটা কোমল প্রশান্তি, একটা স্নিগ্ধ মমত্ববোধ। তার নির্ভীক ভঙ্গিতে ছিল প্রশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি। তার সমস্ত বাক্যস্রোতে ছিল একটি বহমান ব্যথার কলধ্বনি।

রতনের মনে হয় সেদিন সে উচ্ছৃঙ্খলতায় ক্ষিপ্ত হয়ে দিনেশকে তার কামনা ফেনিল আবিল যৌবনের উচ্ছ্বাস আবর্তে টেনে আনতে চেয়েছিল। তার সতেজ পৌরুষকে তার বলিষ্ঠ দেহ সম্ভারকে তার কামনা বহ্নিতে ইন্ধন করতে চেয়েছিল। কিন্তু দিনেশ অসাধারণ না হলেও সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র। সে নারী দেহের কাঙাল নয়। সে নারীর স্নেহ-মমতার কাঙাল, সে মনুষ্যত্বের কাঙাল। সে স্পোর্টসম্যান। নীতি ও শৃঙ্খলা তার অস্থিমজ্জায়।

রতনের চোখে পড়েছিল তাদের মাঝের দূরত্বটা। তাদের মাঝের ব্যবধানটা। সে ব্যবধান অতিক্রম করতে হলে সময়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে। সময়ের তীরে বসে প্রতীক্ষা করতে হবে।

তাকে তখনকার মত মনের আগুন নেবাতে হল। কামনার পাপড়িগুলি মাটিতে ঝরে পড়ল। অমোঘ ঘটনাস্রোত তার কামনার ঢেউ বদলে দিল। তার চোখে পড়ল দিনেশের মহব্বতী পৌরুষ। তার তেজোদ্দীপ্ত বড় বড় চোখে মহব্বতের প্রখর আলো জ্বল জ্বল করছে। তার অমিত শক্তিই তার দেহের সৌন্দর্য। সে শক্তি তার পুরুষ রূপকে উগ্র করে তোলেনি। মহব্বতী কোমলতা তার শক্তিকে একটি আশ্চর্য সুন্দর রূপ দিয়েছে। যে-রূপ রতন বাঈজীকে সম্মোহিত করেছে।

রতনের প্রেম-যমুনায় বিরহের ঢেউ লেগেছে। বিরহের মধ্যে দিয়েই সে একটা নতুনতরো আনন্দের স্বাদ পাচ্ছে। বিরহের ব্যথা তাকে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে এক অনাস্বাদিত আনন্দলোকে। তার উপেক্ষিত অপমানিত নারীত্ব আঘাতে আবিল হয়ে ওঠেনি বরং একটা নির্মলতার আভাসে ঝলমল করছে।

দিনেশ তার হৃদয়াকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রখর তেজে জ্বলছে। সারা দেহে তার সেই সূর্যের দীপ্তি। প্রাণের উত্তাপ বিকীর্ণ করে জীবনকে উদ্দাম অভিনন্দন জানাচ্ছে। যে-জীবনের সঙ্গে রতনের পূর্বে পরিচয় ঘটেনি।

না। আসল জীবনের সঙ্গে তার সত্যকার পরিচয় ঘটেনি কোনকালে।

রতনের অতীত একটা কলঙ্কিত ইতিহাস। তার অনাবিল জীবনের শুভ্র পৃষ্ঠাকে মসীময় ও কলঙ্কিত করে দিল তার মা। রতনের মাতৃকুল পেশাদার বাঈজী বংশ-পরম্পরায়।

রতনের মা প্রখ্যাত বাঈজী। বয়সকালে উপার্জন করেছে প্রচুর। জীবনকে উপভোগ করেছে আকণ্ঠ। বাঈজী সামাজিক জীব নয়। তার জীবনের আদর্শ ভিন্ন। নীতি ভিন্ন। ধর্ম ভিন্ন। তার জীবনের অন্তঃস্রোতে একটা বহমান সুরের ধ্বনি। তার প্রাত্যহিকতা গীতিমুখর। আনন্দ পরিবেশন করার জন্যই তার অস্তিত্ব। তার রক্তে তার স্নায়ুতে-শিরায় আনন্দের উদ্ধত স্বপ্ন। তার অস্তিত্ব একটা উৎকট আনন্দের সাধনা।

তারা শিল্পী।

প্রতিভাই শিল্পীর জীবনের মূলধন। তার ঐশ্বর্য। তার সম্পদ। চরিত্রের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।

রতনের মা কোহিনুর বাঈজীর প্রতিভার যেমন কদর ছিল, চরিত্রের ছিল তেমনি কুৎসা।

আর বাঈজীর চরিত্র নিয়ে কে-বা মাথা ঘামায়।

পিতার জীবদ্দশায় রতনের বিবাহ হয় এক ধনীর সন্তানের সঙ্গে। এবং অতি অল্পবয়সে রতন সন্তানের জননী হয়।

রতন জানবে কেমন করে কল্পনা করবে কেমন করে যে তার স্বামী তার সন্তানের পিতা, তার মায়ের গোপন প্রণয়ী। তার জার।

রতনের পিতা যতদিন জীবিত ছিল, কথাটা গোপন ছিল। কিন্তু তার পিতার মৃত্যুর পর কোহিনুর বাঈজীর প্রবৃত্তির আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠল। মেয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করতে ঘৃণা হল, সে রীতিমত স্পর্দ্ধার সঙ্গেই গোপনতার আবরন খুলে দিয়ে কন্যার স্বামীকে পুরোপুরি ভাবে দখল করে নিল। তার উৎকট মত্ততা প্রকাশ করে দিতে তার বাধল না। গ্রাহ্য করল না সে কারুকে। মেয়ের পানে চোখ ফিরে তাকালে না। তার ক্ষতিপূরণ করে দিল কলকাতার এই বাড়িখানা তাকে দান করে। নিষ্কৃতি পেল তাকে স্বামীর চোখের আড়াল করে দিয়ে।

প্রথম কটা দিন রতন স্তম্ভিত হয়ে রইল। সন্তানের জননী হলেও তখনো মন তার নিষ্পাপ অনাহত কুমারীর মত। দেহ ছাড়া বিয়ের পর মন তার একটুও বাড়তে পায়নি। স্বামী ওর কাছে তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পুরুষের স্পর্শ ওর দেহের আসন্ন যৌবনকে মদির করে তোলেনি। মনে ফুল ফোটায় নি। বিয়ের অনুষ্ঠান ও নীতির দিক থেকে সে স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। এবং স্বামীর সন্তানকে গর্ভে ধরেছিল সেই আনুগত্যের নিষ্ঠায়। স্বপ্নের ঘোরে।

মা আর স্বামী। নিরুপায় হয়েই রতন নীরবে সহ্য করেছিল। নইলে সে কি করত বলা যায় না।

রতন নতুন করে জীবনের পৃষ্ঠা ওলটালে। নতুন অধ্যায় রচনা করবার জন্য, জীবনের বিরাট শূন্যতা ঘোচাবার জন্য, অজানা, অনাবিষ্কৃত ঘাটের সন্ধানে দেহের তরণী নিয়ে তীরে তীরে ঘুরে বেড়াল। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর মন কোন প্রেমাসক্ত পুরুষের ভালো-

বাসার উষ্ণ আশ্রয় খোঁজে। নিঃসঙ্গতার শূন্যতায় মন খাঁ খাঁ করে। সে আর নিজেকে খাড়া রাখতে পারল না।

পথের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেললে রতন। উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া, বেহিসেবী হয়ে উঠল পুরুষের সঙ্গ লিপ্সায়।···অতীতের আবর্জনা ভেসে এসে তার চিন্তার নির্মলতাকে পঙ্কিল করে তোলে। তার মনে হয় দিনেশের কাছ থেকে সে অনেক দূরে। প্রণয়ী দূরে থাক সে তার কাছে বন্ধুতার দাবি পর্যন্ত করতে পারে না। তার জীবনের পঙ্কিল অতীত তার মনুষ্যত্বকে চাপা দিয়েছে। তার নারীত্বকে মিথ্যা করে দিয়েছে।

না। দিনেশের সঙ্গে সে নিজের কোন সমতা খুঁজে পায় না। পদে পদে অমিল। তাকে জয় করবার কোন আশা নেই।

অথচ সে তাকে চায়।

এমন ভাবে তাকে ফিরে যেতে সে দেবে না। তার নারীত্বের এত বড় অপমান সে সইতে পারবে না।

সে তার প্রতীক্ষা করবে। তার আশায় সে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে তার জন্য তপস্যা করবে।

তাকে সে চায়। সেই হবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র পুরুষ। তাকে জয় করবার জন্য সে প্রাণপণ করবে। তাকে তার পেতেই হবে।

সময়ের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সে প্রতীক্ষা করে।

সে বলে গেছে সে আসবে।

আসবেই সে। তার কথার দাম আছে। একজনের প্রতীক্ষায় নিজেকে সমর্পণ করে তাকে নিবিষ্টমনে ভাবার মাঝে যে এত আনন্দ এত রোমাঞ্চ জীবনে এই প্রথম অনুভব করল রতন।

জীবনে এমন করে ক্ষণ-পরিচিত কারুর জন্যে কখনো ভেবেছে বলে তো তার মনে পড়েনা।

না। সে হয়তো অনেককে ভাবিয়েছে। নিজে ভাবেনি।

তার হাসি পায়। এ ভাবার কি কোন অর্থ আছে নাকি? কোন মূল্য আছে নাকি? অনর্থক নিজেকে ক্ষয় করা। উদ্যমের অপচয় করা।

তিন দিন কেটে গেছে। তার কোন উদ্দেশ নেই। এই তিনটি দিন রতন নিরবলম্ব একটা ছায়ার মত শূন্যে দুলছে। পায়ের নিচে মাটি নেই হাত বাড়িয়ে ধরবার কোন আশ্রয় নেই। ভূতগ্রস্তের মত তন্দ্রার ঘোরে নিরবয়ব একটা ছায়ার মত সে সময়ের ঢেউ গুনছে। কিসের প্রতীক্ষায়? কার আশায়?

নিজেরি হাস্যকর মনে হয় রতনের।

কে সে যার জন্য এই প্রাণান্তকর প্রতীক্ষা? কতক্ষণেরি বা পরিচয়?

পথের আলাপ। ঘরে ডেকে এনেছিল লোভে পড়ে। তার নিছক কাঙালপনাকে সে একটা আশ্বাস দিয়ে গেছে। সেই আশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে এক অপরিচিত পুরুষের প্রতীক্ষা করা পাগলামী বই কি!

সে যদি কোনদিন আর না আসে, রতন কি আমরণ তার প্রতীক্ষা করবে না কি?

রতনের কিন্তু বুক কেঁপে ওঠে। সত্যই যদি সে কোনদিন আর না আসে, এত বড় অবজ্ঞার আঘাত সে সহ্য করবে কেমন করে?...

ভাবতেও যে বুক টন টন করে রতনের। না। এতো নিষ্ঠুর সে হবে না।

রতনের চোখদুটি জলে ভরে আসে। নিজেকে তার অত্যন্ত আহত ও বিধ্বস্ত মনে হয়।

পুরুষের বিরহে রতন বাঈজীর চোখে জল। অভিনব বই কি তার কাছে।

এক হপ্তা কেটে গেল। এক বছরের পরমায়ু নিয়ে একটি

হপ্তা তার বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য করে গেল। তার পাঁজর গুঁড়ো হয়ে গেল মনে হয়।

না। আর সে পারে না। তার ধৈর্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

এক হপ্তা সে জড়ের মত কাটিয়েছে। আর সে পারে না।

কিন্তু কি করবে সে? দিনেশের বাড়ির ঠিকানাটা পর্যন্ত তার জানা নেই।

হঠাৎ তার মনে হল, ইম্পিরিয়্যাল হোটেলের ম্যানেজার হয়তো তার সন্ধান দিতে পারে।

আর সে হাতগুটিয়ে বসে থাকবে না। একবার শেষ সন্ধান করে দেখবে। আজই সন্ধ্যায় সে হোটেলে যাবে।

কিন্তু হোটেলে তাকে যেতে হল না। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। বিকেলের দিকে দিনেশ এসে হাজির হল রতনের বাড়িতে।

অন্তরের প্রসন্নতা চাপা দিয়ে অভিমান-বিক্ষুব্ধ গলায় রতন বললে, কি ভাগ্যিস? হঠাৎ মনে পড়লো যে?

হাসল দিনেশ নিবিড় স্নেহে তার হাতদুখানি চেপে ধরে। বললে, মনে তো আসন পেতে বসে আছো রতন অহর্নিশি। মনে আর পড়বে কি? কদিন তবু যাচাই করে দেখলুম মনকে।

—কী বুঝলে?

ঠোঁট মুচড়ে হাসল রতন।

দিনেশ তার কোমল হাতদুটিতে জোরে চাপ দিয়ে বললে, মন এখন তোমার হাতের এই মুঠোয়। তুমি মুক্তি না দিলে এর মুক্তি নেই।

—তাই কি মুক্তি চাইতে এলে নাকি? বাঁকা চোখে প্রশ্ন করল রতন।

—না গো বিবি। মন আমার মুক্ত প্রান্তরের শীতের হাওয়া থেকে দেওয়াল ঘেরা একটি ছোট ঘরের উষ্ণতায় মুক্তির নিশ্বাস নিতে

চাইছে। মন আমার ক্লান্ত, আহত। আহত মন চায় ভালোবাসার আশ্রয়।

রতন নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। মুখে কথা ফুটল না। তার সান্নিধ্যের নিবিড়তায় তার মোহময় স্পর্শের উচ্ছ্বাসে সে নির্বাক হয়ে গেল। তার মুখের শানিত রেখাগুলি লাবণ্যে কোমল হয়ে এল। তার চোখের পীড়িত পিপাসা মুছে গিয়ে ফুটে উঠল সঙ্কোচের বিহ্বলতা। নব বধূর নম্র ব্রীড়া। শরীরে ঢেউয়ে উঠল সুষমার স্নিগ্ধতা।

দিনেশের মনে হল, এ রতন বাঈজী নয়। এর মাঝে মুক্তির নির্মলতা। এই কটি দিনে ও যেন ধূয়ে মুছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পুড়ে খাঁটি হয়েছে। ওর সেই ক্ষুধার আতুরতা নেই। পিপাসার প্রতিশয় নেই।

ও যেন নতুনত্বে ভরা সনাতনী।

ও চিরকালীন।

দিনেশ থেমে গেছে। আর এগুতে পারে না। যে সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিল তার ভিত ধ্বসে গেছে। সে যেন হঠাৎ ভেঙ্গে-পড়ার ভঙ্গিতে একখানা সোফার উপর বসে পড়ল। ম্লান মুখে রতনের পানে চেয়ে প্রার্থনার সুরে বললে, আমার কাছে একটু বসবে রতন ?

রতন নিঃশব্দে তার পাশে বসে স্থির অবিচল দৃষ্টি দিয়ে তার মুখপানে তাকাল। অন্তরে বিচলিত হলেও বাইরেটা তার শান্ত। ভিতরটা সঙ্গীত স্পন্দিত হলেও বাইরে নেই কোন আবেগ উচ্ছ্বাস। নেই কোন উৎক্ষেপ।

দিনেশ নীরবে তার হাতদুখানি নিজের তপ্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

মৃদু হেসে প্রশ্ন করলে রতন, কিছু বলবে ?

—বলতেই এসেছিলুম কিন্তু আর বলবো না। একটা মতলব নিয়েই এসেছিলুম। মত বদলেছি।

—কখন ?

—এখানে এসেই। তোমাকে দেখে।

—শুনতে পাইনা কী বলতে এসেছিলে এবং কেনই বা হঠাৎ মত বদলালে ?

রতনের ঠোঁটের কিনারে একটা চোরা শীর্ণ হাসি ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের নিচেটাও কেঁপে উঠল।

দিনেশ নিবিড় স্নেহে তাকে কাছে টেনে নিয়ে তরল কণ্ঠে বললে, না তোমার সঙ্গে লুকোচুরি করবো না। তুমিই বিচার করে বলো আমার কি করা উচিত।

—আমি বিচার করে বলবো তোমার কি করা উচিত ?

ভ্রূভঙ্গি করে হাসল রতন।

—হ্যাঁ। তুমিই বিচার করো। তোমার ওপর বিচারের ভার দিলুম। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।

—কথাটা কি তাই শুনি ?

—আজ সন্ধ্যায় আমার একটা নেমন্তন্ন আছে। একটা বাগান পার্টিতে। রাতভোর মাইফেল। অনেকেই গার্ল নিয়ে যাবে। নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে। আমি মনে মনে ঠিক করে এসেছিলুম যে—

একটু থামল দিনেশ। একটা ঢোঁক গিলে লাজুক গলায় বললে, ভেবেছিলুম কারুকে কিছু না বলে তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওদের রীতিমত সারপ্রাইজ করে দেবো।

—তারপর ?

—মত বদলে গেল।

—কেন ? আমাকে বলতে সমীহ হচ্ছে ? কিন্তু হচ্ছে ? না আমাকে গার্ল বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করছে ?

সোজা তার মুখের পানে চেয়ে দৃঢ়কণ্ঠে দিনেশ বললে, না সে ধৃষ্টতা আমার নেই। এখানে আসবার আগে পর্যন্ত খুব উৎসাহ নিয়েই এসেছিলুম এবং তোমাকে অনুরোধ করলে যে তুমি আমায় রিফিউজ করবে না তাও বুঝেছিলুম। কিন্তু এখানে এসে তোমাকে দেখে আমার সব উৎসাহ নিভে জল হয়ে গেল। আমার মত বদলে গেল।

—কেন? আমার মাঝে এমন কি দেখলে যা তোমার আনন্দ উৎসাহ নিবিয়ে দিলে?

—কী দেখলুম তা বলবার ভাষা আমার গলায় নেই। আমি কবি নই যে কাব্য সৃষ্টি করবো। তবে সে-দিন রাতের কুহকে আর নেশার চোখে যা দেখেছিলুম আজ তাকে সাদা চোখে দিনের আলোয় দেখলুম। দেখে চমকে গেলুম। মনে হলো, তোমাকে নিয়ে গিয়ে তোমার এই রূপকে কতকগুলো মাতালের কুৎসিৎ দৃষ্টির ভোগে লাগালে তোমার অপমান করা হবে। সে অধিকার আমার নেই।

কুটিল কটাক্ষ হেনে রতন হাসতে হাসতে বললে, সে অধিকার যদি আমি তোমায় দিই?

—সে অধিকারের অপচার করবো কেমন করে? অসম্মান করবো কেন?

একটু চুপ করে কি ভাবলে রতন, তারপর বললে, তবে কি করবে?

—আমরা যাবো না।

—তুমি ও যাবে না?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে রতন।

—না। আর রুচি নেই। মাতালের হৈ হুল্লোড়! গিয়ে কাজ নেই।

—কিন্তু বন্ধুবিচ্ছেদ হবে যে? তারা সব তোমার বন্ধু তো?

দিনেশ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, তোমার বিচার কি বলে? যেতে বলে?

—আমি কি বলবো? আমি তো জানিনা তারা তোমার কি রকম, কোন স্তরের বন্ধু?

—যে স্তরেরই হোক, না গেলে এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ হবে না। তা ছাড়া যারা সেখানে যাবে সকলের সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই।

—কোথায় বাগান?

—দক্ষিণেশ্বর। কালি মন্দিরের কাছে। গঙ্গার ধারে।

একটু থেমে রতনের মুখপানে উৎসুক দৃষ্টিতে বললে, তোমার যাবার বাসনা আছে?

—আমার বাসনার কথা ওঠে কেমন করে? তুমি আমায় নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলে আমায় যেতে হবে। তোমায় অভ্যর্থনাকে সম্মান দিতে হবে। নইলে—

—নইলে?

—আর কারুর কাছে তো আমার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

দিনেশ মাথা নিচু করে কি-ভেবে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বললে, না। আমার মন বলছে তোমাকে নিয়ে গেলে তোমার অসম্মান করা হবে।

খিল খিল করে হেসে উঠল রতন। কৌতুক করে বললে, আমাকে নাই নিয়ে গেলে। তুমি একা যাও না। আরো তো অনেক মেয়ে মানুষ যাবে? এতো বড়ো আনন্দটা নষ্ট করবে কেন?

রতনের ঠোঁটের ফাঁকে একটা কুটিল হাসির দুর্বল রেখা ভেসে উঠল। তার কোমল কণ্ঠস্বরে দিনেশ একটা বিদ্রূপের টান শুনতে পেলে। সে অধোবদনে অস্ফুট স্বরে বললে, না, একা আমি যাবো না।

ঝাঁঝালো গলায় রতন প্রশ্ন করলে, মন খারাপ হবে না তো? কোন আফশোষ থাকবে না তো?

হাসির ঝড় তুলে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে দিনেশঃ না গো, না। তোমার সঙ্গ তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ দেবে।

—মুখের কথা না মনের কথা? তেরছা চোখে তারপানে চাইল রতন।

দিনেশ হঠাৎ তাকে সবলে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললে, সবই কি আমাকে মুখে বলে বোঝাতে হবে? নিজে থেকে কিছু বুঝবে না? চোখ মেলে মনের পানে চেয়ে দেখবে না?

—চোখ কি আমার আছে?

রতনের গলার স্বর হঠাৎ বুজে এল। চোখ দুটি অশ্রুতে আকুল হয়ে এল। সে তার বুকের উপর মুখে লুকোবার চেষ্টা করলে। তার কালো এলোচুলের গহনে দিনেশের বুক ঢেকে গেল। দিনেশ তার চিবুক ধরে মুখখানি তুলে ধরল। রতনের শুভ্র গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। অশ্রুর তোড়ে তার চোখ দুটি হাঁপিয়ে উঠে বুঁজে এল। দেখাল তাকে একটি বর্ষণ সিক্ত ফুলের মত।

দিনেশ নীরবে অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই আশ্চর্য সুন্দর মুখ-খানির পানে তাকিয়ে রইল। সে বিস্মিত, বিমূঢ়, বিহ্বল। সে আত্মহারা হয়ে আকুল আবেগে তার অশ্রুসিক্ত মুখে চুমু খেল।

সেই মুহূর্তে তার হাত থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে রতন তার দিকে চোখ খুলে তাকাল। সে দৃষ্টিতে তীব্র বেদনার সঙ্গে আনন্দের একটা উজ্জ্বল আভা ঠিকরে পড়ল। তার হৃদয় জ্বলে উঠেই যেন ভেতরে গলে গেল। সে আঁচলে চোখ মুছে হৃদয়কে মুক্ত করে দিল দিনেশের দিকে। মুখে স্নিগ্ধ এক ফালি হাসি দেখা দিল। আরক্ত মুখে প্রথম অধিকারের বিজয় উল্লাস।

দিনেশ দ্বিধাজড়িত স্বরে প্রশ্ন করলে, অন্যায় করলুম ?

—আমার চেয়েও দুরন্ত আর দুষ্টু তুমি। বসো। আমি আসছি।

তার দিকে একটি মধুর কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রতন।

দিনেশের গতি গেল স্তব্ধ হয়ে।

বাইরের ঘনায়মান অন্ধকার ঘরের ভিতরটাকে ঝাপসা আর ঘোলাটে করে তুলেছিল। তারই একটা আঁধার কোণে, সোফায় গা ঢেলে দিয়ে চিন্তার গভীরতায় ডুব দিয়েছিল দিনেশ।

কী যে ভাবছিল সেই জানে।

—কী গো ঘুমিয়ে গেলে নাকি ?

সঙ্গে সঙ্গে জোয়ারের জলের মত আলোর বন্যায় ঘরখানা ঝলসে উঠল।

দিনেশ সোজা হয়ে বসে তাকিয়ে দেখল, অজস্র আলোয় তার দিকে ভেসে আসছে রতন।

সামনে এসে খিল খিল করে হেসে উঠল রতন। খরস্রোতা নির্ঝরিনীর মত শব্দায়মান সে হাসি।

—মাইফেলে যেতে পারলে না বলে মন খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

তন্দ্রালস চোখে তারপানে চেয়ে দিনেশ ঝাপসা গলায় বললে, দূর !

—তবে হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে ?

—কই না তো! গম্ভীর আমি কোন কালেই নই।

মাথা ঝাড়া দিয়ে হাসল দিনেশ। প্রশংসা ভরা মুগ্ধ চোখে চাইল তারপানে। অপরূপ মনে হলো তার রতনকে। তার সর্বাঙ্গে চোখ দুটো নেচে বেড়াতে লাগল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখা আর ফুরোতে চায় না। জলধারায় ধোয়া তাজা ফুলের মত দেহে তার

স্নিগ্ধতার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরজুড়ে একটি অনির্বচনীয় কৃশতা। লাবণ্যের লালিত্যে নেই লালসার লাস্য। সাজের আড়ম্বর নেই, প্রকাশের দৈন্য নেই। বসন্ত বিদীর্ণ বনানীর শ্যামলতা তার সর্বাঙ্গে উছলে পড়ছে।

রতন তার পাশে বসে গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললে, সত্যি বলো, মন খারাপ হয়নি তো? আমি তোমার আমোদ মাটি করে দিতে চাই না। লজ্জা করো না। আমাকে নিয়ে যেতে চাও, স্পষ্ট বলো, আমি যাবো।

দিনেশ তার হাতদুটি চেপে ধরে গলায় জোর দিয়ে বললে, না রতন না। তোমাকেও নিয়ে যাবো না। আমি ও যাবো না। আমি আমার মন ঠিক করেছি। আর ও-কথা তুলে আমায় লজ্জা দিও না।

রতন তার স্নিগ্ধ দৃষ্টির পল্লব ছায়ায় তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। অধরে ফুটে উঠল একটি কমনীয় করুণ হাসি। একটু পরে আচ্ছন্ন, অবশ গলায় প্রশ্ন করলে, আচ্ছা এ রকম কতো মাইফেলে গেছো, বলবে?

—একবার। একটি মাত্র মাইফেলে আমি গিয়েছিলুম—মাস ছয় আগে।

—মেয়েমানুষ নিয়ে?

—না। আমি মেয়েমানুষ নিয়ে যাইনি। নিয়ে যাবার মত কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল না।

কী বলতে গিয়ে জিব থেকে কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে রতন বললে, আজ তবে গেলে না কেন?

দিনেশ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বললুম না এখানে এসেই আমার মনের চেহারা গেল বদলে। মূর্তিমতী নিষেধের মত তুমি আমার হাত ধরে টান মারলে।

প্রসন্ন হাসিতে রতনের মুখখানি জ্বলে উঠল: ভারি দুষ্টু! আমি তো মানা করিনি।

—না। মুখ ফুটে তুমি মানা করোনি। তোমার মাঝের অদৃশ্য নারী আমায় নতুন আলো দেখিয়েছে। নতুন পথের ইশারা দিয়েছে। আমরা সেই পথেই চলবো। পরিমিত, পরিচ্ছন্ন পথ।

সে মার্চের ভঙ্গিতে ঘরের মেঝেয় পাইচারী করতে লাগল।

তার ছেলেমানুষী খুশি দেখে রতনের মনটা ভিজে উঠল।

দিনেশ বললে, আজ তোমার গান শুনবো রতন! তোমার গানের সুরে স্নান করিয়ে আমার অস্থির, অপরিচ্ছন্ন জীবনকে শান্ত ও সংযত করে তোল। আমার বেসুরো বেতালা জীবনকে সঙ্গীত মুখর করে তোল।

ঠোঁট মুচড়ে হাসলে রতন। প্রশ্ন করলে, ড্রিঙ্ক করবে না?

—না। না। আজ আমরা ঘর গেরস্তির মতো ঘরের রান্না খাবো। কোন আড়ম্বর নয়। কোন নেশা নয়।

রতনের কাছে সরে এসে তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললে, আমার অধরে যে নির্ভেজা তপ্ত মদের স্বাদ দিয়েছো তারি নেশায় মাতাল হয়ে আছি। আর নেশার দরকার নেই।

আত্মপ্রসাদে রতনের গৌর গণ্ডদুটি লাল হয়ে উঠল।

॥ সাত ॥

দেবশ্রী মূর্খ নয়। দেবশ্রী দুর্বল নয়। কঠিন মর্তের মাটিতে অভাব অনাটনের গেরস্ত সংসারে সে মানুষ হয়েছে। তার মনের মাটি শক্ত। স্বপ্নের ঢেউ লেগে সে কঠিন মনের তট ভাঙতে পারে না। কেশরকে কেন্দ্র করে ক-টা দিন সে তার একঘেয়ে জীবনে যে স্বপ্নলোক রচনা করেছিল, তার মোহাবেশে সে বিভ্রান্ত হল না। তার বিরহ বেদনায় সে চপল বালকের মত হায় হায় করল না। সে জানত তার জীবনে কেশরের আকস্মিক আবির্ভাব, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একটা অমোঘ ঘটনা মাত্র। অপ্রাকৃত না হলেও অসাধারণ ঘটনা।

ঘটনার রঙ্গভূমি এই মর্তলোকের জীবন। জীবনে ঘটনা ঘটবে বই কি। ঘটনা বিহীন জীবন বিস্বাদ, বিরস। বৈচিত্র্য-বর্জিত। ঘটনা-বৈচিত্র্য জীবনের স্বাদ। জীবনের স্মারক। জীবনের ইতিহাস। তাকে ভোলা যায় না। তাকে নিয়ে মাতামাতি করাও চলেনা।

দেবশ্রীর অনাহত তরুণ জীবনে একটা আলোর ঝলকানির মত কেশরের হৃদ্যতা তাকে এক নতুন রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেল। এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূতির স্পর্শ দিয়ে গেল। হৃদয়ের নিভৃত স্মরণাগারে সে তাকে চিহ্নিত করে রাখল। সে দিশাহারা হল না। পথ ভুল করল না।

কেশর তাকে তো ভুল পথের ইশারা ইঙ্গিত দেয়নি। তাকে সত্যপথের নির্দেশ দিয়ে গেছে। তাকে চোখে আঙুল দিয়ে সম্ভাব্য ভুলপথের রাঙা নিশানা দেখিয়ে সতর্ক করে দিয়ে গেছে।

স্টেশনে গিয়েছিল দেবশ্রী কেশরকে সি-অফ করতে।

ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পাটমেণ্টের একটি বার্থ। ট্রেনের একান্তে পাশে বসিয়ে কেশর স্নেহশীলা আত্মীয়ার মত দেবশ্রীকে বলেছিলো, আমার সঙ্গে যা বাজালে বাজালে আর কোন বাঈজি বা মেয়ে-মানুষের সঙ্গে এখন বাজিয়ো না। আর রতন ডেকে পাঠালেও বা পথে ঘাটে হঠাৎ দেখা হলেও, তার ওখানে যাবে না।

সে-দিনের স্মৃতি দেবশ্রীর চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। কেশরের বেদনা-বিধুর মুখখানি তার মন থেকে নড়তে চায় না। কেশরের সবভুলে গেলেও সে-দিনের সেই মুখখানি তার মনের পটে মুদ্রিত হয়ে থাকবে।

ট্রেন ছেড়ে দিলে কেশরের চোখ দুটি জলে ভরে এসেছিল। তার হাতের উচ্ছ্বসিত প্রীতি-স্পর্শ দেবশ্রীকে বিচ্ছেদ বেদনায় আকুল করে তুলেছিল।

প্লাটফরম ছেড়ে ট্রেন বেরিয়ে গেলেও দেবশ্রীকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল শূন্য প্লাটফরমে,—নিজেকে সামলে নেবার জন্য।

নিজেকে সামলে নিয়ে, চোখ থেকে স্বপ্নের অঞ্জন মুছে ফেলে, ফিরে এলো দেবশ্রী পুরেনো জীবনের নিঃসঙ্গ একাকীত্বে। পূর্ণ উদ্যমে ডুব দিল পূর্বের মত লেখাপড়ায়। সামনে তার পরীক্ষা। নিজেকে সোজা করে তুলে ধরল পরীক্ষার প্রস্তুতিতে। নতুন উৎসাহে, নতুন প্রেরণায় সে তার স্বপ্নলোক থেকে নেমে এল রূঢ় বাস্তবের কাঠিন্যে। কেশর তার সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

এ তার নব জাগরণ।

কেশরের স্মৃতি তার জীবনের নতুন আশ্বাস। কেশরের পরিচয় তার পরম প্রেরণা। কেশরের শুভেচ্ছা তার জীবন দেবতার প্রসন্ন আশীর্বাদ।

কেশরের জন্য মোহ রইল না মনে। আকুলতা অধীরতা গেল

নিশ্চিহ্ন হয়ে। সতর্ক শুভানুধ্যায়ী প্রিয় বান্ধবীর মত কেশর জেগে রইল তার মনের মনিকোঠায়।

কেশর তার টাকার বিনিময়ে কিনে দিয়ে গেছে একটা সোনার রিষ্টওয়াচ। কেশর ঘড়িটা তার হাতে পরিয়ে দিয়ে কৌতুক করে বলেছিল, এ-ঘড়ি নয়, আমার চোখ। এর মধ্যে দিয়ে আমি তোমায় ওয়াচ করবো।

ঘড়িটার মাঝে কেশরের স্পর্শ পায় দেবু। ঘড়িটার টিক টিক শব্দের মাঝে কেশরের কণ্ঠ শুনতে পায়। কেশর যেন তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে, এগিয়ে চলো বন্ধু, এগিয়ে চলো। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দেবশ্রীর মন বলে কেশরই একদিন তার সৌভাগ্যের দোর খুলে দেবে। তাকে যশস্বী করে তুলবে।

জুলাই মাসে দেবশ্রীর পরীক্ষা।

আর মাস খানেক বাকি। দেবশ্রীর নিশ্বাস নেবার সময় নেই। স্তূপীকৃত পুঁথিপত্রের মধ্যেই দিনরাত কেটে যায়। সময়ের হিসেব নেই। খাবার সময় দেবিকা তাকে তুলে নিয়ে যায়।

বর্ষা নেমেছে। নির্মেঘ আকাশ বড়ো একটা চোখে পড়ে না। সারা দিনরাত আকাশ ঘোলাটে। ধূসর মেঘে ঢাকা। রাত্রে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে বিছানা ভিজে যায়। ছুটতে ছুটতে দেবিকা এসে ঘরের জানলা বন্ধ করে দিয়ে যায়।

ধ্যানী বুদ্ধের মত নির্লিপ্ত মুখে সে দেবিকার দিকে চেয়ে দেখে। হয়তো বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করে,—কি রে ?

—বিষ্টি ! বিষ্টি !

খিল খিল করে হাসে দেবিকা।

দেবশ্রী খোলা বইয়ের পাতায় ঝুঁকে পড়ে ধমক দেয় : বিষ্টি তা তোর কি ?

—আমার আবার কি? বিষ্টিতে তোমার বিছানা ভিজছিল তাই জানলা বন্ধ করে দিলুম।

মাথা না তুলেই দেবশ্রী বলে, লক্ষ্মী মেয়ে। লক্ষ্মী বোনটি আমার!

দেবিকা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কিছু খাবে?

—এক কাপ চা দিস।

—না চা আর দোব না। বেশী চা দিতে বাবা মানা করেছে।

—তবে যা। কিছু দিতে হবে না। তুই একটা লজেন্স খা।

লজেন্সের শিশিটা তার দিকে এগিয়ে দেয়।

আনত ভঙ্গিতে লজেন্স নিতে নিতে দেবিকার চোখে পড়ে রিষ্ট ওয়াচটা। একখানা মোটা বইয়ের উপর পড়ে আছে ঘড়িটা।

দেবিকা জিজ্ঞেস করে ঘড়িটায় ঠিক সময়ে দম দিচ্ছো তো?

চমকে উঠে দেবশ্রী ঘড়িটার পানে সতৃষ্ণ নয়নে মুহূর্ত তাকায়। ঠোঁটের ফাঁকে এক ঝলক হাসি ভেসে ওঠে বর্ষার কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝলকানির মত।

দেবিকা হাসতে হাসতে ভ্রূভঙ্গি করে বলে, মাঝে মাঝে এমনি হেসো দাদা। নইলে হাসতে ভুলে যাবে।

ভ্রূকুটি করে দেবশ্রী ধমকে দেয়ঃ যা পালা। দুষ্টুমী করিস না।

যেতে যেতে বাঁকা চোখে ঝিলিক দিয়ে দেবিকা বলে, বুক ভরে মাঝে মাঝে দম নেওয়া ভালো।

দেবশ্রী ঘড়িটার পানে তাকায়। ঘড়ির ডায়ালে কেশরের হাসিভরা মুখখানা ফুটে ওঠে।

দিন দুই পরে সকালের ডাকে লক্ষ্ণৌ-এর ছাপ বুকে করে একখানা খামের চিঠি এল।

দেবশ্রীর বুক দুর দুর করে উঠল। কম্পিত হাতে চিঠিখানা খুললে।

ছেলেমানুষী অপটু হাতের গোটা গোটা বাঙলা হরপে লেখা ছোট্ট চিঠি ঃ

প্রিয় দেবু,

তোমাকে চিঠি লেখবার জন্যে বাঙলা শিখছি। ক-মাসে যতটুকু শিখতে পেরেছি, তারি নমুনা পাবে এই চিঠিতে। মনের কথা গুছিয়ে লেখবার মতো হাত পেতে এখনো বহুৎ দেরি। তবে তোমার কুশল নেবার এবং আমার কুশল জানাবার মতো যতটুকু শিখেছি তাই লিখছি। তুমি কেমন আছ? তোমার পরীক্ষা কবে? বাজনা বন্ধ রেখে এখন পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছো এবং ভালো করেই পাশ করবে নিশ্চয়ই। দেবিকা এবং তোমার বাড়ির সকলে শারিরীক কুশলে আছেন আশা করি। পরীক্ষার পর যদি বেনারস আসো নিশ্চয়ই কিন্তু লক্ষ্ণৌ ঘুরে যাবে। আমাকে চিঠি দিও। আমার ভালোবাসা নিও। কলকাতার দিনগুলিকে ভাবতে গেলেই তোমাকে মনে পড়ে। মনে খুব আনন্দ পাই।

তোমার বন্ধু

"কেশর"

দেবশ্রী আনন্দিত হলো। চমকে গেল! "তোমাকে চিঠি লেখবার জন্যে বাঙলা শিখছি"...এরি মধ্যে শিখেছেও তো কিছুটা।

কিন্তু কেন?

ঐ একটি ছত্রের মাঝেই যেন তার নিভৃত অন্তরের সব কথা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একটি মামুলি ছত্রের মাঝে কত কবিতা, কত গান, কত ছন্দ। জীবনের পরম সত্য যেন ঐ ছত্রটির মাঝে প্রতীয়মান।

একটা মহান সঙ্গীতের সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল দেবশ্রীর মনে। একটা অননুভূত রস সঞ্চারিত হলো তার মর্মে। বসন্ত বিদায়নের

মত ঐ ছত্রটি তার নিষ্পত্র জীবনশাখায় ফুল ফোটাল। তার বন্ধুতাকে মহিমান্বিত করল।

এতটা ভাবেনি দেবশ্রী। ভাবতে পারেনি। দূরের কেশর নতুন করে তার কাছে এসে দাঁড়াল। হিতৈষী বান্ধবীর মত তার পরিশ্রান্ত উত্তপ্ত ললাটে কল্যাণ করস্পর্শ করল। তার বিস্বাদ ক্লান্তিকর জীবনে একটা নতুনতরো মধুর স্বাদ এনে দিল।

এ লিপি নয়। একটা ঐশ্বর্য। তার জীবন সম্পদ। এই লিপি রচনার জন্য লিপিকার একটা নতুন ভাষা অধ্যয়ন করছে। নিজের অন্তরের বাণীকে প্রিয়জনের ভাষার রূপ দেবার জন্য নতুন অক্ষর পরিচয় করছে। সে নিজেকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে চায়। তার গভীর অন্তরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে চায় বাঙলা বর্ণপরিচয়ের মধ্যে দিয়ে। তার এই মনোভাবকে প্রশংসা না করে পারে না দেবশ্রী।

এই দীর্ঘ দিনের নিঃশব্দতা যেন একটা নির্গমনের পথ তৈরি করছিল। ছিদ্র পেয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে এসেছে। দেবশ্রীকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। লজ্জা দিয়েছে। বিস্মৃতির আবছায় যাকে সরিয়ে রেখেছিল এতদিন সে উজ্জ্বল আলোক বন্যার মত অকস্মাৎ বেরিয়ে এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। তাকে বিস্মিত করেছে। তাকে অপরিসীম লজ্জা দিয়েছে। সে তাকে ভোলেনি। সে সাধনার আসন পেতে বসে বাণীর তপস্যা করেছে এই দীর্ঘদিন দীর্ঘমাস তাকে উপহার দেবার জন্য তার সাধনা-লব্ধ ধন।

দেবশ্রীর মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

গামছা কাঁদে ফেলে সে গাইতে গাইতে নিচে স্নান করতে গেল :

বাবুল মোরি নৈহারা ছুট যায়···

দেবিকা অনেকদিন পরে তার মুখে গান শুনতে পেয়ে খুশি হল। এই নাকি তার দাদার আসল রূপ।

দেবিকা বললে, ব্যাপার কি বলো তো দাদা। আজ এত খুশি কেন? বোবার মুখে গান ফোটালে কে?

দেবশ্রীর বুকের নিচে ভাবের জোয়ার। গৌরবে আত্মপ্রসাদে তার বুক ভরে আছে। তার বুক খুলে বোনটিকে দেখাতে ইচ্ছে হল। লোভ হল বলে, দেখ আমার এমন বন্ধু ও ত্রিসংসারে আছে যে আমার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে বাঙলা ভাষা শিখছে। কিন্তু বলতে পারলে না। সাহস হল না। হাসতে হাসতে বললে, এ শীতের কাঁপুনি রে দেবি। দিন যত ঘনিয়ে আসছে হাড়ে কাঁপুনি ধরছে। এ গান হলো সেই কাঁপুনির তোড়।

—তাই বুঝি?

খিল খিল করে হেসে উঠল দেবিকা। তারপর চোখ পাকিয়ে বললে, তোমারও যদি পরীক্ষার ভয়ে বুকে কাঁপুনি ধরে, তবে অন্য ছেলের সঙ্গে তফাৎটা কোনখানে? কিসের ভালো ছেলে?

মুখ ভেংচে দেবশ্রী বললে, ভালো ছেলে না হাতি? তোমার দাদা বলে একেবারে স্বয়ম্ভু কি না?

কেশরের সংসার নীরব। নিঃশব্দ। সংসারে তার কোলাহল কলরব নেই। বাইরে সে উৎসব-মুখর রজনী। শোভা-গন্ধ বিমণ্ডিত আলোকোজ্জ্বল ইন্দ্রপুরী। অমরেশের প্রেয়সী সুধাকণ্ঠী অপ্সরা। ভিতরে সে কোলাহলের নিবৃত্তি। আনন্দের অবসাদ। এখানে সে একা। নিঃশেষে স্বাধীন। আবিল কুয়াশার অন্তরালে এক ফালি নির্মল আকাশ। সে কুমারী। পরিচ্ছন্ন তার গৃহকোণ। মধুর নিঃশব্দতা। রাতের নিস্তরঙ্গ নদী। অপরিবর্তনীয় তার পথ। অচঞ্চল তার গতি। তটের সন্ধানে সে মাথা কোটে না। হয়ে হাহাকার করে না। নিজের সম্বন্ধে সে উদাসীন।

নির্বিকার। নির্লিপ্ত। সঙ্গীত সাধনাই তার জীবন। আনন্দ বিতরণের জন্যই তার অস্তিত্ব। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে বাঈজী। সে নর্তকী। অন্তরে সে সাধিকা। সুর-সাধিকা।

সে রাগিনী। রাগ সন্ধানই তার যৌবনের ক্ষুধা তার জীবনের তপস্যা। সেই তপস্যার ঘোরেই যৌবন তার সমাহিত শান্ত। কিছুটা কঠোর ও তেজোদ্দীপ্ত। নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করে বহুদিনের অভ্যাসে সে খানিকটা কৃত্রিম ও কঠিন হয়ে গেছে।

অনেকের চোখে তার সেই কঠোরতা তার সেই সতেজ সংযম প্রচণ্ড বিস্ময়। দূর থেকে অনেকেই তার সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু কাছে যাবার ভরসা পায় না। প্রণয় নিবেদন করবার প্রশ্রয় পায় না। তার শরীরে কঠোর তপোদীপ্ত সৌন্দর্য দেখেই দূর থেকে ফিরে যায়।

সঙ্গীত সাধনা ছাড়া যে তার জীবনের কোন বৃহত্তর সার্থকতা আছে বা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে এ চেতনা তার ছিল না। ছিল না তার যৌবনের কোন অভাববোধ। নিজের মাঝেই সে নিজে সম্পূর্ণ ছিল।

লক্ষ্ণৌ-এর দুলালী বাঈজী। সারা উত্তর প্রদেশে তার যশোসৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল।

অনেক রাজা মহারাজা তার অনুরাগী। সঙ্গীত ও সৌন্দর্য অনুরাগী। অনেকেই তার সঙ্গলাভের জন্য অর্ধেক রাজত্ব পণ করতে প্রস্তুত। কেউ কেউ তাকে জীবনে অনুগামিনী হবার প্রস্তাব ও পাঠিয়েছে। রাজ অন্তপুরের অন্তপুরিকা হবার সম্মান দিতে চেয়েছে। কেশর তাদের হাসিমুখে সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেছে। শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-স্বজন এবং অভিভাবকদের মনোভঙ্গ করেছে।

তার অভিভাবক বলতে একমাত্র নানী। নানী জানে তার মনের কথা। নানী তাকে বোঝে। সে বোঝে তার নানীকে। বোঝাতে তার দেরী লাগে না। নানী তার প্রিয় সখি। নানী তার

সহচরী তার অস্থিমজ্জা। নানীকে স্পষ্ট বলেছে সে, রাজা-মহারাজা হোক আর স্বর্গের ইন্দ্রই হোক বহুপত্নীককে সে বিয়ে করবে না। নানী হাসিমুখে তার গাল টিপে দেয়। বলে, রামের জানকী হবি।

—হাঁ। আমি যখন একজনকে নিয়ে জীবন কাটাবো সে কেন পারবে না একজনকে নিয়ে সুখি হতে? আমাকে যে নিতে চাইবে তাকে একা আমাকেই নিতে হবে।

নানী হাসিমুখে বলে, তোকে বিয়ে করতে হবে না। যেমন আছিস তেমনি থাক।

—বিয়ে তো আমার হয়ে গেছে নানী গীতের সঙ্গে। ওর চেয়ে ভালোবাসতে আমি মানুষকে পারবো না।

—মানুষ না হলে যে আবার মানুষের চলে না। হাওয়া খেয়ে তো শুধু প্রাণ বাঁচে না।

নানী হাসে। কেশর বাঁকা চোখের কোণ দিয়ে তাকে শাসায়।

কলকাতা থেকে ফিরে কেশর নানীর সামনে দাঁড়াতেই তার মনে হল কেশরের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। গায়ের গৌরবর্ণ গৌরতর হয়েছে। চিকণ আর মসৃন হয়েছে তার ত্বক। হাসির জলুষ বেড়েছে। ঢেউ বদলেছে। দেহের স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটেছে। নানীর মনে হল তার মনের আকাশে নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। নতুন আলো জ্বলেছে। কী যেন একটা আনন্দময় শুভসংবাদ বহন করে এনেছে সে তার জন্য। বলবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে অথচ বলছে না। বলবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না, অথবা দুষ্টুমী করে বলছে না।

না বলুক। নানীও তাকে প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চায় না। সময়মত নিশ্চয়ই বলবে। তাকে না বলে বলবে সে কাকে?

নানীর বুঝতে বাকি থাকে না কলকাতা থেকে সে নতুনতরো জীবনের স্বাদ নিয়ে ফিরেছে। অন্তরের উপলব্ধিতে সে ছিল

এতোদিন উদাস, নির্লিপ্ত, অশরীরী। চরিত্রের উজ্জ্বলতায় ছিল একটা দৃপ্ত কাঠিন্য। সে যেন হঠাৎ বর্ষা-সিঞ্চিত মাঠের শ্যামলতায় কোমল আর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এতোদিন পরে সে যেন হঠাৎ নিজের দিকে চোখ ফিরে তাকিয়েছে। অনর্গল দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে দেখছে। আকাশ দেখছে। সে যেন আবার ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। সে অকারণে হাসে। অপরিমিত হাসে। বনহরিণীর মত চঞ্চল চোখে চারিদিকে চায়। ময়ূরীর মত পেখম মেলে বাড়িময় নৃত্যের ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করে। মেঘ দেখে ময়ূরী যেমন কেকা রব করে ওঠে, কেশরও তেমনি কে-জানে থেকে থেকে কার উদ্দেশে গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে ঃ বাবুল মোরি—

নানীর ভালো লাগে তার এই নতুনতরো প্রাণস্পন্দন। তার এই উচ্ছল যৌবন-চাঞ্চল্য।

নানী মনে মনে হাসে। মুখ ফুটে কিছু বলে না তাকে।

কেশর বলে, নানী বাঙলা লেখাপড়া শিখবো। একজন বাঙালী মাষ্টারনী ঠিক করেছি। কাল থেকে আসবে। একশো টাকা তলব নেবে।

কপালে চোখ তুলে নানী তার পানে চায় ঃ কেন হঠাৎ ? বাঙলা আমাদের কি হবে ?

কেশর হাসে। বলে, বাঙলা বুলি বড়ি মিঠা। বাঙলা গীত শিখবো।

নানী হাসে।

ঠাট্টা করে বলে, বাঙলা দেশে গিয়ে কোন বাঙালীর সাথে মহব্বৎ করে এলিনাতো ?

কেশর তার গলা জড়িয়ে ধরে খিল খিল করে হাসে। হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা নানী, তোমার মহব্বতের কথা মনে আছে।

—আছে বই কি ! কিন্তু সে-যুগের মহব্বৎ এ-যুগে অচল।

আমাদের যখন সাদি হলো তখন আমার উমোর দশ বছর। মহব্বতের উমোর পৌঁছিতে আরো পাঁচটা বছর কেটে গেল। তোর নানা ছিল আমার চেয়ে বিশ শাল বড়ো। আরো ছিল আগের তিন বউ, আর তিন বউয়ের সাঁতটা ছেলেমেয়ে। তোর নানাকে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসতো। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যেত। আমি সকলের ছোট বলে আমার ওপর তোর নানার নেক-নজর ছিল। উমর কম বলে পিয়ার করতো আমাকে। আমার বুকে মহব্বতের রোশনি জ্বালতে পারলে না। আঁধারেই জন্ম হলো তোর আম্মার।

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল কেশরের ঠোঁটে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। নানী বললে, আমাকে একটু বেশি পিয়ার করতো বলে আম্মার সতিনীরা আমায় ধরে মারতো।

—সত্যি? তবে আমাকে সতিনীর ঘরে দিতে চেয়েছিলে কি করে?

—আমি তো দিতে চাইনি। আর সে যে রাজার ঘর। রাজার ঘরের কায়দা-কান্মন আলাদা। এক রাণী নিয়ে কি রাজা বাদশারা ঘর করে? রাণীদের একটা আলাদা মহল। ফুল বাগিচার মত।

কেশর ঠোঁট মুচড়ে হাসল: হাতিশালে হাতির মত, ঘোড়াশালে ঘোড়ার মত, রাণীশালে অগুনতি রাণী। রাজার যে-দিন যার ওপর মর্জি হবে সে-দিন তার কামরায় গিয়ে পায়ের ধুলো দেবে। আর সব রাণীরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে। মুখে আগুন! এরি নাম মহব্বৎ নাকি? এই কি রাণী হওয়ার স্থখ নাকি?

কেশরের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। তাকে উত্তেজিত মনে হল।

হাসতে হাসতে নানী বললে, তুই কি রকম মহব্বৎ চাস তাই বল। কসিস করে দেখি। আর কবে সাদি করবি ভাই? উমর

যে পেরিয়ে গেল ? আমি থাকতে থাকতে কর। ছুটো দিন তোদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে যাই।

উদাস স্খলিত কণ্ঠে কেশর প্রশ্ন করলে, আমার উমর কতো হলো গো নানি ?

—তা পঁচিশ শাল হবে বই কি !

হেসে গড়িয়ে পড়ল কেশর ঃ পাঁচ বছর আগে বলেছিলে পঁচিশ। এখনো পঁচিশ ? তুমি তা-র আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছো না যে পাঁচ বছর হাতে রেখে বলবে ?

গম্ভীর হয়ে নানী বললে, পঁচিশ না হয় ছাব্বিশ। তার বেশি কক্ষনো হবে না। এই তো সে-দিন চোখের সামনে জন্মালি ? তার তিন মাস পরেই তোর মা চোখ বুজলো ঐ এমাম্বারা হাসপাতালে।

নানীর চোখ ছুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। ঝাপসা গলায় বললে, মায়ের বুকের ছুধ পেলি না। আমার এই শুকনো মাই ছুটো চুষে বেঁচে রইলি।

কেশর অন্যমনস্কে কি ভাবছে। মন যেন তার পৃথিবীর ওপারে। তাকে দেখাচ্ছে যেন দিগন্তরেখার মত অস্পষ্ট আর ঘোলাটে। ছায়ার মত শীতল। প্রদীপ-শিখার মত নির্বাক কুণ্ঠিত। সঙ্কেতের মত মৌন। নানী নিঃশব্দে তার মাথার চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

অভিভূতের মত কেশর প্রশ্ন করলে, আচ্ছা নানী, বাপজান কি আমার এখনো বেঁচে আছে মনে হয় ?

একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নানী উত্তর দেয়, ভগবান বলতে পারেন। তোর মা মারা যাবার পরই সে ভেঙ্গে পড়লো। ঘর-ছাড়া হয়ে কিছুদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালো। মাঝে মাঝে ফিরে আসতো। তারপর হরিদ্বার থেকে শেষ খবর পেলুম কেদার-বদ্রি গেছে। আর ফিরলো না। কোন খবরও পেলুম না। তখন তোর বয়স ছু-বছর।

—বাবার নাম ছিল হরিশ্চন্দ্র না?

—হ্যাঁ। পুরাণের রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতই ছিল তার তেজস্বী রূপ।

—খুব বড় গাইয়ে ছিলেন, তোমার মনে পড়ে তাঁর গান?

বিষণ্ণ হাসিতে নানীর মুখখানি ভরে গেল। এখনো তার গলার সুর আমার কাণে লেগে আছে। সে সুর যে একবার শুনেছে সে ভুলতে পারে না। এই তো সে-দিনের কথা। গোমতীর ঘাটে বসে যখন তোর মা আর বাবা সুরে সুর মিলিয়ে ভজন গাইতো লোকে বলতো কৈলাস থেকে হরপার্বতী নেমে এসেছেন গোমতীর তীরে। তাই এ বাড়ির নাম হলো কৈলাস ধাম।

—তাই বুঝি?

পিপাসার্ত চোখে কেশর নানীর মুখপানে চায়।

নানী বলে, আসলে হরিশ ছিল পরম সাধক। সাধনার জোরে অমন কণ্ঠ পেয়েছিল। তার আশীর্বাদে তুই তার রূপ আর গলা পেয়েছিস।

কেশর বললে, মায়ের ছবি আছে। বাবার একখানা ছবি নেই যে তাঁর মূর্তিকে পূজো করবো।

নানী বললে, আসলে হরিশ ছিল সাধু সন্ন্যাসী। সংসার-বৈরাগী। তোর মা তাকে তার সাধনার আসন থেকে নামিয়ে এনেছিল সংসারে। তোর মার মহব্বৎ আর সেবা তার ধ্যান ভাঙ্গিয়েছিল। সে-কালে অপ্সরীরা যেমন মুনি ঋষিদের ধ্যান ভাঙ্গাতো। তোর মা ছিল অপ্সরীর মতই রূপবতী আর সুধাকণ্ঠী। তার মহব্বৎ দিয়ে সে তাকে জয় করে এনেছিল।

উৎপিপাসু কণ্ঠে কেশর বললে, সেই কোথায় কুম্ভমেলায় প্রথম দেখা হয়—না?

—হ্যাঁ। প্রয়াগের কুম্ভমেলায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করল নানী। কেশর তার গায়ে

ধাক্কা দিয়ে অধৈর্যের মত বললে, চুপ করলি কেন, বলনা নানি কেমন করে তাদের পরিচয় আলাপ হলো, কেমন করে তাদের বিয়ে হলো—

নানী উঠে দাঁড়াল। ধমকের সুরে বললে, যা। আর শুনতে হবে না সে-সব কথা। তুই তাদের মেয়ে।

—তাদের মেয়ে বলেই তো জানবার আমার অধিকার আছে। যারা আমায় সংসারে নিয়ে এলো তাদের আমি পরিচয় জানবো না? তাদের আমি চিনবো না? বা, রে।

নানী মুখ ঘুরিয়ে হাসিমুখে বললে, মাবাপের মহব্বতের কথা মেয়েকে শুনতে নেই।

নানীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে কেশর বললে, সেই মহব্বতে যে আমার জন্ম নানী। সেই মহব্বতের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে আমার রক্তে। আর কি-এমন কথা যে আমাকে শুনতে নেই? আমি তার কচিখুকি নই।

নানী তাকে আদর করে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু তোর কি হয়েছে বলতো? কই, এ-সব কথা তো আগে জানবার ইচ্ছা হয়নি। আগে তো কখনো জানতে চাস নেই?

—আগে অন্ধ ছিলুম বলে কি চিরদিনই অন্ধ থাকবো নাকি? চোখ যখন পেয়েছি তখন এই পৃথিবীটাকে চোখ মেলে দেখবো না?

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নানী আর্দ্র গলায় বললে, দেখবি বই কি ভাই? কিন্তু কে চোখ ফোটালো বলবি না?

—বলবো ভাই, সময় হলেই বলবো। ভয় কি? জিব বের করে মুখ ভ্যাঙচায় কেশর।

লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে নানী বলে মায়ের মেয়ে বলেই ভয় হয়।

মুখ তুলে কেশর দৃপ্ত গলায় বলে, ভুলে যেয়ো না নানী আমি বাঈজী।

॥ আট ॥

বিকেলে কেশর দেবশ্রীর একখানা চিঠি পেল। খামের মোড়কে একখানি সঙ্ক্ষিপ্ত চিঠি। তার চিঠির উত্তর। দেবশ্রীর পরীক্ষা সন্নিকট। পরীক্ষার যে তারিখ লিখেছে সে তারিখ কাল। তার বাঙলা অক্ষরের চিঠি পেয়ে সে চমকে গেছে। আনন্দে তার অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তারপর নিজের কুশল সমাচার দিয়ে চিঠি সে শেষ করেছে। পরীক্ষান্তে সে পরীক্ষার সবিশেষ সংবাদ দিয়ে বিস্তারিত চিঠি লিখবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কেশর আনন্দে চিঠিখানা বুকে চেপে ধরে মনে মনে হাসল। শরীরে জাগল নদী জলের মৃদু চঞ্চলতা। চুপি চুপি সে ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে ঘরের মেঝেয় উবু হয়ে বসল। দু'টি হাত যুক্ত করে মনে মনে প্রার্থনা করল বহুদূরবর্তী এক স্বল্পপরিচিত অনাত্মীয় বাঙালী যুবকের পরীক্ষার সাফল্য কামনা করে। তার প্রচ্ছন্ন অন্তরের গভীরে নতুনতরো অনুভূতির ঢেউ জাগল। আনন্দাশ্রুতে তার চোখ দু'টি ভরে এল।

সন্ধ্যার পর তোড়জোড় করে আকাশে মেঘ জমল। কালো আকাশ বিদ্যুৎ শিখায় বিদীর্ণ হয়ে উঠল। মেঘ গর্জন করে উঠল। কাল-বৈশাখীর মত আস্ফালন করে ঝড় উঠল। গোমতীর বুক ফুলে ফেঁপে উত্তাল হয়ে উঠল। কালো জল ফণা-তোলা সাপের মত তট পেরিয়ে পথে এসে আছড়ে পড়ল।

ঝড়ের বেগ কমতেই বৃষ্টি নামল অশ্রান্ত ধারে। ক-দিন লু চলছিল। ধরণী শীতল হল।

নানী বললে, পৃথিবী ঠাণ্ডা হল। ঘুমিয়ে বাঁচা যাবে।

কেশর কটাক্ষে বিদ্যুৎ হেনে শাসাল, আমার গল্প শেষ না করে ঘুমুলে তোমার রক্ষে থাকবে না। আফিং খেয়ে বাদলা হাওয়ায়

হাঁ-করে ঢুললে কিন্তু তোমাকে আজ গোমতীর জলে ভাসিয়ে দোব।

—দিলে তো বাঁচি।

হাসতে হাসতে তার গাল টিপে দিল নানী।

বর্ষারাতের অবিশ্রান্ত ধারাপতনের মুখে বাইরের গাছগুলো যেমন পল্লব মেলে দিয়ে উতল হয়ে উঠেছে, তেমনি ভাবেই কেশর্র তার উতল চেতনার পাখা মেলে দিয়ে নানীর পাশে শুয়ে তার পিতা মাতার প্রেমের ইতিহাস শুনছে।

নানী ধীরে ধীরে বিবৃত করছে মৃত কন্যার সেই অতীতের ইতিহাস।

কেশরের মার নাম ছিল চম্পা। পনেরো ষোল বছরের অনূঢ়া চম্পাকে নিয়ে নানী গিয়েছিল প্রয়াগের কুম্ভমেলায়। লক্ষ্ণৌ-এর অনেকেই গিয়েছিল তাদের সঙ্গে। তাদের তাঁবুর সামনে হরিদ্বারের সাধুদের একটা তাঁবু পড়েছিল। সকালে সন্ধ্যায় সাধুরা ভজন গাইত। চম্পা যেত তাঁদের গান শুনতে। সাধুদের সঙ্গে এক অল্পবয়সী অপূর্ব-দর্শন তরুণ ছিল। তার নাম হরিশ। হরিশ সুকণ্ঠ গায়ক। অনেকে তাকে বালক সাধু বলত। হরিশের মাথায় জটার পরিবর্তে চিকন কালো বাবরি চুল। তার ভজন ও কীর্তন শোনবার জন্য যাত্রিরা তাঁবুর সামনে বালুচরে ভিড় জমাত। চম্পাও সকালসন্ধ্যা উদাসী কাকের মত তাঁবুর সামনে বালুচরে বসে থাকত।

কবে কেমন করে চম্পার সঙ্গে হরিশের পরিচয় হলো কেউ জানে না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় নানী সবিস্ময়ে দেখল ভিড়ের মধ্যে হরিশের পাশে বসে চম্পা তার গলায় গলা মিশিয়ে একসঙ্গে ভজন গাইছে।

লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলে এগোবার পথ নেই।

লোকে বলছে হরপার্বতী এসেছেন কৈলাস থেকে।

যাত্রিরা টাকা পয়সা দিচ্ছে ছুড়ে ছুড়ে। নানী তো অবাক।

চম্পাকে প্রশ্ন করলে কোন কিছু বলে না। সে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেছে।

মেলার স্নান শেষ করে ফেরবার দিন চম্পাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সাধুরা তাঁবু ভেঙ্গে চলে গেছে।

নানী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। পাগলের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াল। অনেক খোঁজাখুজি করল। পুলিশে খবর দিল। কোন সন্ধান পেল না। অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে চোখের জল সার করে নানী বাড়ি ফিরে এলো। মাস আষ্টেক পরে হঠাৎ একদিন হরিশকে সঙ্গে নিয়ে চম্পা বাড়ি ফিরে এল। নানী স্নেহে গলে গেল।

দুজনকে আদর করে ঘরে তুলে নিল।

চম্পা তখন অন্তর্বত্নী।

গন্ধর্ব বিবাহ করেছিল দু'জনে। নানী তাদের আর্যসমাজে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিল।

বাঙালী ব্রাহ্মণের ছেলে হরিশ। মুর্শিদাবাদ জেলায় বাড়ি। ঘর ছেড়ে অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিল। সুর-সাধক সে। সুরের সাধনায় বৈরাগী হয়েছিল। ঘর ছেড়েছিল। চম্পা তাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনল।

বৈরাগীকে গৃহস্থ করল।

দুজনে মিলে নতুন করে ঘর বাঁধল।

নানীর চোখের জল শুকোল। নানীর মুখে হাসি ফুটল। পুত্রহীনা নানী হরিশকে পেয়ে পুত্রের স্বাদ পেল। তার বাৎসল্য তৃপ্ত হল। হরিশ তাকে সশ্রদ্ধায় মাতৃত্বে বরণ করে নিল।

হরিশের সঙ্গীতের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক

ভক্ত অনেক শিষ্য জুটল জনপ্রিয়তার সঙ্গে। অর্থ সমাগমও সুরু হল।

তাদের আনন্দ উৎসবের নীলিমায় একখানা কালো মেঘ নেমে এলো। চম্পা একটি মৃত পুত্র প্রসব করল।

একটা বিষণ্ণ স্তব্ধতায় আলোর সংসার অন্ধকার হয়ে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চম্পা সন্তসঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেল। হরিশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চম্পাকে সান্ত্বনা দিল। চম্পার বিশীর্ণ মুখে অশ্রুর শীর্ণ ধারা নামল।

নানী তাকে প্রবোধ দিয়ে বলে, গাছ বেঁচে থাকলে ফুলও ফুটবে ফলও ধরবে। কান্না কিসের? নিজে ভালো হয়ে ওঠ।

প্রথম সন্তান। মহব্বতের প্রথম সওগাত। হাত ফশকে মাটিতে ঝরে পড়ল। তা ছাড়া চম্পার মনে নিদারুণ ভয় ছিল হরিশের বৈরাগ্যকে। আশা ছিল সন্তানের বাঁধন দিয়ে তাকে শক্ত করে বাঁধবে। কাজেই তার মনকে সহজ করে তুলতে বেশ কিছুটা সময় লাগল।

ঈশ্বর একদিকে যেমন কেড়ে নিলেন, অন্যদিকে তেমনি আশীর্বাদ করলেন দু'হাত ভরে। হরিশ জাহাঙ্গীরাবাদ রাজ-বাড়িতে সভা-গায়কের পদে অভিষিক্ত হল। তার যশো-রাশি আরো ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হল।

চম্পার মুখের লুপ্ত হাসি ফিরে এল। হরিশের সেবায় সে নিজেকে ডুবিয়ে দিল।

তাদের ভালোবাসার চেহারা দেখে সকলে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মাথা নত করত। তাদের প্রেমের মাঝে কোন লৌকিক সমস্যা ছিল না। আবর্তের আবিলতা ছিল না। চম্পা তার জীবনের ধারাটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেছে। কায়মনোবাক্যে সে হরিশের ধর্মপত্নী হবার চেষ্টা করেছে। প্রেমের মধ্যে দিয়ে তার লোকযাত্রার পথটিকে মধুর ও রমণীয় করে তুলছে। তাকে

ভালোবেসে, তার সেবা করেই সে আনন্দ পেয়েছে। তার ধ্যানের নিঃশব্দতায় চরে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জীবনের ব্যাখ্যাকে হরিশের জীবনের বাইরে ঠাঁই দেয়নি। সে নিজের জন্য কিছু চায়নি। কারুর কোন কটাক্ষ ইঙ্গিতকে গ্রাহ্য করেনি। হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত শুচিতা দিয়ে সে প্রেমের সাধনা করেছে।

আর হরিশ। বৈরাগ্যের আসন থেকে চম্পা তাকে নামিয়ে আনলেও তার মনে কোন বিক্ষোভ ছিল না। চম্পার প্রেমে সে সুখি হয়েছিল। চম্পা তার বাঙালী সংস্কারকে বিচলিত করে নি। সে চম্পার হৃদয়ের পানে চেয়ে দেখেছে। তার কুলশীল জাতি, গোত্র বা প্রাদেশিকতার বিচার করে নি। সে তাকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল। তার ভালোবাসার মাঝে সে সত্যের আলো দেখেছিল। তাদের মিলন সত্য হয়েছিল প্রেমে।

দীর্ঘ সাতবছর পরে আবার চম্পার গর্ভসঞ্চার হল।

সেই বছর তারা আমিনাবাগ থেকে গোমতী তীরের এই নতুন বাড়িতে বাস করতে এল।

কেশর ভূমিষ্ঠ হল এই কৈলাসধামে। কিন্তু প্রসূতি চম্পার মৃত্যু হলো তিন মাস পরে।

বছর দুই পরে হরিশ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।...

অন্ধকারে কেশর একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করে নানীর তপ্ত বুকে মুখ ঢাকল।

নানী কাঁদছে। অঝোরে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কেশর নিষ্প্রাণ, নির্জীব কণ্ঠে ডাকল, নানী!

—কেন, আমায় মনে পড়িয়ে দিলি ভাই?

বাইরের অন্ধকারে আর্তবায়ুর হাহাকার শোনা গেল।

কেশর জানত না তার বিস্তারিত পিতৃ পরিচয়। জানত না যে তার পিতা বাঙালী ব্রাহ্মণ। শুনেছিল তার পিতা পূর্ব জীবনে

ছিল সন্ন্যাসী। তার মার রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে সংসারী হন। তিনি বড় গায়ক ছিলেন। আর সব তার কাছে অস্পষ্ট এবং ঝাপসা ছিল। জানবার কৌতূহলও ছিল না কেশরের প্রয়োজনও হয় নি। তার জ্ঞান হয়েছে নানীর কোলে। নানী তাকে নৃত্যগীত শিখিয়ে বাঈজী বানিয়েছে। পনেরো বছর বয়স থেকে সে পুরোদস্তুর তয়ফাওয়ালী। জীবনের প্রারম্ভ থেকে সে অর্জন করেছে প্রচুর প্রসিদ্ধি আর অমেয় অর্থ। আর কোন দিকে চোখকান দেবার তার না ছিল অবকাশ, না ছিল আগ্রহ। তার মনে হত সে জাত বাঈজী। বাঈজী হয়েই জন্মেছে। তার আর কোন জাত-কুল নেই। কাজেই এ-দিকটা তার অন্ধকারে আবৃত ছিল।

তার পিতা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কূলে তার জন্ম। সে বাঙালী। বাঙালী ব্রাহ্মণের রক্ত তার দেহের শিরায়।

নানী তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। নানী তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। সে বাঙালী। তাই বাঙলা ভাষা তার ভালো লাগে। বাঙালীকে তার ভালো লাগে। বাঙলা দেশকে তার ভাল লাগে। বাঙলা প্রেমের দেশ। বাঙলার মাটিতে প্রেমের বীজ আছে। বাতাসে প্রেমের মন্ত্র আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের দেশ। প্রেমিক কবি জয়দেবের দেশ। তার কলকাতার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে দেবশ্রীকে। দেবশ্রীর বাঙালী রক্ত তার দেহের বাঙালী রক্তকে বোধ হয় চিনতে পেরেছিল। তাই দুজনের দুজনকে প্রথম দর্শনেই অতো ভালো লেগেছিল।

মনে করতে তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে। শরীর সঙ্গীত-স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সে নৃত্যশীলা নির্ঝরিণীর মত বাড়িময় গতির স্রোত বইয়ে দেয়। সঙ্গে একটা কলধ্বনি। প্রাণের অজস্রতায় সে যেন অনর্গল হয়ে উঠেছে। সে যেন বিশাল পৃথিবীর সীমা খুঁজে পেয়েছে নিজের এই নতুন পরিচয়ের মধ্যে। খুঁজে পেয়েছে

বৃহত্তম ও মহত্তর জীবনের সন্ধান। সে যেন তার নতুন পরিচয়ের গর্বিত পতাকা তুলে ধরে সকলের কাছে ঘোষণা করে দিতে চায় যে, সে সাত্ত্বিক বাঙালী ব্রাহ্মণের কন্যা। জন্ম তার মহব্বতের ফরাশে। সে প্রেমের পূজার ফুল।

সে গর্বোন্নত শির উঁচু করে নানীকে বলে, এখন বুঝতে পেরেছো নানী কেন আমি বাঙলা শিখছি?

—কেন? বাঙালী বিয়ে করবি বলে?

নিঃশব্দে কুটিল চোখে নানীর পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গাঢ়স্বরে বললে, বিয়ে যদি করি আলবৎ বাঙালী বিয়ে করবো। আমি বাঙালীর মেয়ে। বাঙালীই হবে আমার পতি।

নানী তার চিবুক ধরে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, কলকাতা গিয়ে বুঝি এবার ঠিক করে এসেছিস?

—ঠিক করলে সবার আগে তুমিই জানতে পারতে।

বাইরে নারীকণ্ঠের ডাক শোনা গেল: বাঈজী কই গো?

কেশর সাড়া দিল: ভেতরে আসেন মাষ্টার দিদি।

হাসি মুখে একটি দীর্ঘাঙ্গী, শ্যামবর্ণ বাঙালী মেয়ে এসে উঠোনে দাঁড়াল: বাঈজীর মুখের ভাঙা ভাঙা বাঙলা বুলি আমার ভারি মিষ্টি লাগে।

—আমাকে কিন্তু বাঈজী বলবে না মাষ্টার দিদি। আমাকে কেশর বলবে। আমি তোমার ছাত্রী। ছাত্রীকে নাম ধরে ডাকবে।

কেশরের শিক্ষিকা। বাঙলা শেখবার জন্য কেশর তাকে নিযুক্ত করেছে। বাঙালীর মেয়ে বাঙলা ছেড়ে এই দূরদেশে এসেছে জীবিকার জন্য। এখানকার বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। সৌভাগ্যবশে প্রখ্যাত কেশর বাঈকে ছাত্রী পেয়েছে।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললে, বেশ। আমি তোমাকে কেশর বলেই ডাকবো। তুমিও আমাকে বিভা বলবে।

মৃদু হেসে কেশর ঘাড় নাড়লেঃ না। তা হলে তোমার অসম্মান করা হবে। তুমি আমার মাষ্টার সে-টা ভুলে গেলে চলবে না। তোমাকে আমি বিভা-দিদি বলবো।

ম্লান হাসি হাসল বিভাঃ তাই বলো। তোমার সঙ্গে বন্ধুতা পাতাবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

—কেন? কেন?

—বাসরে! তুমি আর আমি? হাত বাড়িয়ে চাঁদকে ছোঁয়া যায় নাকি?

—ছি, ছি ও-কথা বলোনা ভাই। আমি পৃথিবীর মাটি। পয়সার জোরে আমি আসমানে উঠতে চাই না। তোমাদের পাশে মাটির বুকেই বেঁচে থাকতে চাই।

কেশরের চোখ ছুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল।

বিভা অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে তাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললে, ভুল বলেছি ভাই, ভুল বলেছি। তুমি চাঁদ নও। তুমি চাঁদের আলো। যার গায়ে লাগবে সেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সে দীন দরিদ্রের সকলের বন্ধু।

হেসে ফেললে কেশর। তার গলা ধরে বললে, তা হলে আমাকে বন্ধু ভাবতে পারবে তো?

মুখে কোন কথা বলল না বিভা। অশ্রু-উদ্বেল নয়নে তার গালে একটি চুম্বন এঁকে দিল। মিতালীর শাশ্বত প্রতিশ্রুতি।

এক থালা মিষ্টি আর চা নিয়ে হাসতে হাসতে নানী ঘরে ঢুকে বললে, দোস্তি পাতালি, দোস্তকে মিষ্টি মুখ করিয়ে দে।

কেশর নাচের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, নানী আমার মাই ডিয়ার। নানী আমার ডার্লিঙ!

একটা প্রবল হাসির তরঙ্গ উঠল।

কেশর পুরোপুরি বাঙালী বনে যাচ্ছে।

সে বাঙালী ঢঙে শাড়ি পরে। বাঙালী মেয়ের আচার-ব্যাভার, কায়দা-কানুন, চলা-ফেরা বলা-কওয়া রীতিমত অভ্যাস করছে। বাড়িতে সচরাচর পরবার জন্যে বাঙালী স্যাঁকরার কাছে বাঙলা গয়না গড়িয়েছে।

বিভা বলে, সিঁথিতে সিঁদুর উঠলেই পুরোদস্তুর বাঙলার বউ হয়ে যাবে। বাঙলার বধূ বুকে তার মধু··· ”

—ওটা কার লেখা গো বিভা-দি ?

—মাইকেল মধুসূদনের।

—যাঁর মেঘনাদ বধ লেখা ?

কেশরের প্রতিভা বিভাকে মাঝে মাঝে চমকে দেয়। এরি মধ্যে সে রবীন্দ্রনাথ পড়ছে, মাইকেলের দু-একটা কবিতা পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ পড়েছে। বাঙালী জাতি সম্বন্ধে তার অশেষ কৌতূহল। বাঙালী মনীষীদের প্রতি তার সশ্রদ্ধ ভক্তি। বাঙালী মহীয়সী নারীদের ইতিহাস শোনবার ও শেখবার অত্যন্ত আগ্রহ। তার গতির দ্রুততা দেখে বিভা বিস্মিত হয়। বিভার ধ্যান ধারণা বদলে দিয়েছে কেশর। বাঈজীদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ মনের পট-ভূমিতে যে বিকৃত শ্রেণীবোধ থাকে কেশর সম্বন্ধে সেই রকম একটা সন্দেহজনক বিরূপ ধারণা নিয়েই সে প্রথম এখানে এসেছিল। তার বন্ধুবান্ধব অনেকেই তাকে মানা করেছিল এই দূষিত হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে। কিন্তু তাকে আসতে হয়েছিল টাকার লোভে। নিদারুণ অর্থ-সঙ্কটে পড়ে। লোভনীয় প্রস্তাব বই কি ! হপ্তায় তিন দিন। মাত্র ঘণ্টা খানেকের জন্য বাঙলা পড়ানো। মাস মাইনে একশো টাকা। সাধারণ ছাত্রীদের কাছে যেখানে কুড়ি টাকার বেশি আশা করতে পারে না। সে প্রস্তাব অস্বীকার করে কেমন করে ? হলেই বা বাঈজী। তার চরিত্র নিয়ে তো তার বিচার করবার প্রয়োজন

নেই। সে তো তার সঙ্গে বন্ধুতা করতে যাচ্ছে না। আত্মীয়তা করতে যাচ্ছে না। যে তার সান্নিধ্যের ছোঁয়া লেগে সে অশুচি হয়ে যাবে। তার নিশ্বাসের বিষে সে বিষাক্ত হয়ে যাবে। আর হলেই বা উপায় কি? অভাব তো মিটবে। অবস্থার দৈন্য তো ঘুচবে। শুচিবায়ুগ্রস্ত মন নিয়ে উপার্জন করা চলে না। দেবমন্দিরে তা হলে চাকরি নিতে হয়। বিষ জেনেই সে এখানে এসেছিল। বিষের মাঝে পেয়েছে সে অমৃতের আস্বাদ। দূষিত বাতাসে পেয়েছে সে ফুলের সুগন্ধ।

সারাদিনের ক্লান্তির পর সে যেন একটা ফুলবাগানের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম করতে আসে।

কেশরের কথার সুরে উচ্চারিত হয়ে ওঠে একটা বিশাল জীবনের মহাগান। তার মনে হয় সে কেশরকে শেখাতে এসে নিজে অনেক কিছু শিখলো তার কাছে। তার গানের সাধনার মাঝেই তার জীবনের অবারিত আকাশ। উদার, উন্মুক্ত সে আকাশ। নির্মেঘ, নীলিমায় ভরা। তার মাঝে রহস্যের ছায়া নেই। তার তনু দেহময় জ্বল জ্বল করছে জীবন্ত সত্যের ভাস্বর আলো। তার সুনিবিড় সান্নিধ্যে, তার গায়ের হাওয়া লেগে দেহ পবিত্র হয়।

বিভা তাকে ভালো বেসেছে। তার চরিত্রের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছে। বিস্মিত হয়েছে।

মাঝে মাঝে কেশর তাকে নিজের টাঙা করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। আশ-পাশের লোকজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। মেয়ের দল উঁকিঝুঁকি মারে। গা টেপাটিপি হাসাহাসি করে। কেউ বা নাক তোলে। মুখ বেঁকায়ঃ দিদিমনিও বাঈজী বনে যাবে। স্কুলের টিচারী করে পেট ভরছে না।

কথাটা কেশরের কাণে ওঠে।

কেশর মনে মনে হাসে। বলে, বাঈজীও টিচার বনে যেতে পারে।

কেশরের বাঙালী প্রীতি হঠাৎ প্রকট হয়ে ওঠে। লক্ষ্ণৌ-এর বাঙালী প্রতিষ্ঠানে কেশর মুক্ত হস্তে দান করে। বাঙালী দেবমন্দিরে, বাঙালী বিদ্যায়তনে। বাঙালী চিকিৎসালয়ে ও সেবাশ্রমে সে প্রচুর দান করল তার বাঙালী পিতার নামে।

পাঁচ হাজার টাকা এককালীন দান করল সে বিভার বাঙালী বিদ্যালয়ে।

কেশরের দৌলতে স্কুলে বিভার প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হল।

লক্ষ্ণৌ-এর বাঙালী সমাজে কেশর পরিচিত হল।

কেশর বাঙালীর মেয়ে।

কেশর বাঙালী।

কেশরের গৌরব পরিচিতি।

যে কেশরের মুজরোর মূল্য একহাজার এক টাকা সেই কেশর বাঙালীর পূজামণ্ডপে বা অন্যান্য ফাংশনে বিনা পারিশ্রমিকে গান শুনিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে সে বাঙলা গান শিখেছে। অল্পদিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং লক্ষ্ণৌ-এর প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি ও গীতকার অতুল প্রসাদের গানে সে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করল।

কাশীর বাঙালী মহলে পর্যন্ত কেশর বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রইল। বিশিষ্টা বাঈজী বলে নয়। দানশীলা নিষ্ঠা বাঙালী কুমারী বলে।

কেশরের খ্যাতি ছিল বাঈজীর মাঝে সীমাবদ্ধ। সে খ্যাতি সাধারণ্যে কুখ্যাতি, বলেই পরিগণিত হতো। অনেকের কাছে বাঈজীর সহজ ও সরল অর্থই হলো রূপাজীবা ঃ

কেশর রূপসী। অনূঢ়া। বয়সে তরুণ। কাজেই সাধারণের দল তার মাঝে অসাধারণত্ব আরোপ করবে কেন? নইলে এত ঐশ্বর্য হলো কেমন করে?

কিন্তু কেশরের ভাগ্যবিধাতা তার উপর একান্ত সদয় এবং হয়তো

তার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল তাই সম্ভব হলো একসঙ্গে ঐশ্বর্য, খ্যাতি ও সম্ভ্রমের এই প্রাচুর্য।

এ সম্ভ্রম শুধু তার একার নয়। বাঈজী সম্প্রদায়ের। তাদের শ্রেণীগত পার্থক্য সে মুছে দিল। বাঈজী শব্দের অর্থ বদলে দিল।

এত মান, সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্যের মাঝে ও কেশরের কর্মক্লান্ত সন্ধ্যার নিভৃত গৃহকোণে একটা বিরহের ক্ষীণ সুর ধ্বনিত হয়ে উঠে। তার অন্তরকে বিষণ্ণ করে তোলে। স্মরণে এনে দেয় তার কলকাতার সুখস্মৃতিকে। মনে পড়িয়ে দেয় দেবশ্রীকে। ভাবনার জোয়ার আসে তার মনে। দেবশ্রীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনটি থেকে অপস্রিয়মান ট্রেনের মধ্যে থেকে প্লাটফরমের উপর দণ্ডায়মান তার সেই বিষণ্ণ মূর্তির পানে চেয়ে দেখা, ছায়াছবির মত তার মনের পর্দায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। মনে পড়ে ট্রেন যখন প্লাটফরমের বাইরে এলো, দেবশ্রী যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, তখন সে সহস্র চেষ্টা করেও অশ্রুরোধ করতে পারে নি। একটা অপরিসীম বেদনায় তার হৃদয় ভেঙ্গে পড়েছিল।

নির্জন ঘরের নিভৃত শয্যায় একান্তে শুয়ে শুয়ে সুষুপ্ত রাত্রির স্তব্ধতায় একজনকে ভাবতে আনন্দ আছে বই কি। নিটোল একটি ঘুমের মত সেও একটা আরাম। তা ছাড়া সকালে ঘুম ভাঙতেই আর রাত্রে বিছানায় শুয়ে দেবশ্রীকে ভাবা তার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

নিজের মনোভাবে নিজেই লজ্জিত হয় কেশর। কিন্তু সে লজ্জার মাঝেও একটা মধুর স্বাদ আছে। একটা প্রচ্ছন্ন পুলকের শিহরণ আছে।

কলকাতা থেকে তার কুমারী মনের প্রদীপে যে আলো জ্বেলে নিয়ে এসেছে, সে আলো অনির্বাণ অদৃশ্য শিখায় ধিকি ধিকি জ্বলছে। সে আলো সে নেবাতে চায় না। সেই আলোকে সে নিষ্প্রভ হতে দিতে চায় না। সেই আলোয় তার মেঘলা মনের

অন্ধকার কেটে গেছে। মনের আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না ফুটেছে। সে নতুন জীবনের নতুন আকাশের সন্ধান পেয়েছে।

তাই সে চিঠির আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে দূরকে নিকটে এনেছে। দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়েছে হৃদয়ের অদৃশ্য যোগাযোগে। দেবশ্রী পরীক্ষান্তে তাকে বিস্তারিত চিঠি দিয়েছে। পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে। দীর্ঘ বিরতির পর আবার বাজনায় মন দিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাওয়া সম্প্রতি ঘটে উঠবে না। কারণটা,— তাকেই অনুমান করতে লিখেছে। তা ছাড়া বর্ষার মধ্যে দেশ ভ্রমণের আনন্দ নেই। সুখ নেই। আরো অনেক কথা। গান বাজনার কথাই বেশী। কেশরের বাঙলা লেখার প্রশংসা করেছে। অসাধারণ উন্নতি হয়েছে এই অল্প সময়ে বলে রায় দিয়েছে। না আসবার কারণ বুঝতে কেশরের দেরী লাগে না। অর্থের অনাটন। কেশর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে! কী বা সে করতে পারে? সে তো তাই বলে তাকে টাকা পাঠাতে পারে না। পূজোর সময় বেনারস আসবার ইচ্ছা আছে লিখেছে। সেই সময় লক্ষ্ণৌ আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

কেশর আবার প্রতীক্ষার প্রদীপ জ্বেলে বাতায়নে বসে থাকে। পূজোর আর কতোদিনই বা বাকি?

আকাশ বুকে আষাঢ়ের নতুন মেঘের ঘনকৃষ্ণ ছায়ার মত তারও নয়ন পাতায় নামে বিরহের কাজল ছায়া।

॥ নয় ॥

এবারের কেশরের চিঠির বুকেও বিরহের একটা কাজল ছায়া। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আঁকা। দেবশ্রীর হিয়ায় তার বিরহের আঁচ লাগে। শ্রাবণ রাতের আর্দ্র হাওয়ায় তার মন ভিজে ওঠে। কেশর আশা করেছিল, পরীক্ষার পাষাণ ভার নামিয়ে দিয়ে নিষ্পেষিত দেহমনকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্য অন্তত কটা দিনের জন্য সে নতুন দেশের নতুন পরিবেশে ডুব দিয়ে যাবে। কেশর হতাশ হয়েছে। আহত হয়েছে তার আকুল প্রতীক্ষা। তার আহত মনের আঘাতটা এসে দেবশ্রীর মনে প্রচণ্ড প্রতিঘাত করেছে।

কেশরের প্রতীক্ষার চেহারাটা তো সে সাহস করে চিঠির বুকে আঁকতে পারে না। শুধু একটা অশ্রুত করুণ সুর বেজে উঠেছে তার কাঁচা হাতের চিঠির ধ্বনিতে। তোমাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। সুবিধে হলেই এসো কিন্তু।·· এই দুটি ছত্রের মাঝেই যেন অনেক কিছু ব্যক্ত হয়েছে। অন্তত দেবশ্রী অনেককিছু শুনতে পেয়েছে। তার মনের নিগূঢ় আকাশের, সবটা না হলেও, অন্তত এক ফালি আকাশ তার চোখে পড়েছে। বেদনায় টলটল করছে সে আকাশ। বর্ষা রাতের উদাস হাওয়ার মত তার মনকে উতল করে তুলেছে কেশরের লিপি। নিজেকে তার নিষ্ঠুর মনে হয়। অকৃতজ্ঞ মনে হয়। কেশরের এই আকুল অভ্যর্থনাকে উপেক্ষা করার বেদনা তার ধৈর্যকে অসংযত করে তুলেছে।

পরীক্ষার পাষাণভারে এই দীর্ঘদিন সে মাথা তুলতে পারেনি। কেশর তার মনে ধূসর না হলেও এতোদিন মেঘের আড়ালে চাপা পড়েছিল। সে দিকে চোখ মেলে তাকাবার অবকাশ ছিল না। এখন তার মনের আকাশ মেঘমুক্ত। জ্যোৎস্নার বিহ্বলতা নিয়ে

পূর্ণচন্দ্রের মত কেশর তার মনের আকাশে জ্বল জ্বল করছে। জ্যোৎস্নার স্পর্শ পেয়ে অন্ধকারের নিস্তরঙ্গ নদী উত্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সে নিঃসহায়। নিরুপায়। অন্ধকারের মৃত একটা স্তূপের মত এই দুঃসহ নিরুপায়তা তার বুক চেপে ধরেছে।

তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গতি। এতগুলো টাকা একসঙ্গে খরচ করবার তার না আছে সঙ্গতি, না আছে সঞ্চয়। নিজের কোন বিলাসের জন্য বাবাকে সে বিব্রত করতে চায় না। বাবা দেবে কোথা থেকে ? পাই পয়সা হিসেব করা মাস মাইনে। বাড়তি খরচ মানে একজনকে বঞ্চিত করা। তা ছাড়া সম্প্রতি পরীক্ষার ফি ও কলেজের মাহিনা বাবদ এক কালীন বহু টাকা ব্যয় হয়েছে।

দেবশ্রী সজ্ঞানে বাবার কাছে টাকা চাইবে কোন মুখে? কাজেই তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে হয়েছে যে অনিবার্য কারণবশতঃ উপস্থিত তার সৌখিন দেশ ভ্রমণে বহির্গত হওয়া সম্ভবপর নয়। এবং কারণটা যে কী বুদ্ধিমতী কেশরের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হবে না। সে জানে দেবশ্রীর আর্থিক অবস্থার কথা। দেবশ্রী তার কাছে কোন কিছু গোপন করেনি। কেশরের বিলাস সমৃদ্ধির মাঝে নিজের দীনতা তাকে সঙ্কুচিত করেনি। খর্ব করেনি। তার বন্ধুতাকে সে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল।

দেবশ্রীর পরীক্ষা শেষ হলেও সে আলস্যে ডুব দেয়নি। একটা সুবিধামত চাকুরির প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে সে বহু দরখাস্ত করছে, অবশ্য পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে।

আর সে সংসারের উপর ভার হয়ে থাকতে চায় না। সংসারকে সে সাহায্য করতে চায়। পিতাকে সাহায্য করতে চায়। সামনে দেবিকার বিয়ে। কিছুটা সাহায্য তাকে করতেই হবে।

দেবিকার বিয়ের চিন্তায় এবং ছোটমার তাড়ায় তার বাবা বিব্রত

হয়ে উঠেছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। পাত্রের সন্ধান মিলছে কিন্তু তাদের চাহিদা শুনেই ত্রিভুবন অন্ধকার হয়ে যায়। হাত গুটিয়ে নিতে হয়।

কাজেই কেশরের সান্নিধ্যকে দূর থেকেই অনুভব করতে হয়। অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে। মাঝের দূরত্বকে সরিয়ে দিতে হয় প্রীতির অনুভূতি দিয়ে। অনুরাগের বাণী পাঠিয়ে।

দেবশ্রী নিজের অক্ষমতার জন্য কেশরের ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেশর মনে মনে হাসে। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় তার অন্তরে অনুরাগের তুষার জমাট বাঁধে।

তার প্রতীক্ষার ক্লান্তি নেই। অবসাদ নেই।

দেবিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

কণে দেখার পরীক্ষা।

একটি সুপাত্রের সন্ধান মিলেছে। সুপাত্র বলতে যা বোঝায় সর্বদিক দিয়ে তাই।

চমৎকার ছেলে। খাসা ছেলে।

বিলেত ফেরৎ ডাক্তার। আই-এম-এস। বিলেত থেকে ফিরে বর্ধমানে সিভিল সার্জন হয়েছে।

সঙ্গতি-সম্পন্ন ঘরের ছেলে। মুর্শিদাবাদ জেলায় পৈতৃক বাড়ি। দেশে কিছু জমিদারি আছে। কলকাতাতেও বাড়ি আছে। বাপ কলকাতার নামী ডাক্তার।

আর চাই কি ?

দৃপ্ত উচ্ছ্বসিত স্বাস্থ্য। প্রিয়দর্শন। গায়ের রঙ ফর্শা। দেবিকার পাশে চমৎকার মানাবে।

এর চেয়ে যোগ্য পাত্র কোথায় মিলবে? পাত্র নিজে এসে দেবিকাকে দেখে গেছে। দেবিকা দেখেছে পাত্রকে।

দেবিকা ইনটারভিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ পাত্রের পছন্দ হয়েছে দেবিকাকে।

সব ঠিক। এখন দেনা পাওনার কথা ঠিক হলেই পাকাপাকি করা যায়।

এ পাত্র সন্ধান করেছে দেবশ্রী, তার এক বন্ধুর মারফতে। বন্ধুটি পাত্রের দূর আত্মীয়।

দেবশ্রীর ভারী পছন্দ ছেলেটিকে।

দেবিকার মাথায় চাঁটি মেরে তার মন জেনেছে দেবশ্রী। সে সম্মতি জানিয়েছে। তারও পছন্দ।

আর কোন কথা নেই। পাত্রপাত্রী দুজনেরি যখন পছন্দ। এই পাত্রের সঙ্গেই দেবিকার সম্বন্ধ ঠিক। এর সঙ্গেই সে দেবিকার বিয়ে দেবে।

সে বুক ফুলিয়ে আনন্দে নেচে বেড়ায়।

কিন্তু পছন্দ ছাড়াও হিন্দুদের বিয়ের যে একটা মারাত্মক প্রশ্ন আছে সে-কথা দেবশ্রীর খেয়াল ছিল না। বাবা তার জট ধরে নেড়ে দিল: ওরা দশহাজার নগদ চায়। ও-দিকে হাত বাড়াস না। হাত গুটিয়ে নে। আমাদের বেচলেও সব টাকার জোগাড় হবে না। দশহাজার নগদ। গা-সাজানো গয়না দান সামগ্রী। বিয়ের রাতের খরচ। অর্থাৎ ষোল সতেরো হাজারের ধাক্কা।

দেবশ্রী শুভ্র শূন্য চোখে বাবার মুখপানে চেয়ে রইল। তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। নিশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যায় না।

অশ্বিনী বললে, যা যা। ভাবিস না। এ হবার নয়। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। মেয়ের ভাগ্যে থাকলে তো হবে?

দেবশ্রী আর্তস্বরে প্রশ্ন করলে, তুমি কি ওদের জবাব দিয়ে এলে না কি?

—না। মতামত কোন কিছুই জানাইনি। শুধু শুনে এলুম।

জবাবটা নিজের মুখে না দিয়ে তোমার বন্ধু বিধুর মারফতে পাঠানোই ভালো হবে।

একটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দেবশ্রী। বললে, এখন কারুকে কিছু জানিও না বাবা। দেবি কিংবা ছোট-মার যেন কাণে ওঠে না। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

অশ্বিনী ঝলসে উঠল, কী চেষ্টা করবি তুই? বড় জোর পাঁচ হাজার আমার এষ্টিমেট। তাও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর ইনসিওরেন্স থেকে ধার-ধোর করে—সেখানে চেষ্টা করার কোন প্রশ্ন অ্যারাইজ করে না।

—তা বটে। তবু—বিয়ে তো দিতে হবে। আর এমন পাত্র—

—উপায় কি? ওর অদৃষ্টে সুখ থাকলে—আর যেখানে হবার ঠিক সেইখানেই হবে। সহস্র চেষ্টা করেও খণ্ডন করতে পারবে না।

কথাগুলো দেবশ্রীর কানে গেল কিনা কে জানে। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করলে, জোগাড় করবার কি আর কোন শোর্স নেই বাবা? আমি ওদের দাবির কথা বলছি না। আমাদের বাজেট-টা আরো কিছু বাড়ানো যায় না?

—তু-পাঁচশো হলে চেষ্টা করা যেতে পারে। তার বেশি আর শুধু হাতে কে দেবে?

একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ আর্দ্র কণ্ঠে দেবশ্রী বললে, কিন্তু এ-পাত্র হাত ছাড়া করা চলবে না বাবা!

হেসে উঠল অশ্বিনী: অসম্ভবকে তো সম্ভব করা যায় না বাবা!

দেবশ্রীর চোখদুটি বাষ্পাকুল হয়ে উঠল। সে ভগ্ন ভঙ্গিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বাবা এইখানেই দেবির বিয়ে দিতে হবে। আমি ওদের হাতে পায়ে ধরে যতোটা পারি কমাবো। তুমি আরো টাকার জোগাড় করো। আমি উপার্জন করে ওর বিয়ের ঋণ শোধ করবো।

দেবশ্রীর আকুলতা, তার কাতর কণ্ঠ, তার চোখের অসহায় আর্ত-দৃষ্টি, অশ্বিনীকে আহত করল। সে তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা পেলে না।

—আরো পাঁচ হাজার টাকা জোগার হবে না বাবা?

প্রশ্ন করল দেবশ্রী।

—কে দেবে? কী আমার আছে? এ পাত্রের সঙ্গে নেগোসিয়েট করতে যাওয়াই আমাদের ভুল হয়েছে।

দেবশ্রীর মাটিতে পা বসে গেছে। একটা অতিকায় বিস্ময়ের মত আঘাতটা তাকে বিমূঢ় করে দিয়েছে। এতটা সে ভাবতে পারেনি। এ যেন উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নার আকাশে উড়ে এলো মেঘের ঘন কালিমা। সব অন্ধকারে ঢেকে দিল। তাকে গ্রাস করে ফেলল। পথ খুঁজে সে সারারাত ছটফট করে কাটাল। ঘুমতে পারলে না।

বেদনার চেয়ে আঘাতের লজ্জাটাই তাকে মাথা তুলতে দিল না। সে দেবিকার কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? দেবিকাকে সে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছে এই পাত্রের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। দেবিকার মনে আলো জ্বলেছে। দেবিকা মনে একটা দৈব-সঙ্কেত পেয়েছে, মন তার ভাবীলোকে ডুব দিয়েছে। সে তার ধ্যানের পতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। সে তার ভক্তিপূজার অর্ঘ নিয়ে স্বামী দেবতাকে বরণ করে নেবার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছে। দেবশ্রী তাকে হতাশ করবে কেমন করে? কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নেবে কেমন করে?

না। তা সে পারবে না। তা সে হতে দেবে না। এ বিয়ে তাকে দিতেই হবে। দেবিকাকে সুখি করবার জন্য, দেবিকার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য সে জীবন পণ করবে। সে জানে তার বাবার চেয়ে তার উপর দেবিকার নির্ভর অনেক বেশি। দাদার আশ্বাসকে সে পরম নিশ্চিত আশ্বাস বলেই গ্রহণ করেছে। তাকে সে হতাশ

করতে পারবে না। তার মনের আলো সে নিভিয়ে দিতে পারবে না।

সকালে উঠেই সে তার বন্ধু বিধুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। বিধুই এ সম্বন্ধের নির্বন্ধ। এর আদিপর্ব।

পাত্র অনিমেষ বিধুকে স্নেহের চোখে দেখে। বিধু সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করে। বিধু হয়তো কোন বিধান বাতলাতে পারে। সেই আশায় বিধুর শরণাপন্ন হল। দেবশ্রীদের অবস্থার কথা তার অজানা নয়।

অনেক জল্পনা-কল্পনা এবং মন্ত্রণার পর দুই বন্ধুতে একটা ডিপ্লোম্যাটিক চাল চালতে মনস্থ করল। তারা সরাসরি পাত্র অনিমেষের সঙ্গে সাক্ষাত করে কন্যাপক্ষের অক্ষমতার কথা নিবেদন করবে এবং তার মনের তাপমানটা নির্ণয় করে আসবে।

বিধু আশা দিল, নিশ্চয় কোন সুরাহা হবে। বিলেত ফেরত মানুষ। ওর মনে এ সব সংকীর্ণতা নেই। তাছাড়া—

গলাটা খাটো করে মৃদু হেসে বললে, দেবিকা ওকে রীতিমত ইমপ্রেস করেছে। দেবিকাকে ওর খুব পছন্দ। অতএব কাল বিলম্ব না করে পরদিন প্রভাতে দুই বন্ধুতে বর্ধমান রওনা হল। কারুকে কিছু না জানিয়ে। গোপনে।

দুজনে যখন ডাক্তার সাহেবের বাঙলোয় গিয়ে পৌঁছল সাহেব তখন হাসপাতালে। ফিরতে সাহেবের বেলা বারোটা বাজবে। হাতে প্রায় দু-ঘণ্টা সময়। রাজবাড়িটা অন্তত দেখে আসা চলবে আর শহরটাও খানিকটা প্রদক্ষিণ করে আসা যাবে। বাঙলোর মালির কাছে বিধু নিজের পরিচিতি পত্র রেখে দুজনে পথে বেরিয়ে পড়ল।

বিধু বললে, এটা সীতাভোগ মিহিদানার দেশ। রাঙা মাটির দেশ।

দেবশ্রী বললে, আর বিদ্যাসুন্দরের দেশ। এখানে অনেক বড়ো বড়ো পুকুর আছে শুনেছি।

বিধু বললে, শ্যামসায়র বলে একটা পুকুরের ধারেই এখানকার হাসপাতাল শুনেছি। হাসপাতালেই যাবি না কি?

দেবশ্রী বললে, না হাসপাতালে গিয়ে আর জ্বালাতন করে কাজ নেই। নিরিবিলিতে বাঙলোয় গিয়েই দেখা করা ভালো।

বিধু বললে, মা সর্বমঙ্গলা এখানকার জাগ্রত দেবী। চল, সর্বমঙ্গলা দর্শন করে একটু পুণ্যসঞ্চয় করে শুভ কাজে হাত দেওয়া যাবে।

শহর প্রদক্ষিণ করে যখন তারা বাঙলোয় ফিরল তখন ডাক্তার সাহেব ফিরেছে।

বিধুর সঙ্গে দেবশ্রীকে দেখে অনিমেষ বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল, ব্যাপার কি রে বিধু? একেবারে মহাকুটুম্বকে সঙ্গে নিয়ে এখানে ধাওয়া করলি যে? আসুন—আসুন—

দেবশ্রী হাসিমুখে তাকে নমস্কার করল। অনিমেষ তার হাত-দুটি ধরে বললে, এর পর তো আপনিই আমার পূজনীয় হয়ে উঠবেন। আপনিই হবেন আমার প্রণম্য।

প্রাণ খুলে দেবশ্রীর সঙ্গে আলাপ করল অনিমেষ। আদর, যত্নে, হৃদ্যতার প্রাচুর্যে অভিভূত করে দিল দেবশ্রীকে। কোয়ার্টার দেখাল। বাঙলোর বাগান দেখাল। হাসি মুখে বললে, আপনার বোনটির হয়তো ঘর ছেড়ে এ জীবনে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে অসুবিধা হবে না মনে হয়। কি বলেন?

দেবশ্রী লাজুক কণ্ঠে উত্তর দিল, আসতে পেলে সে সৌভাগ্যজ্ঞান করবে।

অতিথির আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হল না। তবু যেন দেবশ্রী উৎকণ্ঠায় অধৈর্য হয়ে রইল। সতৃষ্ণনয়নে ঘন ঘন বিধুর পানে তাকাতে লাগল।

আহারাদির পর বিধু আসল প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল। পিতা-মাতার এই অযৌক্তিক দাবিকে অনিমেষ সমর্থন করল কিনা বোঝা গেল না। তবে সে লজ্জিত হল মনে হল। তার মুখের দীপ্তি নিভে গেল। তার ললাটে একটা ক্লান্তির রেখা ফুটে উঠল। সে মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চিন্তা করল।

বিধু সুযোগ বুঝে অনুনয়ের কণ্ঠে বললে, তোমাকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে অনুদা। ও-দিকে নক্ করে কোন ফল হবে না জেনেই তোমার কাছে দেবুকে নিয়ে এসেছি। আমাদের একান্ত ইচ্ছা এ বিয়ে হয়। তোমারও মনের কথা আমি জানি। তুচ্ছ দেনা-পাওনা নিয়ে যদি সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যায় অত্যন্ত দুঃখের কথা হবে। ওদের সঙ্গতি থাকলে ওরা হাসিমুখে কাকিমার দাবিকে সম্মান দিত। ওরা অপারক, অক্ষম বলেই ও তোমার শরণাপন্ন হয়েছে। তুমি পারো ওকে বাঁচাতে। আমরা যে তোমার কাছে এসেছি এ-কথা কেউ জানে না। দেবুর বাবা পর্যন্ত নয়।

তিক্ত, কঠোর সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে অনিমেষের দেরি হলো না। সে শুষ্ক ম্লান মুখে তাদের পানে মুহূর্ত চাইল। কী যে বলবে বুঝে উঠল না। বিড় বিড় করে নিজের মনে বললে, দিস ইজ রিভোলটিং।

তারপর মুখ তুলে সোজা দেবশ্রীর পানে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, প্লেস ইয়োরসেলফ ইন্ মাই পজিশন অ্যাণ্ড টেল মি হোয়াট ইউ উড ডু?

পাংশু মুখে দ্বিধাজড়িত স্বরে দেবশ্রী উত্তর দিল, আমি বলবো? আই ক্যাননট পশিবিলি ডিকটেট ইউ।

বিধু গলায় জোর দিয়ে বললে, তুমি আমাদের বলে দাও আমরা কি করবো?

—অর্থাৎ আমাকে তোমাদের এই চক্রান্তে যোগ দিতে হবে?

হাসল অনিমেষ।

বিধু হাসতে হাসতে বললে, সৎকাজের চক্রান্তে পুণ্য আছে।

অনিমেষ হাসল ঃ তা আছে। আমি তোমাদের কনস্পিরাসীতে যোগ দিতে রাজী আছি উইদাউট আইডেন্টিফাইং মিসেলফ। নিজের বিয়ের ব্যাপারে কর্তা সাজতে আমি চাই না। বিশ্রী দেখাবে। বিলেত ঘুরে এলেও সংস্কার ঘোচেনি।

সশব্দে হেসে উঠল অনিমেষ ঃ আমাদের এই সংস্কার আমাদের অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের অন্ধ করে রেখেছে। এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

দেবশ্রী সংশয় বিচলিত অন্তরে তার মুখের শেষ কথাটি শোনবার আশায় তার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে আছে। মুখফুটে কোন কিছু বলবার না আছে শক্তি, না আছে অধিকার।

অনিমেষ বললে, না, প্রকাশ্যে কোন কিছু করতে গেলে অত্যন্ত অশোভন দেখাবে। একেই তো কানাকানি শুনতে পাই বিলেত থেকে আমি নাকি সাহেব বনে এসেছি। তার চেয়ে এক কাজ করো বিধু—

ঊর্ধ্বশ্বাসে তার মুখের পানে চাইল দেবশ্রী।

অনিমেষ বললে, নগদ টাকাটা নিয়েই তো প্রশ্ন। টাকাটা আমিই দোব। আই মিন, টাকাটা আমি ফেরৎ দোব। ওদের ডিসটার্ব করে দরকার নেই। টাকাটা আপনারা একবার ব্যবস্থা করে দিয়ে দিন। বিয়ের দু তিন মাস পরে আপনার বোনের মারফৎ আপনি টাকাটা ফেরৎ পাবেন। রেষ্ট এসিওর। কোন দুর্ভাবনা নেই। এমন কি তিন মাসের কড়ারে আপনি কারুর কাছে টাকাটা ধার করতেও পারেন। টাকা পেয়ে শোধ করে দেবেন।

বিধু আর দেবশ্রী মুখ চাওয়া চাওয়ি আশ্বাসের হাসি হাসল। দেবশ্রীর মাথা থেকে যেন পর্বতভার নেমে গেল।

অনিমেষ হাসিমুখে প্রশ্ন করলে, বিশ্বাস করতে পারবেন তো?

দেবশ্রী ভাবাবেগে তার হাত দুখানি জড়িয়ে ধরল। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় তার চোখদুটি অশ্রু বিহ্বল হয়ে উঠল।

ট্রেনে বসে দেবশ্রী দেবিকার কথই ভাবছিল। দেবিকা তার তপস্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তপস্যা বই কি? মেয়েদের জীবনে সব চেয়ে বড় তপস্যা। বরের তপস্যা। দেবিকা বৃথাই শিবপূজা করেনি। সার্থক তার পতি কামনায় শিবপূজা। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি কল্পনা করে আনন্দে দেবশ্রীর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। এতটা সে ভাবতে পারেনি। অনিমেষের উদার মনের পরিচয়ে ও তার সহৃদয়তায় সে অভিভূত হয়ে গেছে। আসলে দেবিকাকে তার মনে ধরেছে। দেবশ্রীর মনের গভীরে তাদের মিলিত জীবনের জন্য একটা প্রার্থনার স্বুর বেজে উঠল: ওরা দুটিতে সুখী হোক। শুভ হোক, সার্থক হোক ওদের মিলিত জীবন।

ঈশ্বর যেন দেবশ্রীকে তার স্নেহময়ী ভগিনীটির ভবিষ্যতের স্নেহনীড়টি চাক্ষুস করাবার জন্যই এখানে নিয়ে এসেছিলেন। সুবৃহৎ বাঙলোটা যেন তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আকুল আগ্রহে স্তব্ধীভূত হয়ে আছে। কম্পাউণ্ডের বড় বড় মেহগেনি আর দেবদারু গাছগুলো যেন তার আগমনের আভাসে বর্ষার জলে গা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন ও প্রগলভ হয়ে উঠেছে। নতুন সংসারে তাকে অভিষেক করবার জন্যই যেন এত আয়োজন। এত আকুলতা। বাগানের লতামণ্ডপে, বিচিত্র ফুলের সমারোহে, ছাঁটা সবুজ ঘাসের লনে, লাল-শুরকি-বিছানা পথে যেন তারি সাদর অভ্যর্থনার আসন পাতা। সেখানে তার জন্য বিস্তীর্ণ আশ্রয়, জীবনের নিগূঢ় সত্য, স্বামীর ভালবাসা, পরিপূর্ণ তৃপ্তি। মেম-সায়েব। দেবিকার নতুন সংসারে হবে নূতন পরিচয়। জেলার সিভিল সার্জন। সম্মানিত পদবী নিঃসন্দেহ। মেম-সাব। হাসি পায় দেবশ্রীর। মেয়েটার চেহারার ভোল বদলে যাবে। চাল বদলে যাবে।

হঠাৎ দেবশ্রীর স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে যায়।

বিধু প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে দেবু, উপস্থিত টাকাটা জোগার করবার মত শোর্স আছে তো?

দেবশ্রী আকাশ থেকে পড়ল।

আনন্দের আতিশয্যে ও বিহ্বলতায় এ-কথাটা তার মনে হয়নি। অথচ সমস্যাটা এত রূঢ় আর অনাবৃত যে তার সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা ধরে গেল। মধুর স্বপ্নের মাঝে যেন গায়ে বিছের কামড় দিল। বিধুকে যে কী বলবে সে ভেবে পেলে না।

বিধুর কাছে সে চরম বশ্যতা স্বীকার করেছে। অনেক অত্যাচার করেছে তার হৃদ্যতার উপর। তার কাছে তার কোন লজ্জা নেই। তবুও কেমন একটা লজ্জমান মুহূর্ত তাকে অকস্মাৎ গ্রাস করে ফেললে। বিধুর কাছে আরো অবনমিত হতে চাইল না। তাকে একটু স্বস্তি দেবার জন্যই সে বলে উঠল, চেষ্টা করতে হবে। বোধ হয় হয়ে যাবে।

তারপানে একটু আশ্বাসের হাসি ও ছুড়ে দিল।

কিন্তু কোথায়, কার কাছে সে চেষ্টা করবে এবং কেমন করে জোগাড় হয়ে যাবে সে কিছুই জানে না।

ক্ষণিকের বিদ্যুদ্দীপ্তির চোখ-ঝলসানো আলো থেকে মন তার আবার নিঃসীম অন্ধকারে ডুব দিল। তাল তাল অন্ধকারের মত ভাবনার জোয়ার এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ডুবে গেল সে অতলান্ত অন্ধকারে। হাতড়াতে লাগল ডুবুরীর মত রত্নের সন্ধানে। কে দেবে তাকে দশহাজার টাকা তিন মাসের জন্য? কোথায় গেলে পেতে পারে? কেমন করে সে তার বোনটিকে বাঁচাবে? কে আছে এমন সদাশয় বন্ধু যে তাকে এই সঙ্কট থেকে বাঁচাবে?

কোথাও একটু ক্ষীণ আলোকের রেখা দেখতে পায় না। আশে-পাশে চারিদিকে দিশাহীন অন্ধকার। কে দেবে তাকে বিশ্বাস

করে? তিন মাসের জন্যই হোক বা তিন দিনের জন্যই হোক। দেবে কেন? কিসের জামিনে দেবে?

বাবাকে সে বলতে চায় না। জানাতে চায়না অনিমেষের প্রতিশ্রুতির কথা। অনিমেষকে সে অক্ষত রাখতে চায়। তাকে নেপথ্যে রেখে যেমন করে হোক কার্যোদ্ধার করতে হবে।

বাবাকে আশ্বাস দিল, টাকার জোগার হয়ে যাবে। তুমি যতটা পারো জোগার করো। তারপর দেখা যাবে।

অশ্বিনী ঝলসে উঠল, কোত্থেকে হবে? মাটি ফুঁড়ে গজাবে নাকি দশহাজার টাকা?

অবনত মস্তকে অস্ফুটস্বরে দেবশ্রী উত্তর দিল, ধার কর্জ করতে হবে।

—ধার দেবে কে?

—চেষ্টা করে দেখি। তবে বিয়ে ঐখানেই হবে। পাকা কথা দিও আর টাকার অঙ্কটা যদি কিছু কমে একবার চেষ্টা করে দেখো যতটুকু পারো। বেশী টানা হেঁচড়া করো না।

—টাকার জোগাড় না করে পাকা কথা দেওয়ার কোন মানে হয় নাকি? কী যে বলিস?

—টাকার জোগার যেমন করে হোক করতেই হবে। কথা তুমি দিয়ে রেখো। বিয়ে তো হবে অগ্রানে। এখনো প্রায় তিন মাস দেরী। টাকার জোগার হয়ে যাবে। তুমি ভেবোনা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেবশ্রী মনে মনে হাসে। যে ভাবনার অকুলে ভাসছে, সে বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে তুমি ভেবোনা। দেবশ্রীর মনে হয় সে মরিয়া হয়ে গেছে। সে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। না হয়েই বা উপায় কি? দেবিকার শুভ গ্রহই তাকে পথের সন্ধান দেবে। পথ অবধারিত মিলবে। বুকে শক্তি সংহত করে, ভাবনার ভিড় ঠেলে চেঁচাতে চেঁচাতে রান্নাঘরের দোরে গিয়ে দাঁড়াল।

—কি গো ছোট-মা, চা-টা পাবোনা নাকি? দেবি তো মেম-সাব বনে গেল, ডাক্তার সায়েবের বউ হবে ও কি আর আমাদের তোয়াক্কা করবে?

ছোট-মা চোখ মটকে তার সুরে সুর মিলিয়ে বললে, না তুমিই তখন ওকে ফরমাশ করতে পারবে?

দেবিকা ছোট-মার দিকে কুটিল কটাক্ষ হেনে অন্যমনস্কে বলে উঠল, দাউ টু ব্রুটাস?

আর পায় কে? দেবশ্রী তাকে হাসির ফলায় বিঁধে টুকরো টুকরো করে বললে, দেখচো তো এরি মধ্যে ও বাঙলা বুলি ভুলে গেল। মেমসায়েব হবার জন্যে ও তপস্যা করছে।

ছোট-মা ও হাসছে।

দেবিকার লজ্জা রাঙা গাল গড়িয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছে।

ছি, ছি, এ কি করে বসলো সে? নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে দিতে লজ্জামোচন করবার জন্যে সে ক্ষিপ্রপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবশ্রী আর একটা হাসির ঢেউ তুলল। ছোট-মা কৃত্রিম কোপন কণ্ঠে বলে উঠল, কেন, তুই ওর সঙ্গে লাগিস বলতো দেবু?

॥ দশ ॥

দেবশ্রী এম-এ পরীক্ষায় পাশ করেছে।

বাড়িতে একটা আনন্দের অন্তর্স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

ছেলে এম-এ পাশ করেছে। মেয়ের অমন সুপাত্রে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। অশ্বিনী গৌরব করবে বই কি?

এত আনন্দের মাঝেও কিন্তু দেবশ্রীর বুকে মরুর ঝড় বয়ে যায়। সিঞ্চন সেই। শুধু তপ্ত বালুর দাহ। আশার মেঘ নেই আকাশে, সিক্ততা নেই বাতাসে, উলঙ্গ আকাশভরা রৌদ্রের খরতাপ।

যত দিন যাচ্ছে তার আশাহত মন যেন একটা বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে এসে পথ হারিয়ে ফেলছে। পথ নেই, পথের কোন নিশানা নেই। ছায়ার একটু আশ্রয় নেই। তার চারিপাশে একটা ধূসর পরিমণ্ডল। শ্বাসরোধী নির্জনতা। পরামর্শ করবার মত কেউ নেই। যাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারতো, নির্ভীকতায় বুক ফুলিয়ে তাদের সে আশ্বাস দিয়েছে। আর সে নিজেকে খাড়া রাখতে পারে না। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। ভয় হয় হঠাৎ সে ভেঙ্গে পড়বে।

চাকরির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মনে আশা একটা চাকরির আওতা থাকলে টাকা জোগাড় করা হয়তো সহজ হবে।

এ বছর কার্তিক মাসে দুর্গোৎসব। পূজোর আর ক-টা দিন বা বাকী? পূজোর পর দিনস্থির হবে। অঘ্রানে বিয়ে।

ভাবতে দেবশ্রীর বুক দুর দুর করে।

রাত্রে ঘুম হয় না।

কেশর চিঠি লিখেছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তার

পরীক্ষার সাফল্যের অভিনন্দন। আন্তরিক আনন্দের উচ্ছ্বাস তার চিঠির প্রতিটি ছত্রে। কেশরকে সে ভুলেছিল। কেশর তার মনের মাঝে ফেনিয়ে উঠল। চিঠিখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে পড়ল। শেষের দিকে কেশর লিখেছে, "পূজোয় বেনারস আসছো তো? জানো দেবু, ক-দিন তোমার জন্যে ভারি মন কেমন করছে। কেন বলোতো? এমন তো কখনো হয়নি। তোমাকে দেখবার জন্য মন ছটফট করছে। কি জানি কেন, তোমার জন্যে মন অত্যন্ত উতল হয়েছে। তোমার ভাবনা আমার মনের রঙ মুছে দিচ্ছে, আমার চোখ জলে ভরে আসছে। তোমার এত বড় সাফল্যকে আমি দিল ভরে উপভোগ করতে পারছি না কেন? কেন বলতো? মন আমার তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে উঠছে। কু গাইছে। কোন কিছু ঘটেনি তো? ভগবান না করুন, যদি কোন ব্যথা থাকে আমাকে জানাতে লজ্জা করোনা। লক্ষ্মীটি! আমাকে জানিও। পূজোয় কিন্তু তুমি না এলে আমি কলকাতা যাবো।"...

চিঠিখানা পড়তে পড়তে কেশরের বুকে বাষ্পের জোয়ার উঠল। চোখ ছুটি বাষ্পাকুল হয়ে এল। তার বুকের অদৃশ্য ব্যথা আর একজনের কোমল বুকে আঘাত হেনেছে। অন্তর্যামী ছাড়া যে-অপার বেদনার বাষ্পমাত্র কেউ জানে না সে ব্যথার ঢেউ গিয়ে পৌছল কেমন করে বহুদূরবর্তিনী ক্ষণ পরিচিতা এক নারীর বুকে। দেবশ্রীর কাছে এ এক প্রচণ্ড বিস্ময়। অপূর্ব রহস্য। এ এক অভাবিত আনন্দ। অকল্পিত বেদনা। কেশর তার চোখে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মেঘলোকের অস্পষ্ট মানুষ, অজানা দেশের অপরিচিত মানুষ যেন কুয়াশার মেঘস্তর ভেদ করে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ঘুমন্ত মনের স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে বাস্তবের রূপ নিচ্ছে। অশরীরী ধ্যানমূর্তি যেন জীবন্ত মানুষ হয়েই দেখা দিয়েছে।

কেশরের চিঠির এই মধুর কথাগুলি মদির হাওয়ার মত তার চিন্তাতপ্তক্লিষ্ট ললাটে প্রসন্ন স্নেহের হাত বুলিয়ে ছিল।

কেশরের অন্তরের মাঝে যে নারীত্বের এত মাধুর্য আর কোমলতা সুষুপ্ত ছিল দেবশ্রী ধারণা করতে পারেনি। লাস্যময়ী ভুবনমোহিনী বাঈজীর অফুরন্ত হাসির অন্তরাল থেকে যে এমন একটি বিরহের করুণ কান্না ভেসে উঠবে সে ভাবতে পারেনি। তার অন্তরের উপলব্ধি যে এত সূক্ষ্ম আর পেলব সে কল্পনা করেনি।

দেবশ্রী মনে মনে হাসে। কেশর শুধু রাগিনী নয়। কেশর কবিতা।

দেবশ্রীর মনে হয় দূরের কেশর তার কাছে এসেছে। তাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছে তার জীবনের হারানো ছন্দ। আঁচল ভরে নিয়ে এসেছে অনুপায়ের আশ্বাস। মুছে দিতে এসেছে তার বিক্ষুব্ধ হতাশ্বাস। হঠাৎ তার মনে হয় সে পথ খুঁজে পেয়েছে। পেয়েছে পথ চলবার স্বাধীনতা। দূর তাকে ডাক দিয়েছে। দূর পথেই হবে তার সন্ধানের সমাপ্তি।

দেবশ্রী অশ্বিনীকে বললে, বাবা আমি একবার কাশী যাবো দিদিমার কাছে। পূজোটা সেইখানেই কাটিয়ে আসবো।

অশ্বিনীর বুঝতে বাকী রইল না যে সে দিদিমার কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চায়।

দেবশ্রী কেশরকে চিঠির উত্তর দিল ঃ তোমার মন-কেমন করা আমার মাঝে ও তুমি সংক্রামিত করে দিলে তাই আমি আগামী শনিবার বেনারস এক্সপ্রেসে বেনারস যাত্রা করছি। সেখানে হপ্তাখানেক থেকে আমি লক্ষ্ণৌ যাবো তোমাকে দেখতে। যাবার আগে তোমাকে কাশী থেকে চিঠি দোব। আমার মনের ব্যথার ঢেউ তোমার মনে গিয়ে আঘাত করেছে জানতে পেরে আমি বিস্মিত হয়েছি। অন্তর্যামী জানেন এর অর্থ কি? প্রকৃতই আমার দিন কাটছে নিদারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে। জানি না কেমন করে

এ সঙ্কট পার হবো। তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। সাক্ষাতে সব বলবো। চিঠিতে লেখবার কথা নয়। শারীরিক কুশল।...

বেনারস স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দেবশ্রী অবাক হয়ে গেল।

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে কেশর। সঙ্গে একটি হিন্দুস্থানী ছেলে।

দেবশ্রীকে দেখেই এগিয়ে এলো কেশর। হাসতে হাসতে হাত ধরে শুষ্ক কণ্ঠে বললে, রাত্রে ঘুমুতে পাওনি ট্রেনে। মুখ চোখ শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে।

—থার্ড ক্লাশ ডিব্বায় আবার ঘুমের কথা ওঠে নাকি? বসে বসে ঢুলেছি। বসবার ঠাঁই পেয়েছি এই কতোনা।

হাসল দেবশ্রী: কিন্তু তুমি এখানে যে?

উত্তর দিল না কেশর। হিন্দুস্থানী ছোকরাকে আদেশ করলে, বেডিং আর স্যুটকেশটা টাঙায় নিয়ে যা ভর্তু।

দেবশ্রীর হাত ধরে এগিয়ে যেতে যেতে কেশর বললে, এ-বেলাটা আমার ও-খানে থেকে ও-বেলা মামার বাড়ি যাবে।

—তোমার ও-খানে মানে?

—লক্ষ্ণৌ নয়। আমার এখানে একটা আস্তানা আছে কেদার ঘাটে।

মুখ টিপে হাসল কেশর।

দেবশ্রী প্রশ্ন করলে, তুমি এখন কাশীতে আছ তো—অর্থাৎ আজ আছো তো?

—বলতে পারি না। কেন বলোতো?

দেবশ্রী কি ভেবে তারপানে চোখ তুলে বললে, একবার দিদিমার সঙ্গে দেখা করে না এলে বুড়ি কিন্তু ভাববে। চিঠি দিয়েছি এই ট্রেনে আসবো।

বাঁকা চোখে কটাক্ষ হেনে কেশর বললে, একসঙ্গে তো দুজনের মন রাখা চলে না। এখন চলোতো আমার ওখানে, তারপর বোঝা যাবে।

দেবশ্রী তার মুখের পানে চাইল প্রশ্নভরা চোখে।

ওভার ব্রিজে উঠে কেশর ফিস ফিস করে বললে, তবে আমাকে নিয়ে চলো দিদি-মার কাছে তোমার ছুটি করিয়ে নিয়ে আসি।

—বেশ তো চলো। তুমি যেতে পারলে আমার আপত্তি নেই।

কেশর হাসল ঃ আমারই বা আপত্তি হবে কেন ?

দেবশ্রী হঠাৎ তার হাতের তালুতে মৃদু চাপ দিয়ে প্রশ্ন করলে, কেমন আছো তাই বলো। কাশীতে কবে এসেছো ?

—কাল। তোমার চিঠি পেয়েই।

কেশরের কণ্ঠ যেন তাকে একটা দমকা হাওয়ার ঝাপট মারল। সে এলোমেলো হয়ে তার দিকে তাকাল।

কেশরের মুখে এক ফালি বেদনার্ত হাসি ভেসে উঠল ঃ না, তুমি আমায় আসতে বলোনি। আমিই অধৈর্য হয়ে ছুটে এলুম। থাকতে পারলুম না।

কেশরের গলার স্বর কেঁপে উঠল। সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

টাঙায় তার পাশে বসে কেশর বলে উঠল, এই যদি পাশ করার চেহারা হয় তাহলে ফেল করার চেহারা কেমন ? এ-কি হয়েছে দেবু ? গায়ের রঙ গেছে জ্বলে, চোখের কোলে কালি পড়েছে, দেহ আধখানা হয়ে গেছে। কী হয়েছে বলোতো ?

দেবশ্রীর বুক কেঁপে উঠল। মুখে ফুটে উঠল ম্লান হাসি। কৌতুক করে বললে, আমি রোগা হয়ে গেছি না তোমার মন-কেমন-করা চোখ দুটি স্নেহাতুর হয়ে উঠেছে ?

কেশর তার গায়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে চোখের ইঙ্গিতে

শাসাল ঃ ঠাট্টা রাখ দেবু। কী হয়েছে আমায় বলো। তোমার চিঠিখানা পেয়ে পর্যন্ত আমি উৎকণ্ঠায় আধমরা হয়ে আছি।

চোখদুটি ছলছলিয়ে এল কেশরের। তার গলার স্বর আন্তরিকতায় আর্দ্র হয়ে উঠল।

দেবশ্রী তার বিষাদমলিন, উদ্বেগ আকুল মুখের পানে চেয়ে ব্যথিত হল। সে তার হাতে একখানি হাত তুলে নিয়ে বলে উঠল, বলবো। বলবো। বাড়ি গিয়ে সব বলবো। তোমাকে না বলে আমার উপায় নেই।

কেশরের মুখে হাসি ফুটল। সে তার দিকে চেয়ে মনের ভার কাটাবার জন্যই কুটিল চোখে হাসতে হাসতে বললে, প্রেমঘটিত কোন ব্যাপার নয় তো রে দেবু?

কথাগুলো দেবশ্রীর কানে গেল কিনা কে জানে। সে অন্তহীন ভাবনার অতলে তলিয়ে গেছে মনে হল। তার নিষ্প্রভ মুখে একটু বিশীর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

টাঙা এসে পৌঁছল কেদার ঘাটের কেশরের আস্তানায়।

সঙ্কটের সঙ্কোচ নেই। অনুপায়ের লজ্জা নেই। সহজ সরল-ভাবেই দেবশ্রী কেশবকে দেবিকার সম্বন্ধের সবিস্তার কাহিনী বিবৃত করল। কোন কথাই গোপন করল না। এ সম্বন্ধ যে তার নিজের রচনা এবং এর দায়িত্বভার সমস্ত সে স্বেচ্ছায় নিজের অক্ষম কাঁধে তুলে নিয়েছে সে কথাও স্বীকার করল। নিতে বাধ্য হয়েছে নইলে এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে যেতো। তার বাবা রাজী হতো না। অনিমেষের সংগে তার গোপন ব্যবস্থার কথাও বলল।

কেশর তার কাঁধে একটা আলতো চাপড় দিয়ে বললে, খুব দুষ্টু তো? তার কাছে গেলে কেমন করে?

—না গিয়ে উপায় কি?

কেশর হাসল ঃ তা বটে। তার কাছে যাবার আগে আমার কথা মনে হয়নি?

—না।

ঘাড় নেড়ে মাথা নিচু করল দেবশ্রী।

—কবে মনে পড়ল আমাকে?

—তোমার মন-কেমনের চিঠিখানা আমার লাজুক মনের ঘুম ভাঙিয়ে ছিল।

কেশর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বেশ। এখন যাও চান করে এসে জল খেয়ে দিদিমার সংগে দেখা করে এসো। এ-সব কথা দিদিমার কানে তুলোনা। দশহাজার টাকা যে পণ দিতে হচ্ছে সে-কথা ওঁদের নাই বললে?

—নাই বললুম—তুমি যদি ভরসা দাও?

—আমার ভরসা তুমি করো নাকি?

তার চিবুক ধরে আনত মুখখানি উঁচু করে তুলে ধরল।

—ভাববো কেমন করে যে—

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেবশ্রী বললে, জানব কেমন করে যে তুমি একসংগে দশহাজার টাকা দিতে পারো?

কেশর তার গায়ে মৃদু টিপুনী দিয়ে বললে, তা বটে। হাড় পাজি! যাও চান করে এসো। দিদিমাকে কিন্তু বলে আসবে কাল আমরা লক্ষ্ণৌ যাবো।

—কাল?

—হ্যাঁ কালই ডুন একস্‌প্রেশে। পূজোর মধ্যে আবার এখানে এলেই চলবে।

—হ্যাঁ। পূজোর চারদিন কাশীতে কাটাতে হবে।

দেবশ্রী স্নান করে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেলে ঘরের ভিতর কেশর গুন গুন করে গাইছে—বাবুল মোরি নৈহারা…

এক গাল হেসে দেবশ্রী বললে, কতোদিন শুনিনি। এক যুগ মনে হচ্ছে।

—শোনবার ইচ্ছে না থাকলে আর শুনবে কেমন করে ? ভিজে কাপড় ছাড়ো। ধুতি গেঞ্জি সুটকেশ থেকে বের করে রেখেছি।

দুজনে চোখাচোখি হলো। কেশর সতৃষ্ণনয়নে তার সন্তস্নাত স্নিগ্ধ নির্মল আদুড় গায়ের পানে চেয়ে দেখল। মুখের রঙটা তার রোদে পোড়া তামাটে দেখাচ্ছে, গায়ে কিন্তু শ্বেতশুভ্রতায় চিকণ শুভ্রতা। চোখ ভরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও যেন তার দেখা ফুরোয় না। গলায় ফুলের মালার মত শুভ্র সিক্ত পৈতের গোছা। কেশরের চোখ যেন তার সর্বাংগে লুটোপুটি খায় আর মিটিমিটি হাসে।

দেবশ্রীও শুভ্র চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে কেশরকে দেখে। কেশর যেন আরো সুন্দর আর বিকশিত হয়েছে। তার তনুদেহের স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটেছে। সাজ-সজ্জার আড়ম্বর নেই। আবরণ আভরণের চাকচিক্য নেই। অতি সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ের মত পরণে একখানি চৌখুপি ডুরে শাড়ি। গায়ে একটি হাতকাটা ব্লাউজ। হাতে ক-গাছি সোনার চুড়ি। কণ্ঠে ফের দেওয়া সোনার মফ চেন। কালো কুচকুচে চুলগুলি শুভ্রায়িত পিঠময় এলানো। নিটোল, অনাবরিত হাতদুখানি ফুলের দণ্ডের মত শিথিল ও মসৃন।

এতক্ষণে তারা দুজনে দুজনকে যেন ভালো করে নিরীক্ষণ করল। প্রতীক্ষা-কাতর পিপাসার্ত দৃষ্টির কুয়াশা মুছে ফেলে দুজনের নতুন করে শুভদৃষ্টি হল।

দেবশ্রীর মনে হল তার অপরিসীম ক্লান্তিকর দুর্ভাবনার সমস্ত দায়িত্ব ভার নিয়ে তার সামনের এই সৌন্দর্যময়ী মেয়েটি তাকে বুকভরে নিশ্বাস নেবার মুক্ত বাতাস দিল। তার তামসী নিশীথের অঢেল অন্ধকার সরিয়ে তাকে নতুন ভোরের আলো দেখাল। তাকে অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে শরীরে ছুটি দিল। বিপর্যস্ত, পীড়িত মনকে নিরাময় করে তুলল।

কেশরের সৌন্দর্য তার ব্যক্তিত্বে। এ ব্যক্তিত্ব দিয়েছে তাকে

তার প্রতিভা। তার ঐশ্বর্য। তার ব্যক্তিত্বে নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে।

কৃতজ্ঞতায় সে নির্বাক হয়ে গেল। সে কেশরের পানে অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইল।

আনন্দে কেশরের চোখদুটি শিখার মত জ্বলছে।

দেবশ্রী জিজ্ঞেস করলে, দিদি-মাকে কি বলবো? কোথায় উঠেছি?

—তাও আমি বলে দোব?

দুজনে হাসল।

দেবশ্রী বললে, তোমার জন্যে মিছে কথা বলতে হবে। বলবো কলকাতা থেকে এক বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। ছাড়লে না তার ওখানেই উঠেছি।

মুখে আঁচল দিয়ে হাসল কেশর। পুরুষ ছলনার ওস্তাদ। তবে দিদিমার সঙ্গে ছলনায় দোষ নেই।

দুজনেই হাসল।

দেবশ্রী বললে, আমি তা হলে খাওয়া দাওয়া করে বিকেলের দিকে আসবো।

খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরে কেশর বললে, না গো ঠাকুর। এইখানে আমার কাছে খাবে। তীর্থে ব্রাহ্মণ সেবা করাতে হয়। সে পুণ্যি থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

—বুড়ি কিন্তু রাগ করবে।

—মিষ্টিমুখ করে বুড়িকে একটা চুমু দিলেই বুড়ি খুশি হবে। বলো, রাত্রে তোমার কাছে খাবো। আর তোমার কাছে শোবো। এখানে তো আমার একখানা খাটিয়া।

ভ্রূভঙ্গি করে কেশর তার পানে চাইল। দেবশ্রী চোখের ইঙ্গিতে তাকে শাসাল।

ভেলুপুরায় দেবুর মামার বাড়ি। দিদি-মা বেচারী ছটফট

করছিল দেবুর আগমন প্রত্যাশায়। বেনারস একস্প্রেস, দুন একস্প্রেস এসে গেল। ভাববারই কথা। দেবশ্রীকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো। আবোল তাবোল বলে বোঝাতে হলো দিদিমাকে। উপায় কি? কেশরের মত হিতৈষী বন্ধুর জন্য কোন মিথ্যাই পাপ নয়।

মুহূর্তে প্রসঙ্গ বদলে গেল।

নিজের পাশ পর্ব। দেবিকার বিবাহ পর্ব। সুসংবাদের বন্যার নিচে চাপা পড়ে গেল দেবশ্রীর মিথ্যা অবতরনিকা।

একা দেবিকার সম্বন্ধ পর্বই বুড়িকে আনন্দে উতরোল করে তুলল। স্বর্গত কন্যার জন্য শোক উথলে উঠল। রেখা সমাকীর্ণ গণ্ড বেয়ে শীর্ণ অশ্রুর ধারা নামল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিদিমা সব জানতে চাইল বিয়ের দেনা পাওনার কথা। কী কী গয়না দিতে হচ্ছে। টাকা কড়ি সব সংগ্রহ হয়েছে কিনা। ধার কর্জ করতে হলো কিনা।

দেবশ্রী মনে মনে হাসল। রক্ষা করেছে তোমাকে কেশর। মুখে বললে, ধার কর্জ করতে হবে বই কি দিদিমা। তবে জোগাড় হয়ে যাবে কোনরকমে। আর না হয়, তখন তুমি তো আছ। শেষ রক্ষে করবে।

—আমার কি আর কিছু আছে রে দাদা। শূন্য কলসী ঢং ঢং করছে। গড়াতে গড়াতে সব শেষ হয়ে গেল তোমার ছোট মামার জন্যে। যা খুদ কুঁড়ো ছিল ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে তবে এই চাকরি হয়েছে। পাঁচ হাজর টাকা জমা দিয়ে তবে এই চাকরি হলো।

দেবশ্রী নিঃশব্দে হাসল। ভয়ে তার বুকের নিচে কাঁপুনি জাগল। কেশরকে স্মরণ করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দিদিমা ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে বললে, ভাবনা কি, তুই বিয়ে করে বোনের বিয়ের ধার শোধ করবি। যেমন দিবি তেমনি আদায় করে নিবি।

—তোমার এ কাঠের ঘোড়া নাতিকে দেবে কে ?

—কেন আমার নাতি ফেলনা নাকি! চার চারটে পাশ করা ছেলে। দেবে না বই কি ?

—পাশ-করা হলে হবে কি দিদি-মা, এক পয়সা রোজগারের যে মুরোদ নেই।

—এইবার রোজগার করবে। হ্যাঁ রে, তবলা বাজিয়ে নাকি টাকা রোজগার করছিস শুনলুম। অনেক মেডেল, সোনাদানা পেয়েছিস নাকি ?

রিষ্ট ওয়াচটা দেখিয়ে বললে, এই হাতঘড়িটা পেয়েছি। আর মেডেল পেয়েছি কটা। একখানা গিনি পেয়েছিলুম এক জায়গায়। টাকা পয়সা নয়। পেশাদার বাজিয়ে হলে তোমার জামাই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

হাসল দিদি-মা।

ত্বপুর পেরিয়ে গেছে। গল্প করতে করতে যে এতোটা বেলা হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না।

বাড়ি পৌঁছতে প্রায় ত্নটো বেজে গেল।

মুখখানা কাঁচুমাচু করে দেবশ্রী বললে, অনেক বেলা হয়ে গেল।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, আমি জানি। এমন নাতি পেয়ে কি দিদি-মা সহজে ছাড়বেন। দিদিমাদের দশাই এই। লক্ষ্ণৌ গিয়ে আর এক দিদিমা দেখতে পাবে। হাড় কালি করে ছাড়বে।

—তোমার দিদিমা ?

—হ্যাঁ। তাঁরই কাছে আমি মানুষ।

কেশর একখানা নতুন দিশী তাঁতের ধুতি আর একটা নতুন গেঞ্জি হাতে নিয়ে বললে, কাপড়টা বদলে নাও।

—কেন ?

বিস্ময়াহতের মত দেবু তার পানে তাকাল।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, আমার শখ। একটু পুণ্যি করবার শখ হয়েছে। ব্রাহ্মণ ভোজন করাবো।

—পাগল!

—পাগল তো দুজনেই। আমরা শিল্পী। হাসতে হাসতে দেবু বললে, শিল্পীরা কিন্তু ধর্মনীতির অনুশাসন মানে না।

দেবু গা আলগা করে নতুন গেঞ্জিটা পরছিল। কেশর তার গলার পৈতেটার পানে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, কাশীর মত পুণ্যভূমিতে এমন একজন সৎব্রাহ্মণ পেয়ে একটু পুণ্য করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। তখন তোমার গলার পৈতে নজরে পড়তেই তোমাকে প্রণাম করবার লোভ হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে আমি প্রণাম করতে পারবো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো।

অন্যমনস্ক গাম্ভীর্যে দেবু উত্তর দিল, এখন তার কোন প্রমাণ পাইনি।

—আমার কথায় বিশ্বাস নেই?

তির্যক ভঙ্গিতে কুটিল কটাক্ষ হানল কেশর।

হঠাৎ একটা আবেগের উচ্ছ্বাসে দেবু তার হাত দুখানি চেপে ধরে তরল কণ্ঠে বলে উঠল, তোমার কথায় বিশ্বাস হারালে আমিই নিজে হারিয়ে যাবো। নিশ্চিত তুমি আমার বড়ো। আমার চোখে চিরদিন তুমি বড়ো হয়েই থাকবে।

কেশর তার মুখের পানে চেয়ে রইল বাক্যহীন স্তব্ধতায়। সমস্ত শরীরে সে যেন ঘুমিয়ে গেল।

খেতে বসে দেবশ্রী বললে, বিকেলে নৌকো নিয়ে বেড়াবো। সন্ধ্যের পর একটু গান বাজনা করব।

কেশর মুখ তুলে বললে, মন্দিরে যাবে না? অতো বড়ো দুঃশ্চিন্তার হাত থেকে বাবা তোমায় নিষ্কৃতি দিলেন, বাবার পুজো দেবে না?

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে দেবশ্রী মুখ নিচু করলে।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, সন্ধ্যের সময় মন্দিরে গিয়ে বাবার আরতি দেখবো, বাবার পূজো দেবো। লক্ষ্ণৌ-এ গিয়ে গান শোনাবো।

একটু থেমে কেশর বললে, নৌকোয় বসে তোমায় বাঙলা গান শোনাবো। অনেক বাঙলা গান শিখেছি।

দেবশ্রী হঠাৎ চকিত হয়ে বললে, তোমার জন্যে ক'খানা বাঙলা কবিতার বই এনেছি। বেডিং-এর ভেতর একটা প্যাকেট আছে।

—দেবিকা দেখেনি ?

—না। তাইতো সুটকেশে নিতে পারিনি। বেডিং-টা আমি নিজে বেঁধেছি।

খিল-খিল করে হাসল কেশর। বললে, এই লুকোচুরির মাঝে একটা উত্তেজনা আছে।

—তা আছে। তবে ধরা পড়লেই মুস্কিল। জবাবদিহি করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

—তা যায়। কিন্তু বেশ মজা লাগে।

আরেকটা হাসির ঢেউ তুলল কেশর। দেবশ্রী প্রশ্ন করলে, আচ্ছা হঠাৎ তোমার বাঙলা শেখবার বাতিক হলো কেন বলতো ?

—আমি যে বাঙালী।

দেবশ্রীর মুখের হাসি নিভে গেল। কথা বলতে সাহস হল না। ভয়বিহ্বল চোখে তার পানে চেয়ে রইল।

কেশর জিগ্যেস করলে, কী গো তোমার মুখ শুকিয়ে গেল কেন ? কী ভাবলে তুমি ?

কেশরের চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেন দেবশ্রীর বুকের গভীরে শলার মত বিঁধল।

দ্বিধাজড়িত কুণ্ঠিতস্বরে দেবশ্রী বললে, তবে যে তুমি লিখেছিলে আমার জন্যে বাঙলা শিখছো।

—হ্যাঁ। তোমাকে বাঙলায় চিঠি লেখবার জন্যে। তবে

তোমার জন্তে আমি বাঙালী সাজিনি। আমি বাঙালীর মেয়ে। আমার বাবা ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ।

—সত্যি ?

—আগে আমি জানতুম না কিনা। যখন জানতে পারলুম, বাঙলা শেখবার আগ্রহ আরো বাড়ল। আর তুমি আমার একমাত্র বাঙালী বন্ধু।

দেবশ্রী বিস্ময়ে তার দীপ্ত মুখের পানে চেয়ে রইল।

কেশর বললে, যখন আমি জানতে পারলুম আমার দেহে বাঙালীর রক্ত আমার সর্ব প্রথম কি মনে হলো জানো দেবু ?

দেবশ্রী মৌন সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তার পানে তাকাল।

কেশর বললে, মনে হলো তুমি না জানলেও তোমার বাঙালী রক্ত আমার বাঙালী রক্তকে চিনতে পেরেছিল, তাই আমাদের দুজনকে অতো ভালো লেগেছিল।

দেবশ্রীর প্রশান্তমুখে প্রসন্ন হাসির ঢেউ বয়ে গেল।

কেশর বললে, লক্ষ্ণৌ-এর বাঙালী কবি অতুল প্রসাদের নাম শুনেছো ?

—নিশ্চয়। 'বাংলা ভাষা' যাঁর বিখ্যাত গান।

—হ্যাঁ। ঐ 'বাংলা ভাষা' গানের গায়িকা হিসাবে রাতারাতি আমি বিখ্যাত হয়ে গেছি। লক্ষ্ণৌ-এর বাঙালীরা মায় কবি নিজে পর্যন্ত আমার প্রশংসায় শতমুখ। কতো ফাংশনে যে ঐ গান আমায় গাইতে হয়েছে কি বলবো।

—তাই বুঝি ? আসলে তোমার মুখের বাংলা বুলি ভারি মিঠে। তার উপর তোমার কণ্ঠে বাউল সুর।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, লক্ষ্ণৌ-এর বাঙালী মহলে তো আমি একজন কেষ্ট বিষ্টু। বাঈজী বলে আর কেউ নাক সেটকায় না।

—কার কাছে বাংলা শিখছো ?

—মাইনে করে বাঙালী স্কুলের এক দিদিমণি রেখেছি। ভারি চমৎকার মেয়ে। সেখানে গেলেই দেখতে পাবে।

—রীতিমত ছাত্রী বনে গেছ তাহলে?

কেশর হাসতে হাসতে বললে, চলোনা, সেখানে গিয়ে তোমার কাছেও কিছু আদায় করে নোব। এম-এ পাশ মাস্টার! বাসরে!

খিল-খিল করে হেসে উঠল কেশর।

—আমাকে মাস্টার রাখো না!

বিদ্যুৎ ঝলসানো চোখে ভ্রুকুটি করে কেশর চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, কিসের মাস্টার?

তার চূর্ণ চূর্ণ হাসির তরঙ্গে, তার শরীরের লালিত্যে ও লাস্যে দেবশ্রীর মনের আকাশ মুক্তিতে মদির হয়ে উঠল।

॥ এগারো ॥

লক্ষ্ণৌ-এর পথে ট্রেনে দেবশ্রী হঠাৎ কেশরকে প্রশ্ন করে বসল, সেখানে নানীর কাছে বা তোমার আত্মীয়-পরিজনদের কাছে আমার কি পরিচয় দেবে কেশর?

দেরাদুন একস্প্রেসের একখানা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। আর কোন যাত্রি নেই গাড়িতে। যাত্রি যা ছিল নেমে গেল বেনারসে। তারা উঠল সেই কম্পার্টমেণ্টে।

দুটো পাশাপাশি বার্থ দখল করলেও তারা দুজনে বসেছে একই বার্থে। পাশাপাশি। নিবিড় নিভৃতি। মাঝে কোন দেয়াল নেই। কৌতূহলী দৃষ্টির আক্রমণ নেই। চলন্ত গাড়ির গতিবেগ। বাইরে রৌদ্রোজ্জ্বল শরতের অবারিত আকাশ। বাতাসের কবোষ্ণ মায়া। দিগন্তের শ্যামোচ্ছ্বাস। পাশে সৌন্দর্যময়ী কেশরের নিকটতম সান্নিধ্য। তার শাড়ির মর্মর, তার নবীন কোমল শরীরে স্নানের স্নিগ্ধতা, তার আকুল-এলায়িত আর্দ্র কেশের সৌরভ সব মিলে মিশে অনভ্যস্ত দেবশ্রীকে বিহ্বল করে তুলেছিল। তার রক্তে জেগেছিল স্বপ্নময় একটি প্রচ্ছন্ন ভীরু অভিলাষ। একটি নতুনতরো জীবনের রঙীন নেশা। সেই নেশার ঘোরে ঘুমন্ত মানুষের মতই কেশরকে সে প্রশ্ন করলে, নানীর কাছে আমার কি পরিচয় দেবে কেশর?

কেশর পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে মৃদু হাসল।

দুজনে দৃষ্টির সজ্ঘর্ষ হল।

হাসির বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল দুজনেরি ঠোঁটের কিনারায়।

কেশর হঠাৎ দেবশ্রীর কোলের উপর হতে উড়ন্ত কয়লার

গুঁড়োগুলো ঝেড়ে দিতে দিতে বললে, তুমিই বলোনা, কী বললে তুমি খুশি হবে?

উত্তপ্ত স্নেহ স্পর্শের বন্যায় দেবশ্রীর রক্তে দোলা লাগে। এক ঝলক বসন্তের উচ্ছ্বসিত হাওয়ার মত মদির সেই স্পর্শ। সেই স্পর্শের মধ্যে দিয়ে তার জীবনের সমস্ত অনুরাগ যেন সে তার গায়ে ঢেলে দিল। তার জীবনে পূর্ণতার একটা অনুভূতি জাগিয়ে দিল।

—বলো। কী বললে তুমি খুশি হবে? কোন পরিচয়ে তোমার অসম্মান হবে না?

দেবশ্রী অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বললে, আমার কথা আমি মোটেই ভাবিনি। তোমার এই প্রাণময় অভ্যর্থনাই আমার সবচেয়ে বড়ো সম্মান। আমি তোমার কথা ভেবেই বলেছি।

—কেন? আমার কথা তুমি ভাববে কেন? তুমি আমার অতিথি। অতিথি সেবা হিন্দুর কর্তব্য নয় ধর্ম। পুণ্যের আদর্শ নিয়েই হিন্দুরা অতিথি সেবা করে।

মুখ টিপে হাসল দেবশ্রী। বললে, এর মাঝেও তোমার সেই লুকোচুরি খেলা আছে তো? আমার দিদিমার সঙ্গে যেমন আমি করে এলুম।

সশব্দে হেসে উঠল কেশর: তা ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বললে, না। আমি কেন লুকোচুরি করতে যাবো? সত্যি যা তাই বলে কাশী গিয়েছিলুম। কলকাতার এক বন্ধু এসেছে দেখা করতে যাচ্ছি।

আবার হেসে ফেললে কেশর: তবে পুরুষ বন্ধু কি মেয়ে বন্ধু বলিনি। জিগ্যেস করেনি বলেই বলিনি।

দেবশ্রী বললে, তাইতো জিগ্যেস করছিলুম এখন কি বলবে?

—যা সত্যি তাই বলবো। বলবো প্রিয় বন্ধু। আমি কি কারুর তোয়াক্কা করি নাকি? আমার ঘরে তো বর নেই যে কৈফিয়ৎ চাইবে।

আরক্ত মুখে দেবশ্রী কেশরের ড্যামকেয়ার ভঙ্গির পানে চেয়ে হাসল।

কেশর ধমকের স্বরে বললে, তোমার এতো ভাবনা কেন বলোতো ?

দেবশ্রীর মুখখানা গাম্ভীর্যে থমথম করছে। একমুখে কত কথা বলবে সে। মনের আষ্টেপৃষ্ঠে তার কথার জটলা। কথার মালা গেঁথে তার গলায় পরিয়ে দেবার জন্য সে হাঁসফাঁস করছে। দেখা হলে যে-কথাগুলি বলবার জন্য মনে মনে জল্পনা কল্পনা করে রেখেছিল নিদ্রাহীন রাত্রের নিভৃত গৃহকোণে বসে, সে-সব কথা কোথায় গেল তলিয়ে! দূর থেকে যা রচনা করে আনল হাতের কাছে পেয়ে তা উচ্চারণ করতে পারেনা কেন ? কণ্ঠ তার ভাষা পায় না কেন ?

কিছুক্ষণ নিস্পন্দের মত পলকহীন চোখে তার পানে চেয়ে থেকে সে গাঢ়স্বরে বলে উঠল, আমাকে তোমার কথা ভাবতে মানা করো ?

কেশর চমকে উঠল তার পরুষ গলার স্বরে। এই স্বরের প্রভাব তার মনে কাঁপন জাগায়। তার মনে হয় এর কাছে সে দুর্বল। শক্তিহীন। সে পুরুষ। সে দুর্ধর্ষ। দুর্নিবার। নারী যার শরণাগত।

কেশর তার পানে তাকাল। এই দুর্জয় দৃঢ়তা, এই দুর্বার শক্তিই তার সৌন্দর্য। তার এই পরুষ সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হল।

সে হঠাৎ একটা হাসির ঢেউ তুলে তার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললে, ক্ষিদে তেষ্টা ভুলে তুমি আমার কথা ভাবো কিন্তু আমাকে এখন কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করো দেখি।

গাড়ি একটা স্টেশনে থামল।

রেস্তোঁরার বয় এসে সামনে দাঁড়াল।

—ভাত না রুটি ? প্রশ্ন করল দেবশ্রী।

—দুই মিলিয়ে। পুরোপুরি বাঙালী এখনো হতে পারি নে। জন্মের দোষ।

দেবশ্রী হাসল।

সংসারে একা না হলেও কেশর মনের মাঝে একা। কেশর স্বাধীন। কেশর স্বয়ম্ভর। তার জীবনের চাবিকাঠি তার নিজের হাতে। তার জীবনের ব্যাখ্যা সে নিজে। তার জীবনের পটভূমিতে নেই কোন বৈচিত্র্য। নেই কোন বৈলক্ষণ্য। প্রাত্যহিকতায় নেই সাড়ম্বর সমারোহ।

দেবশ্রীর কল্পনা ব্যাহত হল। মনে একটা স্বচ্ছতা পেল। স্বস্তি পেল। বাঈজীর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে তার মনের কোণে যে-সব আজগুবি ধারণা ছিল, তা মুছে গেল। সাধারণ সংসারের মতোই এর সুখকোমল শান্তিময় পরিমণ্ডলটি তার ভালো লাগল।

কেশরই সংসারের প্রাণবায়ু। চাঁদের আলোর মত সংসারকে ভরে আছে। স্বচ্ছল সংসার। দুঃখ দৈন্যের অন্ধকার আমল পায়নি। কেশরের হাসিখুশি, আদর আপ্যায়ন আর নানীর আতিথ্য ও পরিচর্যা দেবশ্রীর দিনগুলিকে মধুময় করে তুলল। কেশরের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে সে যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছে তেমনি তার দুঃশ্চিন্তা দুর্ভাবনার অবসান ঘটাতে পেরে কেশর যেন ধন্য হয়েছে। দেবশ্রীর কাছে তার ব্যক্তিত্বের মূল্য বেড়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদে সে ঝলমলিয়ে উঠেছে। দেবশ্রীর নির্ভরতা তার মনে আত্মপ্রত্যয়ের আলো জ্বেলেছে। তাকে সুখি করেছে। তাকে কৃতার্থ করেছে।

এ সুযোগ যে তার হবে সে ভাবতে পারেনি।

পরের দিনই সে দেবশ্রীকে বললে, দেবু টাকাটা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। বাবার নামে টাকাটা পাঠিয়ে দাও রেজেষ্টারী

করে। তিনিও দুর্ভাবনায় আছেন। টাকাটা হাতে পেলে নিশ্চিন্ত হবেন।

কৃতজ্ঞতা সজল নয়নে তার পানে চেয়ে মৃদু হাসল দেবশ্রী। কোন কথা বলতে পারল না। তার উদ্বেল হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ শাশ্বত প্রেমের প্রতিশ্রুতির মত অচঞ্চল অনির্বান শিখায় জ্বলে উঠল।

কেশর বললে, কাল দুপুরে দুজনে ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকাটা তুলে নিয়ে রেজেষ্ট্রী ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে আসবো। কারুকে এ-কথা জানাতে চাই না। নিজেদেরই এ কাজ করতে হবে।

দেবশ্রী মুখখানা কাঁচুমাচু করে নম্র গলায় বললে, কিন্তু আমি একটা লিখে দেবো তো? সেটা কারুর সঙ্গে পরামর্শ করা তো দরকার। কী কাগজে লেখা হবে, কতো ষ্ট্যাম্প দিতে হবে—

তার গায়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে কেশর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু!

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসির ঢেউ তুলে কেশর বললে, ও শুধু হাতে লেখা পড়ার দাম কি? তুমি আমার কাছে বাঁধা রইলে।

দেবশ্রীও হালকা হাসি হাসল। বললে, ঘোড়া গরু বন্ধক রাখলে তাকে খেতে দিতে হয়। মানুষ বন্ধক রাখলে—

আবেগের উচ্ছ্বাসে কেশর বলে উঠল, তাতেই কি আমি পেছপা নাকি?

দেবশ্রী বললে, কিন্তু তাতেও একটা বন্ধকী তমসুকের দরকার।

ঠোঁট উলটে কেশর বললে, ছাই! তুমি তো সব জানো। এই যে তোমরা দেবির বরকে টাকা দিচ্ছো তোমরা কি লিখিয়ে নিচ্ছো নাকি?

কথাটা কেশরের জিব পিছলে বেরিয়ে গেছে। বলে ফেলেই সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। দেবশ্রী হেসে উঠল! কী বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। তাদের চা নিয়ে নানী ঘরে ঢুকল।

কেশর কিন্তু দমবার পাত্রী নয়। সে সেই জাতের মেয়ে যারা ভুল করেছি জেনেও ভুল স্বীকার করে না। ভুল শোধরাবার চেষ্টা করে না।

সে নানীর পানে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, জানো নানী, দেবুবাবুর বোনের সাদিতে ওরা জেবর ছাড়া নগদি দশ হাজার রূপেয়া দিচ্ছে।

নানী হাসিমুখে দেবুর পানে চেয়ে বললে, তা ভালো বর হলে দিতে হবে বইকি!

কেশর থালা থেকে একমুঠো ডালমুঠ মুখে ভরে দিয়ে বললে, তোমরা আমার বিয়েয় কতো টাকা দেবে গো? অতো টাকা দিতে হলে তো আমার সাদিই দেবে না।

নানী বাঁকা চোখে ভ্রুকুটি করে বললে, তোমার বিয়েতে টাকা দিতে হবে না। টাকা ঢেলে দিয়ে তোমায় নিয়ে যাবে। কতো রাজা রাজরা তো সাধাসাধি করছে! তোমার মন হচ্ছে কই?

—মন হবে কেমন করে? আমি বিয়ে করে হবো বউ। রাজা রাজরার বাঁদি হবো না। তাদের টাকা নোব কেন? ভুলে যাও কেন আমি বাঙালী। এই দেখো না যতো ছাইভস্ম দেশোয়ালী খাবার এনেছো। পকৌড়ি, পাঁপড়ভাজা, ডালমুঠ। বাঙালীর দোকান থেকে রসগুল্লা, সন্দেশ আনাতে পারোনি? আমরা বাঙালী বাংলা খানার ব্যবস্থা কোরো।

নানী অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে দেবশ্রীর পানে চাইল।

দেবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, না গো নানী। তোমার খানা আমার খুব পছন্দ।

ডালমুঠ চিবোতে চিবোতে কেশর চোখের কোণ দিয়ে দেবুর পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, নানীর খানা পছন্দ না আমার নানীকে পছন্দ?

কেশর গলগলিয়ে হাসল।

নানী তার গাল টিপে দিয়ে বললে, তোর মতো বয়সে নানী তোর চেয়ে কম খুবসুরৎ ছিল না লো ?

দেবশ্রী মুখটিপে হাসতে হাসতে বললে, এখনি বা কম কি ?

মিলিত হাসির একটা কলরোল উঠল।

কেশরের এ এক নবতর আবির্ভাব।

দেবশ্রীর মধুর লাগল।

শহরের উপান্তে গোমতী তীরে কেশরের এই বাড়ি। শহর কেন্দ্রের কোলাহল কলরব নেই। বাড়ির একদিকে নগরের সাড়ম্বর চাকচিক্য। অন্যদিকে গ্রাম্য শ্যামলতা। সেই শ্যামল অরণ্য অটবীর ব্যূহ ভেদ করে দুরন্ত মেয়ের মত আঁচল উড়িয়ে স্খলিতপায়ে তর তর করে বয়ে চলেছে খরস্রোতা গোমতী। নদীর ও-পারে বিস্তৃত জনপদ। হরিৎ শস্যক্ষেত্র। বিক্ষিপ্ত বনভূমি। কেশরের বাড়ির দোতলার ছাত থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কত মসজিদ, কত ইমামবাড়া ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। কত দরগা। কত সমাধিস্তম্ভ মুঘল স্থাপত্যের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করছে। কত গর্ব, কত অহঙ্কার, কত বিলাস-বাসনা, কত উদ্ধত অভিলাষ। কত আকিঞ্চন ঐ সমস্ত ভগ্নস্তূপের ধূলায় চাপা পড়ে আছে। দেবশ্রী পুরনো ইতিহাসের পাতা উলটে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের পুণ্যপীঠ। সঙ্গীতানুরাগী নবাব ওয়াজিদআলি শার নির্বাসন। তার মনের দুকুল ছাপিয়ে এক অননুভূতপূর্ব চিন্তার তরঙ্গ ওঠে।···

উপরতলার এ অংশটি একেবারে নিরিবিলি। দুখানি বড় ঘর। একখানা কেশরের রেওয়াজ করবার ঘর। ঢালা ফরাশপাতা। বাজনার যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। আরেকখানি ঘর লাইব্রেরী ঘরের মত সাজানো। দুটো বইয়ের আলমারি। একপাশে একটি ছোট টেবিল ও দুখানা চেয়ার। বিভার কাছে এইখানে সে পড়াশুনো করে।

এই ঘরের একপাশে একখানি ফিতের খাটিয়ার উপর কেশর

পূজার ফুল। তুমি শাপভ্রষ্ঠ তপোবনের ঋষি কন্যা। নিজের জন্ম নিয়ে রহস্য করো না।

তিরস্কৃত বালকের মত কেশর অধোবদনে স্তব্ধ হয়ে রইল। বিভা তার সমবয়সী হলেও বিভাকে সে শিক্ষিকার সম্মান দেয়। শ্রদ্ধা করে। তার কাছে সে বাঙালী মহিলার সহবত শিখতে চায়।

দেবশ্রী মনে মনে হাসল। প্রশংসা করল বিভার ঔদার্যকে।

সন্ধ্যার পর কমসে কম দুটি ঘণ্টা কেশরের রেওয়াজের জন্য চিহ্নিত। ধর্মানুষ্ঠানের মত কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সুর সাধনা করে এই সময়টিতে।

দেবশ্রী উন্মুখ হয়ে এই সময়টির প্রতীক্ষা করে। কেশরের সুরের আলাপ শোনবার জন্য তার প্রতীক্ষা অধীর হয়ে ওঠে। এই সময়টিতে কেশর যেন অন্য জগতের মানুষ। তার চেহারা বদলে যায়। মুখের ভাব বদলে যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন বদলে যায়। তাকে চেনা যায় না।

ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢুকল একটা আলোর শিখার মত! স্মিতমুখে লজ্জার অরুণ রাগ। কাজল আঁকা নয়ন কোণে প্রীতির বিদ্যুৎ ঝলক। বর্ষার জলে ধোওয়া ফুলের মত শুভ্র শরীরে রেশমের শুভ্রতর শাড়ি। ললাটে কুঙ্কুম, বিন্যস্ত বেণীতে কুন্দফুলের মালা। কম্পিত অধরে তাম্বুল রাগ। মানসপূজার আসনে এসে বসল বীণা হাতে নিয়ে। অভিসারিনী এলো তার প্রেম বৃন্দাবনে প্রিয়তমের কাছে আত্মসমর্পনের কৃতসঙ্কল্প নিয়ে। ধ্যানাবিষ্ট চোখে দেবশ্রীর পানে চাইল। অধরে ফুটে উঠল সংবেশিতের বিবশ হাসি। মনের গান কণ্ঠে ফুটে উঠল। চঞ্চল হয়ে উঠল দেবশ্রী। তার সবল, সুকুমার আঙুলের স্পর্শে তবলা জলতরঙ্গের মত মুখর হয়ে উঠল। কেশরের মনের আকাশ আলো হয়ে উঠল। দীপ্র আনন্দে তার

মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে প্রগলভ হয়ে উঠল বৃষ্টি সিক্তি অটবীর মত। মর্মরিত হয়ে উঠল অশ্রান্ত ধারাপতনের আঘাতে। দেবশ্রীর সঙ্গত তার সুরকে আচ্ছন্ন করে দিল। তার উতল সুর একটি সুনিবিড় তৃষ্ণার মত তার সঙ্গতের উচ্ছ্বসিত নদীতে অবগাহন করল। দুজনে আশ্লিষ্ট দেহে সত্তায় সত্তায় মিলে মিশে লয় হয়ে গেল।

গান থামল।

ভবানী ওস্তাদ ও সঙ্গীতানুরাগী কেশরের সাঙ্গপাঙ্গ দেবশ্রীর বাজনার তারিফ করল।

দেবশ্রী কেশরের মুখপানে তাকাল।

কেশর প্রসন্ন মুখে তার পানে চেয়ে মৃদু হাসল। অদ্ভুত রহস্যভরা সে হাসি। আবেশে তার কালো চোখের দীর্ঘ-পল্লবগুলি জড়িয়ে এল। সঙ্কোচের মাধুর্যে তার মাথা নত হয়ে এল।

কেশরের ললাটে মুক্তার মত ঘাম ফুটেছে।

বিভা এতোক্ষণ অভিভূতের মত নিমেষহীন নয়নে তাদের পানে চেয়েছিল। তাদের এই মধুর নিবেশ, তাদের দৃষ্টির কুহক বিভার আদিম অনুভূতিকে উসকে দিল। তাদের দৃষ্টির জড়িমা, আর মুখের প্রসন্ন রক্তিমা দেখে তার মনে হল যেন দুটি প্রণয়ী নিভৃতে রাত্রিবাস করে ভোরের আলোয় নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে যাচ্ছে। এদের মুখে তেমনি নিবিড় তৃপ্তির আভাস। তেমনি সরমের রক্তিমা। স্বপ্নাতুর চোখে তেমনি আবেশ। ভোগারতির স্তিমিত দীপশিখার মতই এরা অবসিত। অপচিত। দুটি শিল্পীর এই সাধনার মধ্যেই তাদের নিঃশেষ সমর্পণ। তাদের আসঙ্গ সুখ। তাদের মিলন বাসর।

বিভা বিবাহিতা। পতি সঙ্গসুখের আস্বাদ জানে। নিজের জীবনের ব্যর্থতা দিয়ে এদের নিগূঢ় প্রেমকে সে অনুভব করেছে। এদের প্রেমের অভিনবত্ব তাকে বিস্মিত করেছে, তাকে মুগ্ধ করেছে।

কেশরের সঙ্গে পরিচয়ের আদি পর্বেই তার মনে হয়েছিল কেশরের অন্তরে সুন্দরের আসন পাতা আছে। কেশর সুন্দরের উপাসিকা। সুন্দরের অভিসারিকা। কণ্ঠে তার আকুল আহ্বান। দেহময় অর্ঘের ডালি। চোখে অনুসরণ। পূজারিণী সে মানসবৃন্দাবনে। প্রতীক্ষার প্রদীপ জ্বেলে বসেছিল।...বিভার চোখে ভাল লেগেছিল তার এই মধুর ভাবাবেশটি! আজকের এই সাথ-সঙ্গত দেখে তার মনে হল, কেশরের মন আগে থেকেই ভরা ছিল। তার যৌবনের আকাশে রঙিন ছায়া ফেলে দেবশ্রীর আবির্ভাব হয়েছে সুন্দরের রূপ নিয়ে। কেশর তাকে তার সুরে পেয়েছে। প্রাণে পেয়েছে। তার যৌবনের ক্ষুধা মিটিয়েছে এই সঙ্গত সাধনার মধ্যে দিয়ে।

সুন্দর। দেবশ্রী সুন্দর নিঃসন্দেহ। প্রিয়তমকে কেশর তার কাছে পেয়েছে। প্রিয়তম তার ঘরে এসেছে। তার মনের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তার মনে কোটালের বান ডেকেছে।

সে কেশরের মুখপানে চেয়ে মিটি মিটি হাসে। এই অপূর্ব প্রিয়মিলনের সুখাবেশে কেশরের শরীরে ফুটেছে মধুর লাস্য। বিরহের আঁধার কেটে গিয়ে মনের দিগন্তে ফুটেছে নতুন উষার আলো। কৌমার্যের সুষমার উপর উন্মীলিত নারীত্বের নতুন বর্ণাভা।

বিভার মনের কালো পটভূমিতে ফুঠে ওটে মিলনের একখানি জ্যোতির্ময় ছবি। কেশরের অন্তর্দেশের যে দিকটা অপরিচিত ছিল সে দিকটার পরিচয় পেয়ে সে খুশি হল।

দেবশ্রীকে তার ভালো লেগেছে।

লয়েডস ব্যাঙ্কে কেশরের অ্যাকাউন্ট।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে টাকাটা রেজেষ্ট্রী করে দিল দেবশ্রীর বাবার নামে।

দেবশ্রী একখানা চিঠিও লিখল বাবাকে। পুজোর পর ত্রয়োদশীর দিন বরপক্ষকে পণের সমগ্র টাকাটা দিয়ে দিতে লিখল। আর লিখল টাকাটা লক্ষ্ণৌ-এর এক বিশিষ্ট বন্ধুর কাছে কর্জ করলাম। আশ্বাস দিল দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

ডাকঘর থেকে বেরিয়ে এসে কেশর বললে, বোনের বিয়ের দুর্ভাবনা মিটলো তো? এইবার নিজেরা একটু দিল খুলে আনন্দ করি চলো। আজ সারা শহরটা প্রদক্ষিণ করে বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যগুলো তোমাকে দেখাবো। তারপর একটা ভালো হোটেলে গিয়ে একপেট খেয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবো।

দেবশ্রী হাসতে হাসতে বললে, নানী ভাববে আমি তোমাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেলুম।

কেশর তার মুখের পানে চেয়ে কি-ভেবে বললে, সত্যিই যদি আমরা উধাও হয়ে যাই? দোষ হবে আমার। লোকে বলবে আমিই তোমাকে নিয়ে উধাও হলুম।

—কেন? আমি কি নাবালক নাকি?

হাসল কেশর মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। জিজ্ঞেস করলে, নাবালক বললে কি তুমি চটে যাবে নাকি?

মাথা দুলিয়ে গলায় জোর দিয়ে দেবশ্রী বললে, সার্টেনলি। নাবালককে তুমি কি এতোগুলো টাকা ধার দিতে নাকি?

—ধার তো আমি দিইনি।

চমকে উঠল দেবশ্রী: তবে?

—বলবো'খন সময় হলে। এখন একখানা ভালো প্রাইভেট মোটর ভাড়া করো দিকি। দুজনে একটু নবাবী করা যাক। এটা নবাবের দেশ। নবাব ওয়াজিদ আলিশার প্রাসাদ দেখে আসি চলো।

গাড়িতে বসে কেশর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এই লক্ষ্ণৌ ছেড়ে যেতে নবাবের বুকে যে কতো আঘাত বেজেছিল তাঁর একটি

গান থেকেই তার প্রমান পাওয়া যায়। জানো সেই গানটা ঃ যব লক্ষ্মৌ ছোড়কে ...

—জানি না তো।

—আমিও সবটা জানি না। চমৎকার গানটা। চোখের জল রাখা যায় না।

কেশর একসময় দেবশ্রীকে প্রশ্ন করলে, এখানে আমার সঙ্গে পথে পথে ঘুরতে লজ্জা করছে না তো ?

—তোমার ঘরে অতিথি হতে যদি লজ্জা না থাকে তোমার সঙ্গে ঘুরতে লজ্জা করবে কেন ?

—তা জানি। ঘুরতে তোমার লজ্জা নেই। কিন্তু আমার বাড়িতে থাকতে তোমার লজ্জা করে। না ?

—কে বললে ?

—আমি বলছি। আবার কে বলবে ? কাশীতে আমার ওখানে যেমন প্রাণ খুলে ছিলে, এখানে ঠিক তেমনিভাবে থাকতে পারছো না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধছে।

—কাঁটা আবার কিসের ?

—সংস্কারের কাঁটা ?

চোখ বড় বড় করে কেশরের পানে তাকাল দেবশ্রী। বললে, একলা তুমি আর আমি—আর পাঁচজনের মাঝে তুমি আর আমি—

হেসে উঠল কেশর ঃ বুঝেছি। পূজোয় আমরা কাশী যাবো।

—তুমিও যাবে ?

—হ্যাঁ। নবমীর দিন সেখানে গান আছে।

দেবশ্রীর চোখদুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কেশর মনে মনে হাসল। জিজ্ঞেস করলে, তুমি বাজাবে আমার সঙ্গে ?

—লোক জানাজানি হবে না ?

দ্বিধা জড়িত স্বরে দেবশ্রী প্রশ্ন করল।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, সে ব্যবস্থা আমি করেছি।

—কী ব্যবস্থা ?

—আমি ওদের বলেছি, কলকাতা থেকে একজন খুব ভালো বাজিয়ে এসেছে। পারেন তো তাকে জোগাড় করুন। তোমার মামার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছি। তারা ডাইরেক্ট তোমার কাছে গিয়ে দেখা করবে। তা হলে আর তোমার আপত্তি কি। আমাদের হৃদ্যতার পরিচয় না পেলেই তো হলো ?

দেবশ্রী হাসল। হঠাৎ তার মুখের হাসি নিভে গেল। সে কেশরের একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করলে, আমাদের এই হৃদ্যতাকে কি আমরাও সংশয়ের চোখে দেখি ? আমরাও কি নিজেদের ভয় করি ?

—কেন ?

—নইলে আমাদের এই হৃদ্যতাকে আমরা গোপন করতে চাই কেন ? নিজেরাই যদি একে 'সম্মান দিতে ভয় পাই তবে পরে একে সম্মান দেবে কেন ?

কেশর চমকে গেল। সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না। তার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল।

দেবশ্রী তার হাতখানা নাড়তে নাড়তে উত্তেজিত স্বরে বললে, আমাদের অন্তরঙ্গতার তলা থেকে তো কাদামাটি ঘুলিয়ে ওঠেনি যে আমরা লজ্জা পাবো নিজেদের প্রকাশ করতে। আমরা শিল্পী, আমরা রূপকার। আমাদের অন্তরের এই যোগাযোগ একান্ত স্বাভাবিক। তবে আমাদের এই সঙ্কোচ কেন, আমাদের স্বাধীন বৃত্তিকে গোপন করবার এই হীন প্রয়াস কেন ?

কেশর মনে জোর পেয়ে হাসল। পুরুষের গায়ে ঠেস দিয়ে আদিম নারী পৃথিবীর অনন্ত সৌন্দর্যের পানে তাকাল। শস্যে ও কুসুমে ভরা ধরার বুকে বিচরণ করবার শক্তি পেল। সঙ্গী পেল। সৃষ্টির প্রেরণা পেল। দেবশ্রীর মাঝে সেই শক্তিমান আদিম

পুরুষকে সে প্রত্যক্ষ করল। তার চোখে দুঃসাহসের ইঙ্গিত। সে তার চেয়ে অনেক শক্তিমান। অনেক বলবান। সে শুধু পুরুষ নয়। সে প্রেমিক। কেশর দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা তুলে হাসতে হাসতে বললে, কাকের বাসায় মানুষ হলেও আমি পিক শিশু। লজ্জা করবে কেন? ভয় পাবো কেন?

॥ বারো ॥

সারাদিন দেবশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্ণৌ-এর পথে পথে ঘুরে বেড়াল। কেশর দেখাল তাকে জু। ইমামবাড়া। ওয়াজিদ আলির প্রাসাদ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রেসিডেন্সি। আরো অনেক প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষতচিহ্ন। তারপর নতুন শহরের কেন্দ্রে গিয়ে উঠল একটা প্রসিদ্ধ দর্জির দোকানে। কেশর বললে, এখানের দর্জি ভালো। কটা জামা কিনে নাও।

দোকানী সসম্ভ্রমে তাদের অভ্যর্থনা করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেবশ্রীর ইচ্ছা থাকলেও তার সামনে মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারলে না। সে ইঙ্গিতভরা দৃষ্টিতে কেশরের পানে তাকাল।

কেশর গম্ভীর হয়ে বললে, সামনে শীত। একটা ভালো গরম কোট আর একটা ফ্লানেলের সার্ট পছন্দ করো।

দেবশ্রী নিঃশব্দে নতমুখে তার হৃদয়সৌধের অন্তর্দ্বার খুলে ভিতরের সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলো নিরীক্ষণ করতে চাইল। কী আছে তার অন্তর্গূঢ় অলকাপুরীর অলিন্দে ?

কেশর তার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললে, পছন্দ করো না দেবু।

পছন্দ সে নিজেই করল। গায়ে পরিয়ে আর্শির সামনে দাঁড় করিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাত তুলিয়ে, হাত নামিয়ে দেখল। ঠিক ফিট করেছে কিনা।

দোকানী বললে, চমৎকার ফিট করেছে। কেউ বলবে না যে রেডি-মেড কোট।

কোট হল। ভায়লা ষ্ট্রাইপ দেওয়া ফ্লানেলের একটা সার্ট হল। তিনটে কটন সার্ট হলো।

দেবশ্রীর কোন ওজর আপত্তি টিকল না। সে উদাসীন হয়ে রইল।

শেষে বললে, কই নিজের জন্যে তো কিছু নিলে না?

—সত্যি। আমারটা তুমি পছন্দ করে দাও। গরমের নয় সিল্কের।

দেবশ্রী হাতের কাজ করা একটা সিল্কের ব্লাউজ পছন্দ করে দিল।

কেশর হাসলে: আমার পছন্দকে তুমি চিনলে কেমন করে?

দেবশ্রী দোকান থেকে বেরিয়ে গম্ভীর হয়ে বললে, তোমাকে কিন্তু চিনতে পারলুম না।

কেশর গাড়িতে বসে বললে, চেনবার দরকার কি? বেশি চেনা ভালো নয়।

—কেন?

—ভুলতে কষ্ট হবে।

দেবশ্রী খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, তুমি বুঝি ভুলতে চাও? ভোলাতে চাও?

দেবশ্রীর গলার স্বর বাষ্পাচ্ছন্ন। চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত। সে মুখ ঘুরিয়ে বাইরের পানে চাইল।

—রাগ করলে দেবু?

—ভুলতেই যদি বলছো তবে এমন শক্ত বাঁধন দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধছো কেন?

—বাঁধলুম আবার কই? আমার দিকে চাও। চোখের জল মোছ। ছি, তুমি না পুরুষ মানুষ!

দেবশ্রী লজ্জা পেল তার কণ্ঠের দৃঢ়তায়। তার ভর্ৎসনাপূর্ণ চোখের দৃষ্টিতে।

কেশর নম্র স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, হঠাৎ তুমি অমন ক্ষেপে যাও কেন বলো তো? মেয়েদের মন না বুঝে ধাঁ করে কথা বলার বিপদ আছে।

কেশর তাকে কাছে টেনে নিয়ে কৌতুক করে বললে, একজন মেয়েকে নিয়ে তো ঘর করতে হবে? মেয়েদের বোঝবার চেষ্টা না করলে দুখ্যু পেতে হবে। কিসে মেয়েরা খুশি হয়, কিসে দুখ্যু পায়—

দেবশ্রী মাঝপথে আক্রমণ করলো: দুখ্যু দেবার মতো কোন কথা আমি বলেছি নাকি?

হাসল কেশর: ঐ যে বাঁধন দেবার কথা বললে। আমি কি তা হলে তোমাকে হাত করবার জন্যেই জাল ফেলছি?

—ছি!

—আমার মনের পানে তোমার চোখ পড়ল না। আমি কত একা। কত নিঃসঙ্গ। স্নেহের বস্তু বলতে এমন কেউ নেই যাকে নিয়ে আমি শখ সাধ মেটাই। আমার বয়সের মেয়েরা সব ছেলের মা। ভায়ের বোন। স্বামীর স্ত্রী। আমার কী আছে? কে আছে? অথচ বাঈজীর ভেতরের মেয়েটার মনে শখ আছে। সাধ আছে। লোভ আছে। মেয়েদের দেবার শখ যে কত বড় আর কী দুর্নিবার তুমি অনুমান করতে পারবে না। আমার জীবনে কখনো কারুকে হাত তুলে দেবার সুযোগ হয়নি। দেবার মত কোন প্রিয়জনের সাক্ষাত মেলেনি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমার সেই বাসনা উদ্দাম হয়ে উঠলো। তোমাকে কিছু দেবার বাসনা। দান নয় উপহার। সে উপহারকে তুমি হাসিমুখে নিতে পারবে না কেন?

কেশরের উচ্ছ্বাসকে আবৃত করবার জন্যই দেবশ্রী কৌতুক করে বললে, বামুনের ছেলে দান নিতে কাতর হবে? কী যে বলো তুমি? তোমার পুণ্যি কাজে বাধা দোব কেন?

যা খুশি দাও। যতো খুশি দাও। তবে আশীর্বাদ তো করতে পারবো না।

কেশর হেসে ফেললে : কেন?

—তুমি যে বলো আমার চেয়ে তুমি বড়।

—আমি যে বলি—তোমার বিশ্বাস হয় না?

খিল খিল করে হেসে উঠল কেশর।

গম্ভীর হয়ে দেবশ্রী বললে, মাঝে মাঝে হয়।

চোখে ঝিলিক দিয়ে কেশর জিজ্ঞেস করলে, কখন হয়?

—আজকের কথাই বলি। দোকানে যখন আমার জন্যে জামা কিনছিলে তখন আমার কী মনে হচ্ছিল জানো?

—কী?

—আমার দেবিকাকে মনে পড়েছিল। তোমার হাব-ভাব, কথাবার্তা মায় চোখের চাউনি, মুখের হাসি পর্যন্ত যেন ঠিক তারি মত হয়ে গিয়েছিল। তবে সে ছোট, তুমি বড়। তারি মত অনর্গল স্নেহ, তারি মত অকুণ্ঠ জুলুম। তারি মত অভিভাবকতা। তখন মনে হচ্ছিল, তুমি আমার বড়। আমার চেয়ে অনেক কিছু জানো। অনেক বেশি বোঝ।

বিলোল ফুলের মত কেশরের মুখখানি বিকশিত হয়ে উঠল। সে ঠোঁট মুচড়ে হাসল : আর কখন ছোট মনে হয়?

দৃঢ়স্বরে দেবশ্রী উত্তর দিল, বলবো না। জিজ্ঞেস করো না।

—বেশ। বলোনা।

কৃত্রিম অভিমানে কেশর ঠোঁট ফোলাল।

দেবশ্রী স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরে বললে, তুমি শতরূপা।

কেশরের মুখে রক্তের জোয়ার, বুকের তলায় ভাবের ঢেউ। সে কোন কথা বলতে পারলে না।

কেশর তার এই স্বল্পপরিসর জীবনে অনেক রাজবাড়ি

দেখেছে। অনেক রাজা মহারাজা দেখেছে। অনেক রাজা তার কৃপাপ্রার্থী হয়ে তার নূপুর শিঞ্জিত পদতলে মুকুট খুলে রেখে তাদের ঐশ্বর্যরঞ্জিত প্রেম নিবেদন করেছে। তাকে কেউ মোহগ্রস্ত করতে পারেনি। তাকে ঐশ্বর্যের শিকল পরাতে পারেনি। প্রথম যৌবন তার চোখে সত্যের কাজল পরিয়ে দিয়েছিল। সে মিথ্যাকে সত্য বলে কোনদিন ভুল করেনি। রাজবেশ পরা কামনাকে সে প্রেমের মর্যাদা দেয়নি। নিজের দেহকে সে পণ্য করেনি। গানের মুজরো করতে গিয়ে অর্থের লোভে বা যৌবনের তাড়নায় কারুর নিভৃত বিলাস কক্ষে প্রবেশ করেনি। নিজের দেহ সম্বন্ধে সে চিরদিন সচেতন। দেহ দিয়ে কোন রাজাকে সে অভিনন্দন করেনি। হোক না সে কুবের কিংবা কন্দর্প। সে বাঈজী। সে আনুষঙ্গিক গীতি-সহায় বাদকদল সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্য আসরে নেমেছে। কোন নিভৃত আনন্দ মজলিসে যায়নি। অন্যান্য বাঈজীরা তাকে কটাক্ষ করেছে। বিদ্রূপ করেছে। শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে, সতী বাইজী। বাঈজীর খাতায় নাম লিখিয়ে সতীপনা চলেনা। দেখি কদ্দিন চলে? কেশর দিকপাত করেনি।

আসলে তার গানের নেশা অন্য নেশার সন্ধান দেয়নি। গানের রস অন্য রসের আস্বাদ দেয়নি।

নানী মুখে কিছু না বললেও মনে তার পরিতাপ ছিল। বিশেষ করে চম্পা তাকে হতাশ করেছিল। সৌন্দর্যময়ী নৃত্যগীত পটিয়সী চম্পা তার বিস্তীর্ণ উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে সঙ্কুচিত ও সীমিত করে এনেছিল সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে। রাজার ভোগকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়েছিল ভিখারী সন্ন্যাসীকে। নানীর আশা-আকাঙ্ক্ষায় ছাই দিয়েছিল।

নানীর মনে তাই কেশর সম্বন্ধে একটা শঙ্কা ছিল। কেশরের নির্লিপ্তি ও ঔদাসিন্য তাকে চমকে দিত। যৌবনের ভরা নদী অথচ এত শান্ত এত ধীর। এত অনুদ্ধত, এত অনুচ্চার। কেমন যেন

বিসদৃশ মনে হত। এত রূপ, এত স্বাস্থ্য তাতে নেই কোন উৎক্ষেপ উচাটন। তাতে নেই কোন কলরব কোলাহল। নানীর চোখে অস্বাভাবিক ঠেকত। নিজের যৌবনের রসোম্মত্ততার ইতিহাসের পাতা উলটে তার সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পেত না। সব চেয়ে ক্ষুব্ধ হত নানী যখন সে কঠোর হয়ে করতলগত সৌভাগ্যকে উপেক্ষা করত। প্রণয়প্রার্থী কুবের সম্প্রদায়কে উপহাসের হাসি ছুড়ে মারত। ঘাড় ঘুরিয়ে চোখে আগুন ছড়িয়ে বলতো, বাঈজী কসবী নয়।

নানী ভয় পেত। ভয় পেত তার মায়ের কথা মনে করে। কে জানে কবে কোন সুড়ঙ্গপথে কোন কন্দর্পের আবির্ভাব হবে!

তার মনের শঙ্কা রূপ পরিগ্রহ করল দেবশ্রীকে দেখে। কলকাতা থেকে ফেরবার পর থেকেই নানীর মন সংশয় বিচলিত হয়ে উঠেছিল। দেবশ্রী তার সংশয় নিরসন করল। তার কল্পিত শঙ্কাকে নিদারুণ আতঙ্কে শিলীভূত করে দিল। মুখে কিছু বলবার সাহস হল না কিন্তু অন্তরে প্রচণ্ড দাবানল জ্বলে উঠল। আর রক্ষা নেই। কেশরের চোখে সে কামনার স্ফুলিঙ্গ দেখেছে। তুরন্ত রক্তস্রোত দেহের কানায় কানায় কামনা-ফেনিল হয়ে উঠেছে। যে রক্তস্রোত শক্তিমান পুরুষের রক্তের তরঙ্গে মিশে তার সন্তানের জননী হতে চায়। আর কেশরকে আড়াল করে রাখা যাবে না। ঐ বাঙালী ছেলেটা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সেই হবে তার একান্ত আপন। তার জীবনের দোসর। নানী তার কেউ নয়।

নানীর তুচোখ জলে ভরে আসে।

দেবশ্রী চলে যাবার পর নানী যেন কেশরের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠল। তার প্রীতি-উচ্ছ্বাস অধৈর্য হয়ে উঠল। আদরে যত্নে, কৌতুকে কৈতবে তাকে আবৃত করে রাখে। কেশরের বিরহ-বেদনা-ঘন মনের আকাশের রঙ বদলে দিতে চায়। কেশর মনে মনে হাসে।

নানী কুটিল কৌতুকে চোখ উলটে তাকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে ছেলেটাকে তুইতো মন উজোর করে ভালোবাসলি, তা ওর মনের কথা কিছু জানিস না। নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে চোখের জল সার করবি?

কেশরের বুঝতে বাকি থাকে না যে নানী তার মনে শলা দিয়ে তার মনটা পরখ করে দেখতে চায়। দেবশ্রীকে যে সে স্নেহের চোখে দেখেনি এ-টুকু সে বোঝে। এই নিয়ে বিভার সঙ্গে যে সে কানাকানি করেছে তাও সে শুনতে পেয়েছে। বিভা তাকে গোপন করেনি। কেশর ঝলসে উঠল, কে তোমায় বললে আমি নিজেকে উজোর করে ওকে ভালবাসলুম—ওর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিলুম?—এতো সস্তা?

নানী বললে, সস্তা তো নওই ভাই। লক্ষ্ণৌ-এ তোমার জুড়ি নেই। যে-সে কি আর তোমার দিকে হাত বাড়াতে পারে?

—তা তো বটেই। নাতনি তোমার হূরী।

চিবুক ধরে কেশরের মুখখানি তুলে ধরে নানী বললে, কম কিসে? তোর জামালের রোশনীতে রাজমহল ঝলসে যায়। লোকে বলে, নওরাতির বাতি।

—কে বলে গো নানী? আমার কাছে তো কেউ বলে না। আমার ভারি শুনতে ইচ্ছে করে। অবিশ্যি পুরুষের মুখে।

নানী বলে, পুরুষের চোখেই তো মেয়েরা দামি—মেয়েদের রূপের কদর।

একটু থেমে হঠাৎ নানী ভ্রূ-ভঙ্গি করে প্রশ্ন করলে, কেন, দেবু বলে না?

—মোটেই না। তার চোখ আমার জামালের পানে নয়। আমার গাওনার দিকে। তার মহব্বৎ আমার গলার সুরের সঙ্গে। তার সঙ্গত আমার সুরের সাথি।

নানী ঠোঁট ফুলিয়ে চোখে বিদ্যুৎ হানে। কেশরের রূঢ়তাটা আবৃত হলেও নানীর চোখ জ্বালা করে উঠল।

কেশরের রাগ হয় নানীর উপর। রাগ হয় দেবশ্রীর প্রতি তার পরোক্ষ উপেক্ষায়। তার সংসারে দেবশ্রীকে যে কেউ অনাদর উপেক্ষা করবে এ সে সহ্য করতে পারে না।

রাজবাড়ি থেকে দেওয়ালি উৎসবে একটা মুজরোর বায়না এসেছে।

নানী এসে কেশরকে খবর দেয়।

কেশর দেবশ্রীকে চিঠি লিখছিল। মন তখন তার অন্যজগতে। সে মুখ না তুলেই উত্তর দিল, দেওয়ালিতে আমি মুজরো করবো না।

নানী থমকে গেল। সে কি? নতুন ঘর। জাহঙ্গীরাবাদ রাজবাড়ি—

—জাহাঙ্গীরাবাদ হোক আর জিঞ্জিরাবাদই হোক আমি দেওয়ালিতে বাড়ি ছেড়ে যাবো না।

নানী হেসে উঠল: জাহাঙ্গীরাবাদ, যেখানে তোর বাবা চাকরি করত।

কেশর মুখতুলে তাকাল। কী ভাবল কে জানে। বললে, ভবানী ওস্তাদকে খবর দাও। এসে ঠিক করুক। কে এসেছে?

—দেখবি আয় না। পুরোনো লোক। তোর বাবাকে জানতো। রাজার নায়েব।

—না। আমি আর গিয়ে কি করবো? ওস্তাদ সব ঠিক করবে'খন। তুমি ওস্তাদকে খবর দাও।

—একবার আয়না। ও আমাদের ঘরের লোক। তোর নানা হয়।

নানী চোখে ঝিলিক দিয়ে মধুর হাসি হাসল।

কেশর স্থির অবিচলিত দৃষ্টিতে তার পানে তাকাল। বুঝতে

দেরি হলনা যে যে-লোকটি রাজবাড়ি থেকে এসেছে তার সঙ্গে অতীতে নানীর রসের সম্বন্ধ ছিল। অতীতের সেই মধুময় স্মৃতি নানীকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। তার গা জ্বলে উঠল। নানীকে আঘাত করবার একটা প্রচণ্ড বাসনা তাকে পেয়ে বসল। সে কুটিল বিকৃত স্বরে বলে উঠল, অনেক কুকুর শেয়ালও তো আমার নানা। দেখবার কী আছে ?

—মরণ দশা। কথার ছিরি দেখো না—

কেশরকে গাল দিতে দিতে নানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেশরের উচ্চ হাসিতে ঘরখানা মুখর হয়ে উঠল।

রাজবাড়ি।

ললাটে রাজটিকা আছে বই কি !

রঙ-চটা হলেও পুরোনো রঙের ছোপ আছে তার আষ্টে-পৃষ্ঠে। মরা হাতি হলেও হাতি তো।

পায়ে শিকল বাঁধা থাকলেও গলায় ঘণ্টা আছে।

ঘণ্টার-ই তো যুগ। জীবনের সাফল্য তো ঘোষণা আর বিজ্ঞাপনে।

এ রাজবাড়ির ও পুরোনো চিলেকোঠায় নতুন ঘণ্টা ঝুলেছে। পুরোনো ঐতিহ্যের নীরবতাকে ঘোষণা মুখর করে তুলতে চায়। পুরোনো স্তব্ধতা ভেঙ্গে নতুনের আগমন বার্তা প্রচার করতে চায়।

পুরোনো গত হয়েছে। নতুন এসেছে পুরোনো সিংহাসনে। স্থবীর জরাজীর্ণ মান্ধাতা আমলের সিংহাসন নতুনের পাদস্পর্শে, নতুন পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

সিংহাসন ? হ্যাঁ সিংহাসন আছে বই কি ? সিংহাসন ছাড়া কি রাজবাড়ি হয় নাকি ? সিংহাসন আছে। মন্ত্রী আছে। সভাসদ আছে। বৈতালিক আছে। সভাগায়ক আছে। সভা কবি আছে। প্রহরী আছে। পাইক বরকন্দাজ আছে। গুঁপো গালপাট্টাওয়ালা অসুরের মত চোবে সান্ত্রী আছে। ফটকে

নহবৎখানায় রসুনচৌকি বাজে। হারেমে অন্তত চল্লিশটি সুন্দরী নারী আছে। রাজার বয়স যদিও চল্লিশের কোঠায় এখনো পৌঁছয় নেই। মুসলমান নবাব বাদশার প্রথা অনুকরণ করে হিন্দু রাজারাও রাজ অন্তঃপুরকে হারেম বলে।

রাজ্যাভিষেকের পর থেকেই রাজবাড়িতে উৎসব অনুষ্ঠানের ঢেউ বয়ে চলল। ভিতরের সংস্কার কার্য সুরু হলো। পুরোনো রাজসংসারের শিরায় শিরায় তরুণ তাজা রক্ত সঞ্চারিত হল।

তবে এ রক্ত পুরোনো রাজবংশের নয়। নতুন রক্ত এসে বংশের রক্তধারা বদলে দিল। রাজা মনোহরলাল এ বংশের দত্তক।

মনোহর লাল বয়সে তরুণ। প্রিয়দর্শন। আমোদপ্রিয়। এবং সৌখিন। রাজ্যাভিষেকের পর অগাধ ধনসম্পত্তির প্রভাবেই হোক অথবা বন্ধুবেশী দুশ্চরিত্র চাটুকারের প্রভাবেই হোক মনোহর লালের জীবনযাত্রার ধারা বদলে গেল। প্রাচীন রাজপ্রাসাদে মুঘল নবাব বাদশাদের মত নৃত্য, গীত ও প্রমোদ বিলাসের ঢেউ বয়ে গেল। পরিত্যক্ত, ধূলিমলিন নাচঘর আবার আলোকোজ্জ্বল ও উৎসবমুখর হয়ে উঠল। বাঈজীর পদাঘাতে আর সিরাজির তীব্র সৌরভে ঘরের বাতাস মদির হয়ে উঠল। রাজা মনোহরলাল উচ্ছৃঙ্খল ও প্রমত্ত হয়ে উঠল। নতুন নতুন নর্তকী গায়কগায়িকা ও বাদকদল সংগ্রহ হল। উৎসব অনুষ্ঠান চলল পুরোদমে। নতুন নতুন নারীদেহের জন্যও সঙ্গে সঙ্গে লোলুপতা বাড়ল।

দেওয়ালি উৎসবে কেশরের বায়না হলো। বিশেষ উৎসবে বিশেষ আয়োজন কাজেই কেশরের মত দামী ও খ্যাতিসম্পন্ন বাঈজীর ডাক পড়ল। তাছাড়া এটা ঠিক নিজেদের মাইফেল বা প্রমোদ বিলাস নয়। এটা পারিবারিক উৎসব। বহু আত্মীয় কুটুম্বের এবং বহু পুরনারীর এ উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়েছে। কিন্তু কেশরের গান ও তার অনুপম সৌন্দর্য মনোহরলালকে এমনি মুগ্ধ করল যে উৎসবান্তে রাজা সরাসরি কেশরের নিভৃত বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করল। কেশর সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। হাসিমুখে বললে, আমার একটা প্রার্থনা আছে রাজার কাছে। আমি ভাবছিলুম কেমন করে প্রার্থনাটা রাজসকাশে উপস্থিত করা যায়।

রাজা প্রশ্রয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসিমুখে বললে, তা হলে তোমার ডাকেই এখানে এসেছি বলো?

কেশর সহজ ও সরল সৌজন্যের হাসিতে মুখ ভরে বললে, তাই বলতে হবে।

—বলো বাঈজি তোমার কি প্রার্থনা? তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তোমার সঙ্গীতের সুরের ব্যঞ্জনায় আমি মুগ্ধ। আমি বিস্ময় বিমূঢ়।

কেশর বাঈজী সুলভ আনত কুর্নিশের ভঙ্গিতে অভিবাদন করে রাজার প্রশংসার স্বীকৃতি দিল। মুখ তুলে কেশর বললে, আপনার নাচঘরে আমার স্বর্গত পিতার যে তৈলচিত্র রয়েছে, সেই ছবি থেকে আমি একখানা ছবি আঁকিয়ে নিতে চাই। আমাকে ঐ ছবিখানা যদি কিছুদিনের জন্য—

—এই কথা? আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আজ থেকে একমাসের মধ্যে ঐ ছবি আঁকিয়ে তোমার বাড়িতে আমি পৌঁছে দোব। খুশি হবে তো?

মাথা নত করে কেশর বললে, আপনার বহুৎ মেহেরবান্।

রাজা ফুলদানের একটা গোলাপের পাপড়ির উপর আঙুলের স্পর্শ দিয়ে, ফুলটার পানে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে যেন ফুলটাকেই বললে, এইবার আমার ওপর তুমি একটু মেহেরবানী করো—

কেশর আড়চোখে রাজার মুখপানে মুহূর্ত চাইল। কী দেখল সেই জানে। সে সহজ শান্ত গলায় সজ্ঞিক্ষপ্ত উত্তর দিল, আপনাকে মেহেরবাণী করবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই।

—কেন ধৃষ্টতা কেন ? রাজোদ্যানে যে গোলাপ ফোটে, সে কি গোলাপের ধৃষ্টতা ?

—গোলাপের কথা গোলাপ জানে। আমি তো গোলাপ নই। আমি গায়িকা।

—তোমার মত গায়িকা আমার রাজদরবারের শোভা বাড়াবে। গৌরব বাড়াবে। আমি তোমাকে আমার নিজস্ব গায়িকা ও রাজনর্তকীর পদে অভিষিক্ত করতে চাই।

কেশর বাঁকা চোখের কোণ দিয়ে রাজার মুখপানে তাকাল। তার অধরে ফুটে উঠল শীর্ণ হাসির রেখা। সে গ্রীবা বেঁকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে বললে, আপনার প্রস্তাবের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু—

রাজা দাক্ষিণ্যে উদ্বেল হয়ে বললে, বলো, তোমার কী সর্ত ? রাজসরকার তোমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। তোমার বসবাসের জন্যে স্বতন্ত্র একটা মহল দেবে। দাস দাসী দেবে। তা ছাড়া মোটা অঙ্কের মাসিক বেতন দেবে! তুমি বলো কতো বেতন পেলে খুশি মনে কাজে যোগ দিতে পারবে ?

—আমি নোকরি করবো না রাজা সায়েব। আমার আজাদী খোয়াতে পারবো না।

রাজার মনে হলো বাঈজী তার মুখের উপর এক মুঠো ছাই ছুড়ে দিল। তার মুখখানা মুহূর্তে পাংশু হয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠল। সে কেশরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলে না।

কেশর সোফার পিঠে হেলান দিয়ে রাণীর মত আঁট হয়ে বসল। বিজয়িনী যেন দৃপ্ত ভঙ্গিতে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিল।

মনোহর লাল তার মহিমায় বিস্মিত হল। কেশর তাকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করল। সে মুখ তুলে কেশরের পানে চেয়ে হাসল। বশ্যতার হাসি। সম্মোহিতের হাসি। কণ্ঠে খুব খানিকটা মধু ঢেলে রাজা বললে, কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ এ রাজ্যের তোমার বাঈজীর ওপর একটা দাবি আছে।

—কী? আমার পিতার কথা বলবেন তো? আমার মনে হয় এ পুণ্যভূমিতে এলে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তাঁকে অসম্মান করা হবে।

হেসে উঠল মনোহর লাল ঃ আমার ধারণা তাঁকে সম্মানিত করা হবে এবং কোন দিক দিয়েই তোমার মনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে না বরং তোমার মর্যাদা বাড়বে।

—আপনি যেটাকে মর্যাদা ভাবছেন, আমার কাছে সেটা হয়তো মর্যাদা হানিকর। সে-টা হয়তো লজ্জাকর কুৎসিত বিলাস!

—কেন? কেন?

—আপনি বুঝতে পারবেন না কেন। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন যে আমার বাঈজী সত্তা ছাড়াও আর একটা দ্বিতীয় সত্তা আছে। বাঈজীর আচ্ছাদের অন্তরালে একজন নারী আছে যার সম্ভ্রমের সংজ্ঞা আলাদা। যার সম্ভ্রমের চেতনা অতি সূক্ষ্ম, অতি পবিত্র।

সশব্দে হেসে উঠল রাজা। ব্যঙ্গের হাসি। স্খলিত উপেক্ষার হাসি। বললে, তা হলে তো বাঈজীর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কাশীবাসী হতে হয়।

কেশর মুখ ঘুরিয়ে গলায় জোর দিয়ে বললে, প্রয়োজন বুঝলে নিশ্চিত তাই করতে হবে।

—সে বয়স হোক। জীবনটাকে ভোগ করবে না বাঈজি! যৌবনের বসন্তে আনবে শীতের বৈরাগ্য? দেহে যৌবনের কোটাল ডেকে যাচ্ছে আর তুমি কিনা—

কেশর অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে উঠে দাঁড়াল। অসহিষ্ণু বিদ্রূপের কণ্ঠে বললে, পাথরে কামড় দিয়ে কোন লাভ হবে না রাজা। দাঁত ভেঙ্গে যাবে।

—পাথর ফাটাবার মন্ত্র আমার জানা আছে। পাথর ফেটে জল বেরুবে।

মনোহর একমুঠো গিনী বের করে পকেট থেকে কেশরের সামনে টেবিলের উপর রাখল। হাসতে হাসতে বললে, রাতের আর ক-ঘণ্টাই বা বাকি! আরো চাও, আরো দোব। আলাপ করবে চলো আমার সঙ্গে। আমাকে খুশি করতে পারলে ঠকবে না। কেউ জানবে না। এ মহলে জনপ্রাণী নেই।

কেশর ভেতরে কাঁপছে কিন্তু বাইরেটা তার জমাট শক্ত হয়ে উঠেছে। সে নির্ভীক নিঃশঙ্ক কণ্ঠে বললে, তাই বুঝি এত সাহস?

—সাহস কেন হবেনা? আমি তো পরের জেনানাকে ঘর থেকে তুলে আনিনি। আমি কিস্মৎ দিয়ে এক গস্তানী বাঈজীর সঙ্গে একটু স্ফূর্তি করতে চাই। এর মধ্যে নতুনত্ব কি আছে? দুঃসাহসই বা কি আছে?

কেশর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আগুনের শিখার মত লেলিহান হয়ে উঠল। সে দাঁতে দাঁত চেপে তর্জন করে উঠল, গস্তানি বাঈজি! কিস্মৎ দিয়ে তাকে কিনতে চাও?

ক্ষিপ্তের মত কেশর মুঠো ভর্তি গিনীগুলো তুলে নিয়ে মনোহরের গায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও। বেয়াদপ! নইলে—

—নইলে?

আক্রমণের ভঙ্গিতে মনোহর তার দিকে এগিয়ে গেল হিংস্র বন্যজন্তুর মত।

কেশর দেয়ালের কাছে সভয়ে সরে গেল।

মনোহর তার সামনে গা-ঘেঁসে একেবারে বুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আগুনের হলকার মত কেশরের তপ্তশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল রাজার আনত মুখের উপর। আক্রমনোদ্যত রাজা স্তব্ধ হয়ে গেল তার ব্যথিত সুন্দর মুখের পানে চেয়ে। তার সন্নিকট সান্নিধ্য তার ক্রোধ কম্পিত বুকে কামনার আগুন ধরিয়ে দিল। সে নত হয়ে অধীর প্রেমিকের মত রুদ্ধশ্বাসে বললে, বেশ। একটা চুমু

দাও আমি চলে যাচ্ছি। ঐ ক্রোধ রক্তিম কম্পিত অধরের একটি চুমু।

কেশর বলে উঠল, পয়জার দেব মুখে।

—পয়জার মুখে নিয়ে আমার শয্যা-সঙ্গিনী হবে। এতো অহঙ্কার।

মনোহর দানবের মত কঠিন হাতের বজ্রমুষ্টি দিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধরল। কেশর বাঘিনীর মত তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে তার সেই হাতের উপর কামড় বসিয়ে দিল।

রাজা আর্তনাদ করে উঠল।

ক্ষিপ্র পায়ে সশব্দে দরজা খুলে ভবানী ওস্তাদ এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়াল। . কেশর তার পানে চেয়ে কেঁদে ফেলল।

লজ্জিত রাজা আহত হাতখানা চেপে ধরে সরে এল। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়িয়ে পড়ে জামাটা ভিজে লাল হয়ে উঠল।

* * *

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে নেমে, পরের দিন সকালে কেশর সরাসরি শহর কোতোয়ালিতে গিয়ে মনোহর লালের নামে শ্লীলতাহানির মামলা দায়ের করল। ভবানী ওস্তাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ সাক্ষ্য দিল।

শহরে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। কেশরের সাহসকে সকলে প্রশংসা না করে পারল না।

॥ তেরো ॥

রতনের জীবনযাত্রার ধারাটিকে ব্যবস্থিত, নিয়ন্ত্রিত ও রীতি-সঙ্গত করে তুলেছিল দিনেশ।

ধনী কালোয়ারের সন্তান দিনেশ তার অনিয়ন্ত্রিত জীবনের আত্যন্তিকতাকে বিধিবদ্ধ করে তুলেছিল। দিনেশ জাত স্পোর্টসম্যান। শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন তার রক্তে। কাজেই নিজের প্রণয়িণীকে নিয়মানুগ করে তুলতে তাকে বেগ পেতে হলো না। আসলে তাদের মিলনের মাঝে সততা ছিল। আন্তরিকতা ছিল। একটা সহজ ও সুস্থ জীবনের স্বাদ ছিল। দিনেশের সবল ও সতেজ পৌরুষ, তার সুকুমার স্বাস্থ্য ও তার ভব্যতা রতনকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করেছিল। রতনের জীবনের অপরিসীম ব্যর্থতা, তার অন্তরের শূন্যতা তার সৌন্দর্যের ব্যথিত কাতরতা দিনেশের তরুণ অন্তরে রেখাপাত করেছিল। তাদের এই অবিহিত শারীরিক মিলনের নেপথ্যে অনুরাগের রঙিমা ছিল। দুটি হৃদয়ের অদৃশ্য যোগাযোগ ঘটেছিল।

দিনেশ আনন্দ পিয়াসী, আরাম বিলাসী সংস্কার-মুক্ত তরুণ! জীবনে চায় একটু বিরতি। একটু সংঘাত। নতুনতরো একটু উত্তেজনা। নতুনতরো রোমাঞ্চ। তারই লোভে সে নারী-সঙ্গ করতে চায়। নারীর নিভৃত নিলয়ে পদার্পণ করে তার গোপন মনের আকুতি শুনতে চায়। গুণ্ঠন মোচন করে কামনাময় জীবনের রহস্য আবিষ্কার করতে চায়। সম্ভোগের রূপ দেখতে চায়। সে চোখ দিয়ে দেখতে চায়, চেতনা দিয়ে অনুভব করতে চায়। স্পর্শ দিয়ে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল রচনা করতে চায়। এ কৌতূহল পুরুষের চিরন্তন। প্রথম যৌবনের আদি পিপাসা।

দিনেশও তেমনি দুর্নিবার পিপাসা নিয়ে দেহে কামনার দীপ জ্বেলে রতনের অন্ধকার গহনে প্রথম পদক্ষেপ করেছিল। তারপর রতনকে তার চোখে ভাল লাগল কি মনে ভাল লাগল কিংবা চোখে মনে দুই ভালো লাগল সেই জানে। তবে তার কাছে সে আসা-যাওয়া বন্ধ করল না। দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। অন্তরঙ্গতা বাড়ল। অস্থায়ী অবসর যাপনের একটা আশ্রয় গজালো। দুজনের মাঝে আদিম নারীপুরুষের সম্পর্ক জেগে উঠল। পবিত্র হোক, অপবিত্র হোক, নৈসর্গিক কিংবা অনৈসর্গিক হোক একটা সম্বন্ধ বই-কি!

রক্ষিতা কিংবা প্রণয়িনী।

এরি মাঝে পিপাসা-পীড়িত রতনের তৃষ্ণা মিটেছে। জীবনে পেয়েছে একটা পূর্ণতার স্বাদ। বিনিদ্র রাত্রির আকুলতা অধীরতার হয়েছে অবসান। সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে দিনেশের মাঝে। বহু পুরুষ-লাঞ্ছিত তার দেহ। তবু তার মনে হয় এই দিনেশই তার জীবনের পুরুষ। এই তার জীবনের প্রথম প্রেম। সে কেশরকে পরিতাপ করে বলেছিল, জীবনে এমন কোন পুরুষ দেখলুম না যে আমার মহব্বৎ কেড়ে নিতে পারলে। অবশেষে এতদিনে সে তার দেখা পেয়েছে। তার সঙ্গে মিলন ঘটেছে। দিনেশ তার জীবনের সেই পুরুষ যে তার জীবন আঙিনায় পদপাত করেই তার সব অহঙ্কার সকল দর্প ভেঙে চুরমার করে দিল। যে তার সর্বস্ব জয় করে নিয়ে তার জীবনের প্রভু হয়ে উঠল।

সেও নির্বিচারে তাকে সর্বসমর্পণ করে চোখ বুজল। তার মাঝের চিরন্তন নারী আত্মসমর্পণ করবার জন্যেই উদগ্রীব হয়ে এতোদিন প্রতীক্ষা করছিল। আত্মসমর্পণে যে এতো প্রশান্তি সে এই প্রথম অনুভব করল।

প্রত্যহ দিনেশ আসে না। নাই আসুক। তার জন্য প্রতীক্ষার আলো জ্বেলে বাতায়নে বসে থাকার মাঝেও একটা অনির্বচনীয় আনন্দ আছে। সে রতনের মাঝে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

সে অনেক শান্ত আর সহনশীল হয়ে উঠেছে। নিস্তরঙ্গ ভরা নদীর মত তৃপ্তিতে সে টলটল করছে। তার মাঝে আর উৎক্ষেপ নেই। উৎঘাট নেই। একটা নিশ্চিন্ততার গভীরে সে ডুব দিয়েছে।

পরমানন্দে পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে দিয়েই তাদের দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন খবর এলো গোয়ালিয়রে তার মা-র মৃত্যু হয়েছে এবং তাকে সেখানে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে তার স্বামী শোহনলাল।

রতন বুঝতে পারল না, কী করবে। কী করা উচিত।

দিনেশের সঙ্গে পরামর্শ করল।

দিনেশ জানত তার মায়ের কথা। শুনেছিল তার স্বামীর কথা। তার কাছে রতনের কোন গোপনতা ছিল না।

দিনেশ শুনেছিল, তার মায়ের অনেক সম্পত্তি। অনেক হীরে জহরৎ। উপদেশ দিল, যাওয়া উচিত সম্পত্তির ব্যবস্থা করবার জন্য। কারণ আইনত রতনই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী।

রতন বললে, আমি যেতে পারি, তুমি যদি সঙ্গে যাও।

দিনেশ হেসে উঠল : পাগল! আমি যাবো কেমন করে? আর আমি তো তোমাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে পারবো না। আমি গেলে তোমার ক্ষতি হবে।

রতন কি বুঝল কে জানে। সে ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদু হাসল।

মহম্মদকে যেতে হলো না পর্বতের কাছে পর্বতই একদিন এলো মহম্মদ সকাশে।

এক সুন্দর প্রভাতে শোহনলাল রতনের বাড়ি এসে হাজির হল।

রতন অবাক। তার চেহারা দেখে আর তার ধৃষ্টতা দেখে।

রতনের মনে হলো যে, যে-স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের জলুষ দেখে তার মা অবলীলায় সম্পর্কের পবিত্র বেড়া ভেঙ্গে তার দিকে ছুটে গিয়েছিল তার সবটুকুই সে সঙ্গে নিয়ে গেছে। অপরিমিত হলাহল

পান করে এ নিঃশেষে নিরগ্নি ও জরদগব হয়ে গেছে। চণ্ডুপায়ী চীনাদের মত প্রেতায়িত মুখের চেহারা। ঘুণ-ধরা বাঁশের মত হাড্ডি-সার দেহ। তার মনে করতে গা ঘিন ঘিন করে যে অতীতে এই লোকটা ছিল তার স্বামী, তার সন্তানের পিতা।

কিন্তু এ বলে কি ?

এ-যে এই এক যুগ পরে আবার তার উপর স্বামীত্বের দাবি করতে এসেছে। নতুন করে তার মায়ের উইলের শক্তিতে বলবৎ হয়ে সে তার স্বত্ব সীমায় ফিরে আসতে চায়। তার অতীতের স্ত্রীকে মৃত অন্ধকারের অতল গুহা থেকে উদ্ধার করে নিজের অধিকারের আয়ত্বে নিয়ে যেতে চায়।

এই নাকি তার মায়ের শেষ ইচ্ছা। শেষ ফয়সালা। উইলের মারফতে নিবেদন করে গেছে সেই ইচ্ছা।

উইলে সমুদায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি একমাত্র কন্যা রতনবাঈকে দিয়ে গেছে। সঙ্গে সর্ত সংযোজন করে দিয়েছে যদি সে গোয়ালিয়রে তার স্বামী শোহনলালের সঙ্গে অবিরোধ দাম্পত্য জীবন যাপন করে। নতুবা সমস্ত সম্পত্তি তার দৌহিত্র প্রভুদয়াল পাবে। প্রভুদয়াল রতন ও শোহনলালের নাবালক পুত্র। উইলের একজিউটর ও নাবালকের পক্ষে গার্জেন শোহনলাল।

রতন মুখে কিছু বলল না। মনে মনে মায়ের মুণ্ডপাত করল।

শোহনলাল বলে, আমার কি অপরাধ বলো। আমাকে সারা-জীবন মাথা তুলতে দেয়নি। লোহার সিন্দুকের মত বুকের ওপর চেপে বসেছিল। আমি কি করতে পারি ? আমাকে তার দাসত্ব করতে হয়েছে। জহর খেতে খেতে বেহুঁস হয়ে গেছি তবু সে বাঘিণীর মত আমার রক্ত চুষে খেয়েছে। আমাকে মুর্দা বানিয়ে দিয়েছে।

রতন ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

শোহন বলে, তুমি চলো। তোমার সম্পত্তি তুমি বুঝে নেবে। আর মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা করবে।

রতন মুখ বিকৃত করে উত্তর দেয়, শ্রাদ্ধ তার তুমি করলেই সে শান্তি পাবে। তুমি করগে। আমি যাবোনা।

শোহন বলে, বেশ, প্রভু করবে। প্রভুকে আসতে বলো গোয়ালিয়রে। তুমি একখানা চিঠি লিখে দাও।

—না। তোমার সঙ্গে সে যাবে না। —আমিও যাবো না।

—কেন ? আমার জন্যে ?

—হ্যাঁ। তোমার বউ সেজে আমি যাবো না। সে পরিচয়ের বিষবাষ্প আমি সহ্য করতে পারবো না।

—তোমার সম্পত্তি তুমি বুঝে নেবেনা ?

—যে সর্তে মা আমাকে সম্পত্তি দিতে চেয়েছে সে সর্ত আমি মানবো না।

শোহনলাল শূন্য নিস্প্রাণ দৃষ্টিতে রতনের মুখের পানে চায়। যে রতনকে সে চিনতো এ সে রতন নয়। দীর্ঘদিনের ব্যবধান সে রতনকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়েছে। সে রতনের কোন চিহ্ন নেই এর মাঝে। এর মাঝে এতোটুকু কুয়াশা নেই। এর মনের আকাশ উজ্জ্বল উলঙ্গ। রৌদ্রদাহে আগ্নেয়। দেহ যেন লাবণ্যে-লালিত্যে বন্য। হাসি যেন সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ। চোখের দৃষ্টিতে বিদ্রোহ। হিংস্রতায় জ্বল জ্বল করছে।

শোহন তার মুখের উপর চোখ রাখতে পারে না। তার উপস্থিতির নিবিড়তায় সে ঘেমে ওঠে।

কি ভেবে সে বলে, উইলের সর্ত তোমাকে মানতে হবে না। আমার পরিচয়ে ও তোমাকে সেখানে যেতে হবে না। তুমি নিজের পরিচয়ে সেখানে যাও। আমি সেখানে থাকবো না। সেখানে যাবো না। তোমার ইচ্ছামত তুমি তোমার মায়ের কাজকর্ম করে এসো। তারপর সেখানে থাকতে ইচ্ছা হয় থাকবে, না হয় চলে আসবে। আমার দিক থেকে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না।

—তোমার বাধাকেও আমি গ্রাহ্য করি না, মায়ের সম্পত্তির জন্যও আমি লোলুপ নই। তোমাদের সংসর্গ সংস্পর্শকে আমি ঘৃণা করি।

—আমি তোমার ঘৃণা ছাড়া প্রীতি কামনা করতে পারি না। তোমার পরলোকগত মায়ের—

রতন মাঝপথে ঝলসে ওঠে, ও মায়ের মেয়ে হওয়া আমার পক্ষে গৌরবের নয় যেমন তোমার ছেলে হওয়া প্রভুর পক্ষে মোটেই গৌরবের নয়।

শোহন নিষ্প্রাণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তার পানে চেয়ে থাকে। কোন অপমানই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অথচ রতন তাকে অপমানে বিধ্বস্ত করে এখান থেকে তাড়াতে চায়।

শোহন কিন্তু অনড় নিরেট পথেরের মত মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল। সে যেন কী একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছে। তার অনমনীয় কাঠিন্য রতনকে শঙ্কিত করে তোলে! তার মনে হয় কী যেন একটা কু-মতলব নিয়ে সে এখানে এসেছে। তাকে দিয়ে সে নিজের কোন কাজ বাগিয়ে নিতে চায়।

দিনেশের সঙ্গে সে পরামর্শ করে।

দিনেশ বেচারী যে কী বলবে বুঝতে পারে না। শোহনের মনের কথা সে জানবে কেমন করে? বুঝবে কেমন করে?

শোহন যেচে দিনেশের সঙ্গে আলাপ করে। বলে, ও-কে বুঝিয়ে বলুন, দিনেশবাবু সেখানে গিয়ে মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি করে আসুক। সারা জীবন আমার গলায় পাথর হয়ে ঝুলেছে। তার প্রেতাত্মার মুক্তি না হলে সে আমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমাকে বাঁচতে দেবে না। আমি সেই ভয়েই পালিয়ে এসেছি। আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না। দুঃস্বপ্নের মতো সে আমাকে ঘিরে থাকে। যক্ষের মতো সারাজীবন আমাকে পাহারা দিয়েছে এখনো সে তক্ষকের মত সর্বক্ষণ আমার দিকে চেয়ে

আছে। এখনো সে আমাকে আশ্রয় করে আছে। আমাকে ছেড়ে যায়নি।

রতন ভুরু কুঁচকে মুখ বেকিয়ে বলে, তুমিও তার সঙ্গে গেলেই পারতে। যাওয়াই তো উচিত ছিল।

—উচিত ছিল। সে থাকতে আমি তো সজ্ঞানে বেঁচে ছিলুম না। সার্কাসের বাঘের মত সে আমায় আফিং খাইয়ে চোখের চাবুক মেরে খেলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। যাত্নর মতো আমাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিয়েছে। আমাকে তো সে মানুষ ভাবতো না। যন্ত্র ভাবতো। তার মৃত্যুর পর আবার সুস্থ, সহজ জীবনের আশ্বাস পেয়েছিলুম। কিন্তু সে আমাকে ছাড়ছে না। মরেও সে আমাকে রেহাই দিল না।

—জাহান্নমে গিয়েও সে তোমাকে ভুলতে পারবে না।

রতন কুটিল চোখে তার পানে কটাক্ষ হানল। দিনেশের মনে করুণা জাগল।

শোহন বললে, আমি আর গোয়ালিয়রের অভিশপ্ত মাটিতে পা দিতে চাই না। তুমি দিনেশবাবুর সামনে সব বুঝে নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। লোহার সিন্দুকের কুঞ্চি আমার স্যুটকেশে আছে আর আছে তোমার মা-র জেবর-জহরতের লিস্‌টি।

দিনেশ হাতজোড় করে বলে ওঠে—দোহাই অপনার, আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না। আপনাদের ব্যাপার আপনারা বোঝাপড়া করুন।

শোহন মৃত্নু হেসে বলে, কেন, ভয় কিসের? এত বড়ো শক্তিমান পুরুষ? লজ্জা কিসের? যান না, গোয়ালিয়র বেড়িয়ে আসুন না দিন কতক। দেখেছেন গোয়ালিয়রের কেল্লা? উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় বিরাট কেল্লা। মহারাজা মানসিংহের আমলের কেল্লা। হিন্দু গৌরবের কত কাহিনী কত ইতিহাস ঐ কেল্লার পাথরে পাথরে। দেখে আসুন গোয়ালিয়র দেখবার মতো জায়গা।

গোয়ালিয়র সঙ্গীত সাধনার পীঠস্থান। ভক্তদের মহাতীর্থ। তানসেনের সমাধি মন্দির গোয়ালিয়রে। দেখে আসুন গোয়ালিয়র। তাজ্জব শহর। আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে।

শোহন অনর্গল হয়ে ওঠে গোয়ালিয়রের প্রশংসার। গাইড-রা যেমন দ্রষ্টব্যের ইতিহাস মুখস্থ বলে যায় দর্শকদের কাছে তেমনি গড়-গড় করে শোহন গোয়ালিয়রের প্রতিটি দ্রষ্টব্যের বিশদ তালিকা ও বিবরণী দেয়।

দিনেশের বুঝতে বাকি থাকে না যে লোকটার গোয়ালিয়রের প্রতি অগাধ মমতা। আন্তরিক শ্রদ্ধা। অথচ সেই গোয়ালিয়র তার জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। ফুলবাগানে দূষিত বিষবাষ্পের মত রতনের মা—কোহিনুর বাঈজী তার সঙ্গে গোয়ালিয়রকে পর্যন্ত কলুষিত করে দিয়েছে। এর মাঝের রসপিপাসু মানুষটির অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। ওর মনকে বিকল করে দিয়েছে। দিনেশের মনে হয় এ একটা মানসিক ব্যাধি। একটা তীব্র বিষের প্রক্রিয়া।

রতন একান্তে দিনেশকে জিজ্ঞেস করলে, কী করি বলোতো? আমি ওকে বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস না করবার তো কোন কারণ নেই। ও তো উইলের শক্তিতে তোমার ওপর কোন দাবি-দাওয়া করছে না। বরং নিজের সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করতে চাইছে।

—আমার ওপর আবার দাবি-দাওয়া করবে কোন লজ্জায়?

মুখ বেঁকিয়ে হাসল রতন।

—তবে? ও যখন স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে চাইছে, তখন একবার গিয়ে সব বুঝেপড়ে নেওয়াই তো ভাল। এতো সম্পত্তি, গয়নাগাটি—

রতন অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়ে বললে, তুমি চলো না আমার সঙ্গে—দেখেশুনে বুঝেপড়ে নেবে?

—আমি? ওরে বাসরে! পাগল হয়েছো তুমি? লোকে বলবে কি?

—লোকলজ্জার ভয়ে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে না?

রতনের গলার স্বর অভিমানে ভারি হয়ে এলো। চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল।

দিনেশ হেসে উঠল: বিপদটা এর মধ্যে এলো কোথা থেকে? এ-তো একটা শুভ সংবাদ। এতো সম্পত্তির মালিক হলে। এখন আর তোমাকে পায় কে? আমাদের একদিন একটা পার্টি দিও ভালো করে।

রতন তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললে, ঢং! আমি ও-সব শুনতে চাই না। তোমাকে যেতেই হবে। তুমি না দেখলে আমাকে দেখবে কে? কে আমার আছে?

—কেন, তোমার পতি পরম গুরু—

—মারো মুখে ঝাড়ু!

দিনেশ সশব্দে হেসে উঠল।

শোহনলালকে রাত্রে বাড়িতে ঠাঁই দেবার বাসনা মোটেই ছিল না রতনের।

কিন্তু বিধি বাম। সন্ধার দিকে আকাশ কালো করে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল অবিশ্রান্ত ধারে।

বৃষ্টি-বাদলে তো লোকটাকে শেয়াল কুকুরের মত পথে বের করে দেওয়া যায় না।

শোহনলালেরও যাবার কোন ইচ্ছা দেখা গেল না! তার নিয়তি যেন পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে।

বাড়িতে রতন একা। ঝি-চাকর নিয়ে সে একাই বাড়িতে থাকে।

দিনেশ দৈবাৎ কখনো-সখনো এখানে রাত্রি যাপন করে।

রেওয়াজ ঘরের পাশে একখানা ছোট কুঠরিতে রতন শোহন-লালের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

রতনের শোবার ঘরটা ভেতর দিকে। চাকর থাকে নিচে একতলায়।

শোহন রতনকে গোয়ালিয়রে তার মায়ের ঘরের ও লোহার সিন্ধুকের চাবি দিয়ে দিয়েছে। আর তার গোয়ালিয়র যাবার পথ খরচের জন্য পাঁচশো টাকা দিয়েছে। সে গেয়ালিয়রে যাবে না প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সে কোথায় যাবে, কি করবে রতন তাকে জিজ্ঞেস করেনি। বৃষ্টি না নামলে সে রাত্রেই এখান থেকে চলে যেত। দিনেশের কাছে সেইরকমই আভাস দিয়েছিল।

রাত্রি ঘন হয়ে উঠেছে।

চারিদিক স্তব্ধ হয়ে অসেছে। বাইরে ঝিম-ঝিম বৃষ্টির শব্দ। আর ছাদ থেকে জল গড়িয়ে পড়ার ছড়ছড় শব্দ। ঘরের মাঝের ঘনায়মান অন্ধকারে একখানা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে নিঝুম বসে রতন ভাবনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। বিছানার বাজুতে একটা নীল বেড ল্যাম্প মিট মিট করে জ্বলছে। তার বসবার ভঙ্গিটি যেন একটি বিষাদ-সিক্ত করুণ সুরের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সে যেন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। তবু ঘুমজড়ানো ক্লিষ্ট চোখে সে তার অতীতের স্মরণিকার পৃষ্ঠা উলটে যাচ্ছে। কী কদর্য, কুৎসিত আর ক্লেদাক্ত অনুস্মৃতিতে ভরা সে পৃষ্ঠাগুলো। শুধু কুৎসিত আর কদর্য নয়। অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক আর মনুষ্যত্ব-বর্জিত নির্লজ্জ নগ্নতা। মা আর শোহনলাল। প্রেতায়িত বিভীষিকার মত তার চেতনার স্তব্ধতায় কোলাহল করে ঘোরাঘুরি করছে। যার জঠরে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর অনন্ত সৌন্দর্য দেখল সেই মাকে যৌবনের পর থেকে সে ভালোবাসতে পারল না।

পারল না শ্রদ্ধা দিতে। অপরিসীম ঘৃণায় তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে হল। আর শোহনলালকে সে কোনদিন ভালোবেসেছিল কিনা মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, স্পষ্ট মনে পড়ে বই কি, তারই আলিঙ্গনের উত্তাপে তার কৌমার্যের তুষার গলেছিল। পুরুষ স্পর্শের প্রথম রোমাঞ্চ জেগেছিল তার অনাহত তনুদেহে। অধরে অধর মিলিয়ে তার কৌমার্য কোরককে উন্মিলিত করেছিল তার জীবনের প্রথম পুরুষ, ঐ শোহনলাল। সেই শোহনলালের সন্তানকে সে গর্ভে ধারণ করে নারীত্বের উপলব্ধিতে সে দুরন্ত হয়ে উঠল। কবে, কেমন করে শোহনলালকে তার মা আয়ত্ত করল সে জানে না। তবে তার গর্ভসঞ্চার হবার পরই গোপন কলঙ্কটা অনাবৃত হয়ে পড়ল এবং তার মায়ের মত্ততা এমনি স্থূলভাবে প্রকট হয়ে উঠল যে লজ্জায় সে মরমে মরে গেল।

শোহনলাল তখন মাত্র একুশ বাইশ বছরের অব্যবস্থিত চিত্ত প্রগলভ বালক। শোহনলালকে তার সাপিনী মা গ্রাস করে বসল।

জীবনের দুটি পরম আত্মীয় অদৃষ্ট দোষে তার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। পথের দিশারী তাকে পথভ্রষ্ট করল। তার মুখ থেকে সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে তাকে হলাহল পান করাল।

এতোদিন যাদের সে ঘৃণা আবর্জনার মত স্তূপীভূত করে রেখেছিল মনের অন্ধকার কোণে তারা আজ দীর্ঘদিন পরে হাত ধরাধরি করে আবার আলোর আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন সদ্য মৃত্যুলোক থেকে নেমে এসেছে। আরেকজন জলজ্যান্ত পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে তার লটবহর কাঁধে নিয়ে তার অন্তিম আদেশ পালন করতে এসেছে। দুজনের কেউই তাকে ভোলেনি। তার ঋণ পরিশোধ করতে এসেছে। ঋণ পরিশোধ না করে উপায় কি? মুক্তি পাবে কেমন করে?...

ও কি ? কিসের শব্দ ?

কুণ্ডলী পাকানো ঘুমন্ত সাপের মত চমকে সোজা হয়ে উঠে বসল রতন। কাণ খাড়া করে স্তব্ধতার অতল থেকে শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ করল।

বাইরে থেকে ভেসে আসছে একটা চাপা গোঙানীর শব্দ। কে যেন কার গলা চেপে ধরেছে।

রতন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভেজানো দরজাটা খুলে ক্ষিপ্রপায়ে বারান্দা পেরিয়ে সে রেওয়াজ ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

পেছনের ছোট কুঠরি থেকে অন্ধকার মথিত রেওয়াজ ঘরে অস্পষ্ট একটু আলোর আভা এসে পড়েছে। সেই ঘোলাটে অন্ধকারে রতন দেখলে ভূতগ্রস্তের মত শোহন ঘরের মেঝেয় পায়চারি করছে আর বিড়বিড় করে কি বকছে। কী যে বলছে বোঝা গেল না।

রতন ভয়ে ও বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তার দিকে চেয়ে রইল। লম্বা লম্বা সোজা পা ফেলে সে চলাফেরা করছে যেন দম-দেওয়া অতিকায় পুতুলের মত। যেন কাঠের পা। পায়ের কব্জা নেই। হাত দুটোও দুপাশে লটপট করছে। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর। মুখ দেখা যায় না। শোহন বটে তো না কোন ভয়াবহ প্রেতমূর্তি নিশীথ রাতের অন্ধকার থেকে উঠে এল ?

রতন আতঙ্কে নির্জীব হয়ে গেল। তার মুখে কথা ফুটল না।

হঠাৎ মধ্যরাত্রির নিঃশব্দতা ঘুলিয়ে শোহন চিৎকার করে উঠল, আবার এসেছো ? না। না। আমি যাবোনা। তোমার কাছে আমি যাবোনা।

মেঝের উপর ধপ করে সে বসে পড়ল। মুখ দিয়ে নির্গত হল একটা দুঃসহ কাতরতার শব্দ। কেউ যেন তার বুকের উপর চেপে বসেছে।

রতন হোঁচট খেতে লাগল তার যন্ত্রণার শব্দে। তার ভয় হল লোকটা দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। সে শক্তি সংহত করে ঘরের ভিতর ঢুকে আলো জ্বেলে দিল। আলোর তীক্ষ্ণ অট্টহাসির তোড়ে আতঙ্কিত অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রতন নত হয়ে তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, কী হয়েছে? এখানে কেন?

শোহন ঘোলাটে চোখে রতনের মুখের পানে চেয়ে বলে উঠল, তুমি কে? তুমি এখানে কেন?

শোহনের পানে চেয়ে, তার মুখ চোখের চেহারা দেখে রতন ভয়ে শিউরে উঠল। সে যেন তার অস্তিত্ব থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। সে যেন মানুষের মুখ নয়। তার ত্রাসিত মুখে মৃত্যুর থাবা। তার জীবন্ত দেহটাকে যেন এক নরখাদক বাঘিনী মুখে করে বহন করে নিয়ে চলেছে। জীবিতের পৃথিবী থেকে মৃত্যুর পৃথিবীতে। রতন ভয়ার্ত কম্পিত কণ্ঠে বললে, যাও। ঘরে গিয়ে শোও।

শোহন শুনতে পেলে কিনা কে জানে। সে আপন মনে বিড়-বিড় করে বললে, চলো যাচ্ছি। হাত ছেড়ে দাও।

আচম্বিতে শোহন প্রসারিত দীর্ঘতায় উঠে দাঁড়াল। তারপর এ-দিক ও-দিক চেয়ে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল: না। না। আমি যাবো না।

রতন ও সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। কিন্তু সে বারান্দায় পা দিতেই শোহন বারান্দা টপকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রতন দুহাতে শক্ত করে বারান্দার রেলিং চেপে ধরে নিচের পানে চেয়ে পাথর হয়ে গেল।

পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শোহনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তার মৃতদেহ পাঠিয়ে দিল মর্গে। এবং সরজমিনে তদারক করে রতনকে

নিয়ে গেল থানায় জবানবন্দী নেবার জন্য। কিন্তু জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হলে ডেপুটি কমিশনার তাকে অ্যারেষ্ট করবার আদেশ দিলেন। ন্যায়সঙ্গত সন্দেহের বশবর্তী হয়ে। সন্দেহ রতন শোহনলালকে বারান্দা থেকে ফেলে দিয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়েছে। ঘটনা তার প্রতিকূল।

রতন হাজতে গেল।

॥ চোদ্দ ॥

রোগের জীবাণুর মত দুঃসংবাদ হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। লক্ষ্ণৌ শহরে এবং আশে পাশে একটা রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে রাজা মনোহরলালের বিরুদ্ধে কেশর বাঈজীর মামলা। সকলের মুখে কেশর বাঈজীর নাম। কেশর সম্বন্ধে সকলের অশেষ কৌতূহল। তার দুর্জ্ঞেয় চরিত্র সম্বন্ধে অভিনিবেশ আলোচনা। কে বলতে পারে, দৈত্যকুলে যদি প্রহ্লাদের জন্ম হয়, বাঈজীকুলে সতী মেয়েরি বা জন্ম হবে না কেন। স্ত্রীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়। দুর্বোধ। শাস্ত্রের কথা। কেশরের বংশপরিচয় আর কারুর অজ্ঞাত নয়। মাতৃকুল বাঈজী হলেও তার পিতা ছিল পরম সাধক। নিষ্ঠাবান বাঙালী ব্রাহ্মণ। ঐ রাজবাড়ির ছিল সভাগায়ক। কেশর যাই হোক, দুঃশ্চরিত্র মনোহরলাল কোন অধিকারে তার উপর পৈশাচিক বলপ্রয়োগ করে? ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে নারীর মর্যাদাহানি করে কোন সাহসে?

মনোহরলালের কুৎসায় লক্ষ্ণৌ ভরে গেল।

কেশরকে যারা জানে, চেনে তারা সকলেই তাকে ভালোবাসে। তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ভবানী তাকে বোনের মত স্নেহ করে। কন্যার মত ভালবাসে।

এই ভবানী ওস্তাদই রাজা মনোহর লালের মৃত্যু-বান। সে প্রত্যক্ষদর্শী। তার সততা বা কেশরের প্রতি তার স্নেহানুগত্যকে অর্থ দিয়ে কেনা যাবে না।

রাজা মনোহরলাল মুষড়ে গেছে। এমন যে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটবে একটা বাঈজীকে নিয়ে সে কল্পনা করতেও পারেনি। বাঈজী তাকে অপমানে বিধ্বস্ত করে, দেহ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে

আবার যে থানায় গিয়ে তার নামে নালিশ করবে এ ধারণা সে করবে কেমন করে ?

বাঈজীর দুঃসাহসিকতায় সে চমকে গেছে। বাঈজী তাকে তীব্র কশাঘাত করেছে। তার মজলিসী মেজাজের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছে। মেয়েমানুষের মৌতাত ছুটিয়ে দিয়েছে। পুলিশ তাকে রীতিমত শাসিয়ে গেছে। বাঈজীকে শান্ত করে তার সঙ্গে আপোষ করে না নিলে তাদের চার্জ-সিট দিতে হবে। সাক্ষীপ্রমান প্রচুর আছে। পুলিশের সাহেব খাঁটি ইংরেজ। অত্যন্ত কড়া মেজাজ। রাজা বলে খাতির করবে না। দয়ামায়া করবে না।

রাজবাড়িতে একটা বিষাদের কালো ছায়া নেমে এসেছে। উৎসব আনন্দের বাতি নিভে গেছে। নাচ ঘরের দোর বন্ধ হয়ে গেছে।

রাজা সর্বরকম আনন্দের আসর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে।

লোকের পর লোক এসেছে রাজবাড়ি থেকে কেশরের কাছে। ভবানী ওস্তাদের কাছে। হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। অর্থের দ্বারা ক্ষতিপূরণ করবার লোভ দেখিয়ে কোন ফল হয় নি।

নানীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেউ না জানলেও নানী জানে এর মাঝে তার কিছুটা হাত ছিল। কেশরের মন থেকে দেবশ্রীর প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যই সে কেশরকে রাজার নিজস্ব গায়িক্য রূপে রাজবাড়িতে বন্দিনী করে রাখতে চেয়েছিল। লুব্ধ রাজা নানীর সেই প্রস্তাবে আশান্বিত হয়েই এতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল।

নানী চমকে গেছে কেশরের জিগির দেখে। কেশরের কঠোরতা দেখে। লৌহবর্মের মত একটা দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য যেন কেশরকে ঘিরে আছে। সে দুর্গম। দুষ্প্রবেশ। ভবানী ওস্তাদ আর বিভা ছাড়া কারুর সঙ্গে সে মোকর্দমার কথা আলোচনা করে না। কেউ

তাকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করে না। তার ব্যারিষ্টার আছে উকিল আছে। তদ্বির করতে ভবাণী আছে। আর কেউ মাথা গলাতে সাহস করে না।

নানী ভাবতে পারেনি যে এই সামান্য ব্যাপারটা এমনি বিশ্রী ও গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। নানীর চোখে এ সামান্য ব্যাপার বই কি। বাঈজীর জীবনে এ তো দৈনন্দিন ঘটনা। এর মাঝে অভিনবত্ব কোথা? সাধারণ বাঈজী এ ধরণের ঘটনাকে সৌভাগ্য সূচনা বলে গণ্য করত। কৃতার্থ হয়ে এক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা আঁচলে বেঁধে ঘরে ফিরে আসত।

নানী শুধু চমকে যায়নি। রীতিমত অপদস্থ হয়েছে রাজ-অনুচরদের কাছে। বিশেষ করে তার ভূতপূর্ব প্রেমিকের কাছে। নানীর সুপারিশ ও সনির্বন্ধ অনুরোধেই রাজা মনোহর লাল তার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিল।

নানী কেশরের অভিভাবিকা। কেশর নানীর হাতে-গড়া পুতুল। নানী যেমন নাচাবে তেমনি নাচবে সে, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই রাজা তাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছিল। দৈবাৎ ঘটনাচক্র ব্যাপারটাকে ঘোরালো ও জটিল করে তুলল। রাজা নিজেকে হারিয়ে ফেলল। একটা কলঙ্কিত অঘটন ঘটল।

কিন্তু নানী যে কেশরকে এই মামলা থেকে বিরত করতে পারবে না, এতটা কেউ ভাবেনি। নানীকে সে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে। সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে নানীর শিকলে-বাঁধা পোষা হরিণী নয়। সে ভুজঙ্গিনী। তোর মাথায় পা দিলে সে দংশন করবেই। ক্ষমা করবে না। সে যে-ই হোক এবং যতই পরাক্রান্ত হোক।

নানীর নিরুপায়তায় রাজা মনোহরলাল চোখে অন্ধকার দেখল।

দাঁতে কুটো নিয়ে কেশরের পদানত হওয়া ছাড়া আর গতি নেই। ভবানী ওস্তাদ বলে, সেই একমাত্র পথ। নিজে গিয়ে তার

দলিত সম্ভ্রমের ধূলো মুছে দিতে হবে। মেয়েটা সারাপথ চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছে।

মনোহর অসহায় শূন্য দৃষ্টিতে দূর আকাশের পানে চেয়ে থাকে। মনে মনে বলে, সেই হবে আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। সেই হবে আমার ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা।

কেশর রাজা মনোহরের প্রতিপক্ষ হলেও রাজাকে সে প্রচণ্ড আকর্ষণ করেছে। রাজা তার গুণমুগ্ধ। তার গুণগ্রাহী। কেশরকে ভাবতে ভাবতে, কেশরকে ধ্যান করতে করতে মনোহর তার ভক্ত হয়ে উঠল। সাপিনী তার চোখে মনসা দেবী হয়ে দেখা দিল। সে তার ভক্ত পূজারী হয়ে উঠল। সে কেশরকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। বাইরে তার দুযমন হলেও কেশর আগোচরে তার অন্তরের দোস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেশরকে ভাবতে যেমন জ্বালা আছে তেমনি মধু আছে। কেশর তাকে অপমানিত করেছে। লোক চক্ষে তাকে হেয় করে দিয়েছে। কেশর তার খোলস খুলে দিয়েছে। কেশর তার বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। কেশর তার জীবনের অন্ধকার দিকটাকে আলোকিত করে তুলেছে। কেশর তার ভিতরের মানুষটাকে জাগিয়ে দিয়েছে। নারী সম্বন্ধে তার ধারণা বদলে দিয়েছে। তাকে সর্বনাশের পথ থেকে, ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছে।

মনোহরের ভিতরের মানুষটা বলে, এ আঘাতের তার প্রয়োজন ছিল। এ আঘাত তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে। কেশর তাকে নিশ্চিত সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। তার জীবন-যাত্রার গতি বদলে দিল।

না। কেশরের সঙ্গে তার শত্রুতা করা চলে না। তার কাছে সে কৃতজ্ঞ।

সে কেশরের কাছেই যাবে।

তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে আর তার কোন লজ্জা নেই। দ্বিধা সঙ্কোচ নেই। মান অপমান নেই।

যে যা বলে বলুক। তাকে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই। তার কাছে মার্জনা চাইতেই হবে। নইলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না। নিশ্বাস নিতে পারছে না। সহজ হতে পারছে না।

অভাবনীয়ভাবে খবরটা একদিন দেবশ্রীর 'কর্ণগোচর হল। কেশরের চিঠির মারফতে নয়। স্টেটস্‌ম্যানের পৃষ্ঠায়।

স্টেটস্‌ম্যানের ওয়ান্টেড স্তম্ভটায় চোখ বুলোনো দেবশ্রীর দৈনন্দিনতা। পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল লক্ষ্ণৌ-এর সংবাদ স্তম্ভে। লক্ষ্ণৌ-এর প্রতি তার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। লক্ষ্ণৌ নামটার উপর তার গভীর মমতা, লক্ষ্ণৌ তার জীবনের নতুন মহাদেশ। সে লক্ষ্ণৌ বার্তার দিকে চোখ ফেরাতেই দৃষ্টিগোচর হল, "সেনশেশন্যাল কেশ এগেনস্ট-এ রাজা। আউটরেজিং দি মডেষ্টি অব এ ড্যানসিং গার্ল।"

হেড-লাইন থেকে নিচে নামতেই চোখে পড়ল কেশর বাঈ-এর নাম। দেবশ্রী চমকে গেল। রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত বিবরণীটা পড়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু অবিশ্বাস করবে কেমন করে? লক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত বাঈজী কেশরবাঈ। মুজরো করতে গিয়েছিল রাজবাড়িতে। তরুণ রাজা মনোহরলাল তার গায়ে হাত দিয়ে তার মর্যাদাহানি করেছে। কেশর শহর কোতোয়ালিতে রাজার নামে মামলা রুজু করেছে। রাজাকে জামিন দিতে হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।...এর মাঝে তো অবিশ্বাস্য কিছু নেই। এমন ঘটনা তো সংসারে প্রত্যহ ঘটছে। বহু ঘটেছে। এ সেই বহু-র একটা বিক্ষিপ্ত টুকরো। অস্বাভাবিক নয়। অলৌকিক নয়। কিন্তু খবরটা একটা উত্তাল ঢেউয়ের মত দেবশ্রীর

উপর ভেঙ্গে পড়ল। তাকে মাথা তুলতে দিল না। তাকে আছড়ে বালিতে গড়িয়ে দিল।

সে হতচকিত হয়ে গেল। অথচ কাল সে কেশরের চিঠি পেয়েছে। কোন কথাই তো সে লেখেনি। তার চিঠির মাঝে নেই ব্যথার একটু রেশ। নেই কোন কাতরতার সুর। সে ইচ্ছা করেই ঘটনাটা চাপা দিয়ে রেখেছে। তাকে বিব্রত করতে চায়নি। তাকে উৎকণ্ঠিত করতে চায়নি।

রাগে, অভিমানে দেবশ্রীর মনটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। একটা নিদারুণ ব্যথায় তার বুকের নিচেটা মোচড় দিতে লাগল। কত বড় ব্যথা, কী মর্মান্তিক অপমান যে তাকে এই মামলা দায়ের করতে বাধ্য করেছে দেবশ্রীর বুঝতে বাকি রইল না। অথচ ঘুণাক্ষরেও সে তাকে জানতে দিতে চায় না। তার এই বিপদবার্তা তাকে শোনাতে চায় না। তাকে ব্যাকুল ও বিব্রত করতে চায় না। কিন্তু তার আছে কে? কাকে সে বলবে? কার উপর নির্ভর করবে? কে তাকে সৎপরামর্শ দেবে?

নানী ছাড়া তার আপনজন নেই।

শুভানুধ্যায়ী কোন পুরুষ বন্ধু নেই। সহচর সঙ্গী নেই। অথচ নাচাবার লোকের অভাব নেই। শত্রু মিত্র চেনবার উপায় নেই।

বুকে এই আগুন জ্বেলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে কেমন করে? কার পরামর্শে সে এই মামলা করল? এ-যে তার অপমানকে আরো অপমানিত করবে। তার জীবনের শুভ্রতাকে কলঙ্কিত করবে। এই প্রচার, প্রকাশ্য আদালতে সহস্র কুৎসিত দৃষ্টির সামনে নিজের চরিত্রকে প্রতিপক্ষের কলুষিত কষ্টিতে যাচাই করতে দেওয়া, সে যে কী জঘন্য আর কদর্য ভাবতে দেবশ্রীর গায়ে কাঁটা দেয়। পরাক্রান্ত প্রতিবাদী! আয়োজন সমারোহের ত্রুটি হবে না। মিথ্যার অবতারণা করতে বাধবে না। কুৎসিত প্রশ্নের

বিষাক্ত তীর মেরে মেরে কেশরকে জর্জরিত করে তুলবে। গায়ে কাদামাটি মাখিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

কেশর বাঈজী।

লোকচক্ষে, সাধারণ্যে বাঈজীর চরিত্র নিঃসংশয় নিষ্কলুষ নয়। নিরবশেষ নির্মল নয়। বিচারক সংসারের মানুষ। সামাজিক জীব। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সে বিচার করবে। কেশরের মাঝে অসাধারণত্ব আরোপ করবে কেন? তার প্রতিভাকে, তার সততাকে, তার নিয়মানুবর্তিতাকে সম্মান দিতে পারে। চরিত্রকে বিচার করবে নিষ্ঠুর হয়ে, তার চারিপাশের আলো নিভিয়ে দিয়ে।

তা ছাড়া বিচারের শেষ কথাই বিচার নয়। বিচারক তো বিচারের আনুষঙ্গিক আবর্জনা মুক্ত করে দেবে না। বিচার করবে অপরাধের।

একটা অশুভ সঙ্কেত দেবশ্রীকে আতঙ্কিত করে, তুলল। সে সারারাত ঘুমোতে পারল না। ছটফট করতে লাগল। কেশরের উপদ্রুত অন্তরের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যেন তার বিনিদ্র শয্যায় আগুন ছিটিয়ে দিচ্ছে মনে হল। অন্ধকারে কেশরের ব্যথাঘন অসহায় দৃষ্টি যেন একটি করুণ ক্লান্তিতে ভিজে উঠেছে। তার লাঞ্ছিত দেহ যেন অপমানের রিক্ততায় হাহাকার করছে।

দেবশ্রীর দুচোখ জলে ভরে ওঠে।

মাঝরাতে সে আলো জ্বেলে কেশরকে চিঠি লিখতে বসল।

কী চিঠি সে লিখবে তাকে? সে তো তাকে জানাতেই চায় না। তার চিঠির প্রত্যাশায় সে বসে থাকতে পারবে না।

আবার আলো নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকার গলে গলে ভোরের আলো ফুটল। কেশরের চিন্তা তার মনের মাঝে পাষাণস্তূপের মত ভার হয়ে রইল। কেশরের নিরভিভাবক একাকীত্ব তাকে নিরাকুল করে তুলল।

প্রভাতের নতুন আলোয় বাইরের পানে চেয়ে সে তার পথ

খুঁজে পেল। ভোরবেলার ঐ পরিচ্ছন্ন পথের মতই তার নির্দিষ্ট পথ। তার কর্তব্যের পথ। পথ তাকে ডাক দিল। দূরপথ। সত্যপথ।

মনে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আজই সে লক্ষ্ণৌ যাবে।

দেবিকার বিবাহ সংক্রান্ত কতকগুলো কাজ ছিল তার হাতে। বিয়ের দিনস্থির হয়ে গেছে। তিন হপ্তা পরে বিয়ে। সারাদিন সে ঘুরে ঘুরে কতকগুলো কাজকর্মের বিলি-ব্যবস্থা করে রাত্রের তুন একস্প্রেসে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করল।

একটা অমৃতের চেতনা দেবশ্রীকে নাড়া দিতে থাকে। সে যেন পৃথিবীর দূরপৃষ্ঠায় তার জীবনের পরমার্থ সন্ধান করতে চলেছে। দুর্লভের সন্ধানে সে আত্মদান করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে যাত্রা করেছে। তাকে সে সন্ধান করে উদ্ধার করে আনবে।

অন্ধকারে গাড়ি ছুটতে থাকে।

বাইরে মুখ রেখে দেবশ্রী অকুল অন্ধকারের পানে চেয়ে দেখে। অরণ্যে অন্ধকারে কোলাকুলি করে অন্ধকারকে জটিল ও রহস্যঘন করে তুলেছে। অন্ধকার যেন নদীর জোয়ারের মত ঢেউ তুলে নাচছে। দেবশ্রীর মনে হয় কলকাতার বাইরে না এলে অন্ধকারের প্রকৃত চেহারাটা চোখে পড়েনা। বোবা দুর্বোধ্য অন্ধকার, কত উদ্ভট জিজ্ঞাসা ওর অন্তরের গভীরে। অর্থহীন অক্লান্ত দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীর পানে চেয়ে আছে। কী বলতে চায় ও?

অন্ধকার জীবনে নবীনতা আনে। নতুনতর স্ফূর্তি নতুন উত্তেজনা নিয়ে আসে। বদ্ধ জলায় নতুন জোয়ারের জলের মত অন্ধকার নতুন দিনকে পরিচ্ছন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল করে তোলে। দেবশ্রী অন্ধকারের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবে। অন্ধকারের যেমন কুল নেই, আদি-অন্ত নেই তেমনি তার ভাবনারও আদি-অন্ত নেই। অন্তহীন অন্ধকারের শিখার মত তার ভাবনার অকুলে জেগে আছে

প্রপীড়িত, লাঞ্ছিত, উতল একখানি মুখ। সেই মুখই তাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে এই দীর্ঘপথ। সেই মুখই তার জীবনে বিপ্লব এনেছে। সেই মুখই তাকে নতুন জীবনের নতুন পথের দিশা দিয়েছে। তার ব্যথিত ম্লান মুখখানি কল্পনা করে দেবশ্রীর হৃৎপিণ্ডে মোচড় দিতে থাকে।

কেশর কল্পনা করতেও পারবে না যে তাকে কোন খবর না দিয়েই দেবশ্রী কোনদিন লক্ষ্ণৌ গিয়ে হাজির হবে। সে রীতিমত চমকে যাবে তাকে দেখে। ভাবতে দেবশ্রীর দেহে পুলকের রোমাঞ্চ জাগে। আবার ভয় হয়। কেশর যদি লক্ষ্ণৌ-এ না থাকে। কোন সংবাদ না দিয়ে আসাটা হয়তো যুক্তিযুক্ত হলো না।

সঙ্গত হোক, অসঙ্গত হোক, না এসে তার উপায় ছিল না। কেশর না থাকে তার ফেরার অপেক্ষা করতে হবে।

এ-দিকে রাতে বেশ শীত পড়েছে। হেমন্তের শেষ। চাপ চাপ কুয়াশার মত আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। তারাগুলোর জ্যোতি নেই। মিট মিট করছে ব্যথাভরা করুণ চোখের মত।

ট্রেনখানা অন্ধকারের দেশ থেকে আলোর দেশে এসে ঢুকল। মন্থর গতিতে একটা স্টেশনে এসে থামল।

দেবশ্রী একটু চায়ের চেষ্টায় দরজা খুলে দাঁড়ায়।

চা এসে পৌঁছবার আগেই দরজায় এসে দাঁড়াল একটি বোরকা-ঢাকা সম্ভ্রান্ত মহিলা। পেছনে কুলির মাথায় স্যুটকেশ আর বেডিং—বাবু সাব্?

সবিস্ময়ে ঊর্ধ্বমুখী বোরকা কথা বলল।

—আমাকে একটু তুলে নিন বাবু সায়েব।

প্লাটফরমটা অনেকখানি নিচে। কুলি মাল নিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।

মহিলা একখানা হাত তুলে বললে, হাত ধরে আমাকে একটু তুলে নিন বাবু।

দ্বিধাগ্রস্ত হলেও, নিরুপায় দেবশ্রী মহিলার মেহেদি রঞ্জিত সুকোমল একখানি হাত ধরে বোরকাটিকে গাড়িতে তুলে নিল।

—বহুৎ মেহেরবান্।

হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটি দেবশ্রীর কাণের কাছে গুঞ্জন তুলল।

দেবশ্রীর সামনের বেঞ্চিটা পুরোপুরি দখল করে একজন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তাকে ব্যস্ত না করে নিজেকে সঙ্কুচিত করে দেবশ্রী মহিলার স্থান করে দিল।

—বহুৎ মেহেরবান্!

মধুর কণ্ঠে গুঞ্জন তুলল মহিলা।

গাড়ি ছেড়ে দিলে মেয়েটি বোরকা খুলে ফেলে দেবশ্রীকে বললে, একটু উঠুন বিছানাটা খুলে দিই। একটু আরাম করে বসা যাক। সারারাত তো যেতে হবে।

মেয়েটি সুন্দরী। অল্পবয়সী। প্রাণরসোচ্ছল কচি আনারের মত তাজা মুখ। চোখে সুর্মা। ঠোঁটে পানের রস।

মেয়েটি হোলডল খুলতে খুলতে বাঁকা চোখে কটাক্ষ হেনে জিজ্ঞাসা করলে, যাবেন কোথা দেবুবাবু? লক্ষ্মৌ নাকি?

—তুমি—আপনি জানলেন কেমন করে?

দেবশ্রী তাজ্জবভরা চোখে তার পানে তাকাল।

—তুমিই বলুন। আমাকে ছোট বহিন ভাববেন।

—কিন্তু তুমি আমাকে—

—আপনাকে আমি চিনি। না চিনলে নাম বললুম কেমন করে?

বিছানাটা হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে মেয়েটি বললে, এইবার আরাম করে বসুন। তারপর সারারাত ভাইবোনে পরিচয় করতে করতে যাবো।

—তুমিও লক্ষ্মৌ যাবে নাকি?

বিছানার ওপর দেবশ্রীর পাশে আঁট হয়ে বসে মেয়েটি জবাব

দিল, না। আমি বেনারসে নামবো। আপনি তা হলে লক্ষ্ণৌই যাচ্ছেন ?

খিল খিল করে হাসল মেয়েটি। মেয়েটি অপরূপ সৌখিন। বেশ বাসে। আদবে আদতে। হাসিতে কৌতুকে। গায়ে একটি মিঠে গন্ধ ভুরভুর করছে।

দেবশ্রী ঔৎসুক্যে অধীর হয়ে উঠেছে। সে অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে কী যেন খুঁজছে। মেয়েটি মুখটিপে মৃদু হাসতে হাসতে বললে, কী, দেখেছেন কোথাও এ মুখ !

দেবশ্রী বললে, দেখেছি নিশ্চয়ই। মনে করতে পারছি না।

—পারবেন কেমন করে ? মন যে আপনার ভরা। একখানি মুখই যে দুনিয়াকে আড়াল করে আছে।

—কে ? আচ্ছন্নের মত প্রশ্ন করল দেবশ্রী।

—কে আবার বলতে হবে ? লক্ষ্ণৌবলি কেশর বাঈ।

—তাকেও তুমি চেনো ? তুমি কে ?

দেবশ্রী উচ্ছ্বসিত আবেগে তার হাতের উপর হাত রাখল।

—নাম বললেই কি চিনতে পারবেন ? জাহানারা নাম শুনেছেন ?

দেবশ্রী চমকে উঠল : বাঈজী জাহানারা বেগম ? রতনের বাড়ির পাশের জাহানারা বাঈজী।

—এই তো ঠিক চিনেছেন। তবে জাহানারা আর বাঈজী নয়। জাহানারার বাঈজীকে কবর দিয়েছে। মাটি চাপা দিয়েছে—

—কে ?

—তার মহব্বৎ।

দেবশ্রীর গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে জাহানারা চাপা হাসি হাসল।

দেবশ্রী অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বললে, সেই মল্লিক বাড়িতে একদিন তোমায় দেখেছিলুম জাহানারা। চিনতে পারিনি।

—নাই পারলেন। লজ্জা পাবার কি আছে ? আমি কিন্তু

প্লাটফর্ম থেকে মুখ তুলেই আপনাকে চিনেছি। মেয়ে পুরুষে ঐখানেই তো ফারাক।

মধুর হাসি হাসল জাহানারা।

দেবশ্রীও হাসল তার পানে চেয়ে।

জাহানারা একটা পানের ডিবে বের করে স্মিত মুখে প্রশ্ন করল, পান খাবেন দাদা?

হাত বাড়িয়ে দেবশ্রী বললে, দাও।

নিজে মুখে একটা পান পুরে দিয়ে জাহানারা হাসতে হাসতে বললে, লক্ষ্ণৌ যাচ্ছেন তা হলে?

দেবশ্রী পান চিবোতে চিবোতে তাকে ভ্রূভঙ্গি করল।

—আর কখনো গিয়েছিলেন না এই প্রথম যাচ্ছেন?

—আর একবার গিয়েছিলুম। এবার যেতে হচ্ছে একটা বিশেষ কাজে।

—অর্থাৎ?

বাঁকা চোখে হাসল জাহানারা।

—একটা জরুরী কাজে।

—কেশর-দির কাছেই তো?

দেবশ্রী উত্তর দিল, হ্যাঁ। তারই কাজে। তারই কাছে।

চুপ করে খানিকক্ষণ কি ভাবল জাহানারা। ভাবল আর মনে মনে হাসল। মনের হাসি ঠোঁটের কিনারা ছাপিয়ে উছলে পড়ল। সুর্মা-আঁকা চোখদুটি আনন্দের বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দেবশ্রী কথার মোড় ঘোরাবার জন্যই জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু তুমি তোমার বাঈজীকে মাটি চাপা দিয়েছি বললে কেন?

জাহানারা তার চোখে চোখ রেখে বললে, মিথ্যে বলিনি দাদা। সত্যি, এই পথের মাঝে যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো এ বাঈজী জাহানারা নয়। এ জাহানারার কোন পেশা নেই। এ দীন দুনিয়ার মেয়ে।

—পেশা ছাড়লে কেন জাহানারা ?

—নেশায় পড়ে। জীবনটাকে বাজে খরচ করতে পারলুম না।

হাসল দেবশ্রী : বিয়ে করেছো ?

—করিনি। করবো। করবো বলেই সব ছেড়ে পালিয়ে এলুম।

—পালিয়ে এলে ?

চাপা গলায় ফিস ফিস করে বললে, হ্যাঁ। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। সইতে পারলুম না দাদা, ঝুটা আশনাই। ঝুটা আমিরী। বিলকুল ঝুটা কলাপী এঁটে জীবনটাকে মাটি করার কোন মানে হয় না। তাই পালিয়ে এলুম সব ছেড়েছুড়ে।

—বেনারসে কার কাছে যাচ্ছো ? লজ্জারাঙা মুখ তুলে নিঃশব্দে জাহানারা তার পানে তাকাল। ঠোঁট দুখানি তার মুহূর্ত কেঁপে উঠল। চোখের দীর্ঘ পাতাগুলি নাচতে লাগল। অদ্ভূত একটি হাসি তার অধরে ভেসে উঠল।

দেবশ্রী মৃদু হেসে বললে, বুঝেছি। থাক বলতে হবে না।

—কেন বলতে হবে না ? আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার কোন লজ্জা নেই। আমরা যে একই পথের যাত্রি।

—কে বললে আমরা একই পথের যাত্রি ? ভারী দুষ্টু তো !

গলায় জোর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে জাহানারা বললে, আমাদের একই পথ। একই লক্ষ্য। আপনার লক্ষ্ণৌ আমার বেনারস। একই মাটি। একই আকাশ। দুজনের চোখে একই আলো।

আবেশে জাহানারার মুখখানি রাঙা টকটকে হয়ে উঠল। চোখদুটি চিকচিক করতে লাগল। দেবশ্রী বললে, ভুল করোনা ভাই। আমার পথ আর তোমার পথ এক হতে পারে না। আমার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন। আমার চলবার স্বাধীনতা নেই। আমার মনে আলো জ্বললেও সে আলোর মাঝে কোন প্রশ্রয় প্রতিশ্রুতি নেই। বাঁধা-ধরা পথ থেকে জীবনকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে না নতুনতরো কোন অবাধ উন্মুক্ত পথে। নতুনতরো কোন রোমাঞ্চে।

দেবশ্রীর কণ্ঠে কাতরতার আভাস। বিষাদের বিনতি। অপ্রতিভ হলো জাহানারা। ভিজে নম্র গলায় বললে, রাগ করোনা আমার ধৃষ্টতায়। আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা তো নেই আপনাদের সম্বন্ধে। যতোটুকু রতনদির কাছে শুনেছি তাই বলে ফেললুম। হ্যাঁ, রতনদির কথা শুনেছেন? দৈবাৎ কথার মোড় গেল ঘুরে।

রতনকে কেন্দ্র করে, রতনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বিবৃত করল জাহানারা। গোয়ালিয়রে রতনের মায়ের মৃত্যু, স্বামী শোহনলালের কলকাতা আগমন ও আকস্মিক অপঘাত এবং রতনের গ্রেপ্তার ও হাজতবাস। বেচারী রতন।...

একটা রোমাঞ্চকর রহস্যকাহিনীর মত জাহানারার বিবৃতি দেবশ্রীকে অভিভূত করে দিল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাক্যহীন স্তব্ধতায় জাহানারার মুখপানে চেয়ে রইল।

জাহানারা বললে, ভাগ্যিস দিনেশবাবু আছে তাই রক্ষে। ভদ্রলোক তার মুক্তির জন্যে আকাশ-পাতাল করছে।

—তোমার কি মনে হয় ওর স্বামীর মৃত্যুর মাঝে রতনের কোন হাত আছে?

দেবশ্রী প্রশ্ন করল।

জাহানারা বললে, মানুষের মনের কথা বলবো কেমন করে দাদা। ঈশ্বর জানেন। তবে আমার মনে হয় না। সে রতনদি আর নেই। এই ক-টি দিনে, অর্থাৎ দিনেশবাবু আসার পর থেকে রতনদি যে কত শান্ত, কত নম্র আর কত ভদ্র হয়ে গেল। মহব্বতের আলোয় তার চেহারার ভোল বদলে গেল। কথাবার্তা, হাবভাব, চাল-চলন সব বদলে গেল। ডাকসাইটে রতন বাঈজী গলে গলে ঘর গেরস্তির বউ বনে গেল। যেন ছোট নতুনবউ। দিনেশের মহব্বত ওকে পুড়িয়ে খাঁটি করে তুললে।

—সত্যি?

—তাকে দেখলে আর চিনতে পারবেন না। অবাক হয়ে যাবেন।

দিনেশকে যে কী চোখেই দেখেছে। দিনেশ তার জীবনের দুকূল ভরিয়ে দিয়েছে।

গল্প করতে করতে কখন রাত শেষ হয়ে গেছে, কখন অন্ধকার গলে আকাশে আলোর রঙ ধরেছে তারা জানতেও পারেনি। বাইরের পানে চেয়ে জাহানারা বলে উঠল, সকাল হয়ে গেল যে দাদা!

—তাইতো নিয়ম। রাতের পর দিন আসবেই। আলো নিয়ে। আশা নিয়ে।

স্মিতমুখে দুজনে দুজনার পানে তাকাল। জাহানারার মুখে এক টুকরো প্রভাতের পাণ্ডুর আলো এসে পড়েছে। দেখাল যেন একটি নিদ্রাহীন জাগ্রত স্বপ্ন। মুখে আশার আলো। নতুন দিনের সূচনাটি যেন তার মুখখানিকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। মনে মনে হাসছে জাহানারা। সেই হাসির রঙ ধরেছে তার গালে, চিবুকে আর কানের পাতায়। তার চোখে প্রেমের ভাষা। তার সর্বাঙ্গে নতুন জীবনের মর্মরিত আনন্দ। সে কোলের উপর হাতদুটি জড়ো করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে গদগদ স্বরে বললে, সেই আশীর্বাদ করো দাদা—

—কী আশীর্বাদ করবো বলো—

লজ্জালু ভঙ্গিতে তার পানে চেয়ে হাসতে হাসতে জাহানারা বললে, আশীর্বাদ করো আমার নতুন জীবনের নতুন পথ শুভ হোক—

দেবশ্রী মাঝপথে তার সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠল, শুভ হোক, শুভ্র হোক, আলোকিত হোক, সঙ্গীত-মুখর হোক।

একটু থেমে তার একখানা হাত ধরে দেবশ্রী চাপা গলায় বললে, কিন্তু তোমার নতুন পথের চেহারাটা তো চাক্ষুস করালে না।

চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে হাসতে হাসতে জাহানারা উঠে দাঁড়াল। সাবান, তোয়ালে টুথ-পেষ্ট আর টুথ-ব্রাশ নিয়ে বললে, মুখে চোখে জল দিয়ে এসে বলছি।

জাহানারা বাথরুমে ঢুকল।

দেবশ্রী বাইরের পানে তাকাল। দূর আকাশ প্রান্তে লাল রঙের ছোপ ধরেছে। আকাশের অনন্ত বিস্তারের পানে চোখ মেলে চাইল। রাত্রির মোহ কাটেনি আকাশ থেকে। ঘুমের মায়া এখনো ধরণীর চোখে। জাহানারার সঙ্গে এই ক্ষণ পরিচয়, এই অন্তরঙ্গতা তার মধুর মনে হলো। হয়তো আর কখনো ওর সঙ্গে দেখা হবেনা। পথের আলাপ পথেই শেষ হবে তবু এর মাঝে মাধুর্য আছে। আনন্দের স্বাদ আছে। জাহানারাকে তার ভাল লাগল। সে এসে তার এই যাত্রাপথকে আনন্দময় করে তুলল। তার ক্লান্তিকর রাত্রিটির অনিদ্রাকে মধুর করে তুলল।

একসঙ্গে চা খেতে বসে জাহানারা হাসতে হাসতে বললে, আজকের প্রভাত আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট স্মরণীয় দিনের সূচনা করল। আজ জাহানারা মরে নতুন করে জন্মাবে।

দেবশ্রী তার মুখপানে তাকাল।

জাহানারা সংক্ষেপে বিবৃত করল তার কাশীযাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী ঃ

কাশীবাসী হিন্দু ক্ষেত্রীর ছেলে অমরনাথ কাপুরের সঙ্গে জাহানারার প্রেম হয়। সেই প্রেম তাদের জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিল। তারা মিলিত হবার সঙ্কল্প করল। তরুণ অমরনাথ তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে প্রতিশ্রুতি দিল। জাহানারা তার পেশা এবং ধর্ম পরিত্যাগ করে অমরনাথের গৃহকোণে আশ্রয় নিতে স্বীকৃত হলো। আর্যসমাজে আজ ধর্মান্তরিত হয়ে সে অমরনাথকে বিবাহ করবে।

দেবশ্রীকে চমকে দিয়েছে জাহানারা। তাদের দুঃসাহসিক প্রেমের কাহিনী তাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

জাহানারার ঠোঁটের বাঁকে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠল। চমকে যাবেন না, ভয় পাবেন না দাদা। কস্তুরীর গন্ধে যেমন মৃগ পাগল ভালোবাসার গন্ধে তেমনি মেয়ে পাগল। প্রেমের দুনিয়ায়

জন্মে যদি মহব্বতের স্বাদ না পেলুম, একটি পুরুষের জীবনে যদি অমর হয়ে না রইলুম তবে মেয়ে জন্মই যে বৃথা। হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে? কী ভাবছেন। আমার ধর্মের কথা? প্রেম ধর্মই সব ধর্মের সার। প্রেম যদি আমার সত্য হয়, প্রেমের মধ্যে দিয়েই আমার ভগবানকে আমি খুঁজে পাবো।

দেবশ্রী অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। রাত্রির মোহে যে-মুখ সে কাল দেখেছিল, এ সে-মুখ নয়। প্রভাতের তাজা ফুলের মত এ মুখের সজীবতা ও জ্যোতির্ময়তা দেখে সে মুগ্ধ হলো। তার ভালবাসার চেহারটা কল্পনা করে সে বিস্মিত হলো।

॥ পনেরো ॥

কাশীর গঙ্গার ব্রীজের উপর গাড়ি উঠতেই জাহানারা মুখ বাড়িয়ে যুক্ত করে গঙ্গার উদ্দেশ্যে প্রণাম করল।

দেবশ্রী হাসল। বললে, কাশীবাসী হতে চললে?

জাহানারা বললে, মন আমার অনেকদিন থেকেই কাশীবাসী। স্টেশনে একবার নামবেন। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোব।

—কার সঙ্গে?

—আমার বরের সঙ্গে। ভারি দুষ্টু! আনন্দ-দীপ্ত হাসিতে জাহানারার মুখখানি ভরে গেল।

দেবশ্রী বললে, আমি জানবো কেমন করে যে স্টেশনে তাঁর আবির্ভাব হবে?

—বা রে, সে আমাকে নিতে আসবে না?

মন্থর গতিতে গাড়ি স্টেশনে ইন করল। দেবশ্রী নিচে নেমে জাহানারা ও তার মালপত্তর নামিয়ে নিল। ইতিমধ্যে একটি সুদর্শন তরুণ এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। জাহানারার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। হাসি উপচে পড়ল পাতলা ঠোঁট-গড়িয়ে। অমরনাথের সঙ্গে দেবশ্রীর আলাপ করিয়ে দিল জাহানারা।

দেবশ্রী মুগ্ধ প্রশংসাভরা চোখে অমরনাথকে চেয়ে চেয়ে দেখল। স্বাস্থ্যবান, দৃপ্ত চেহারা। গায়ে রঙ ফর্শা। চোখের দৃষ্টিতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। দেবশ্রীর হাত ধরে হাসতে হাসতে বললে, ফেঁসে গেছি দাদা। উপায় নেই। আমি আপনাকে পূজোর সময় দেখেছি কেশর বাঈ-এর সঙ্গে। আপনার বাজনা শুনেছি। আমারও একটু গান-বাজনার শখ আছে।

জাহানারা মুখ টিপে হাসতে হাসতে চাপা গলায় বললে, ঐ গান-বাজনার শখই ওঁকে ফাঁসিয়ে দিলো।

—তা দিলো।

অমরনাথ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। দেবশ্রী হাসল ঃ প্রেমের ইতিহাস থাক। সৌভাগ্যের কথা।

—সৌভাগ্য বই কি! ঝড়ের দাপটে ডানা ভেঙ্গে গেছে।

গাড়ির ঘণ্টা পড়ল।

অমরনাথ দেবশ্রীর হাত ত্নখানা চেপে ধরে বিনীত কণ্ঠে বললে, বেনারসে এলে কিন্তু গরীবখানায় পায়ের ধূলো দেবেন।

জাহানারা বললে, কেশরদিকে বলবেন জাহানারা কাশীর গঙ্গায় ডুবে মরেছে।

অমরনাথ বললে, জাহানারা মরে জাহ্নবী হয়েছে।

জাহ্নবী। জাহ্নবীর পূতধারায় মুক্তিস্নান করে জাহানারা হবে জাহ্নবী। অমরনাথ অমরত্ব লাভ করবে তার বিগলিত প্রেমধারায়। দেবশ্রীর হিন্দু সংস্কারকে উদ্‌বুদ্ধ ও উদবিগ্ন করে তুলেছে অমরনাথ। অমরনাথের তুঃসাহসিক প্রেম তাকে চমকে দিয়েছে। তাকে চকিত করে তুলেছে। ঝড়ের গতিবেগ সামলাতে তাদের পাখা ভেঙ্গে গেছে। প্রতিবাদের ঝড়। ওদের প্রতিরোধের শক্তিকে প্রশংসা করতে হয়। ওদের প্রেমের উন্মাদনা, ওদের অভিযানের মত্ততা ও অমিত সাহস দেবশ্রীর বুকে কাঁপন জাগায়। ও-সব দেবশ্রীর ধ্যান-ধারণার বাইরে। তার কাছে অজানা দেশ। বিস্ময়কর রহস্য মেরু। এ যেন তার গাড়ির গতিবেগের মত একটা প্রচণ্ড ঝড় ওদের তুটিকে উধাও করে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কোন অপার আনন্দলোকে। কিংবা ওদের প্রেমের নিষ্ঠা, ওদের দীর্ঘদিনের তিলে তিলে ক্ষয় করা প্রতীক্ষা, ওদের অটল সঙ্কল্পের গুমোট তাদের এই পরিণতিতে এনে পৌঁছে দিল। পৌঁছে দিল এই নতুন পরিচয়ে। জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে।

চলন্ত গাড়ির একান্তে বসে দেবশ্রী একাগ্র হয়ে ভাবে অনাদিকালের নরনারীর মিলনের চিরন্তন অভিলাষ। এর রহস্যময় ঘূর্ণিপাকে একদিন সকলকেই জড়িয়ে পড়তে হবে। এ এক ধরণের মৃত্যু। মৃত্যুর মতই সত্য। মৃত্যুর মতই মধুর। এরই মাঝে জীবনের অনুভব। এই কালকূটের মাঝেই আছে জীবনের অমৃত। এই হলাহল মন্থন করেই ওঠে জীবনের অমিয়। মৃত সঞ্জীবনী। এরই মাঝে মর জীবনের ক্ষণস্থায়ী অমরত্ব। হোক ক্ষণস্থায়ী তবু তার মূল্য আছে জীবনে। কঠিন বাস্তবকে কোমল ও তন্দ্রাময় করে রেখেছে দুটি মনের এই নিবিড় অন্তরঙ্গতা। মূল্যবান করে তুলেছে স্বপ্নে সত্যে মেশানো মিলনের এই মধুর আকাঙ্ক্ষা। অদ্ভুত, অবর্ণনীয় এই কামনার মাঝেই সৃষ্টির পরম রহস্য সঙ্গোপন।

দেবশ্রী বিচলিত হয়ে উঠেছে। তার দেহের রক্ত তেতে উঠেছে। দিবালোকের খরদীপ্তিতে কিংবা কামনার অনুভবে সে বুঝতে পারে না। তার চারিপাশে আকাশে, বাতাসে, মাটির উত্তাপে কামনার আতপ্ত নিশ্বাস। তার ভিতরটা যেন গলে গলে যাচ্ছে। মনের মাঝে সে একা। সে শান্ত। সে নীরব। তবু যেন ভিতরটা তার জীবন্ত। ভিতরে তার জীবনের অস্থির স্রোতাবেগ। ভিতরটা তার অসহ উত্তেজনায় দাপাদাপি করছে। সে বুঝতে পারে না কিসের এই চঞ্চলতা। কিসের এই আকুলতা।

সারারাত্রি একটি অপরিচিত সুন্দরী মেয়ের নিবিড় সান্নিধ্য, তার অনর্গল আবেগ উচ্ছ্বাস, তার হাসির আবেশ যে-মনে ক্ষণিকের তরঙ্গ তুলতে পারল না, সে-মনে এ কিসের উৎক্ষেপ, কিসের তাড়না?

অবাক হয়ে ভাবে দেবশ্রী।

নিজেকে তার স্বপ্ন মনে হয়। জাগ্রত স্বপ্ন। সে স্বপ্নাবিষ্টের মত কেশরকে ধ্যান করে। তার অনুভবের আকাশে প্রখর সূর্যের মত কেশর ঝলমল করছে। স্নায়ু-শিরায় সে কেশরের উচ্ছ্বসিত

স্পর্শ অনুভব করে। বহু দূর থেকে দূরের আকাশ তাকে ডাক দিয়েছে। সেই ডাকের সাড়ায় তার এই যাত্রা। তার এই অভিযান। এর মাঝেও রোমাঞ্চ আছে। কামনার অনুপ্রাণনা আছে। কেশরের সঙ্গ আর সান্নিধ্য তার জীবনের ঘুমন্ত অন্ধকারকে বিদ্যুদ্দীপ্ত করে তোলে বই কি। কেশরকে জীবন থেকে বাদ দেওয়া চলে না। কেশরই তার জীবনে নারী প্রীতির স্বাদ এনেছে। কেশরই তার জীবনে বৈচিত্র্য এনেছে। কেশর তার জীবনগ্রন্থের অনুক্রমনিকা।

গতি-উদ্বেল গাড়ির মতই দেবশ্রীর মন অধৈর্য হয়ে উঠেছে যাত্রাপথ অতিক্রম করে কেশরের কাছে পৌঁছবার জন্য। আর সে পারছে না নিজের মাঝে নিজেকে ধরে রাখতে। কেশর তার রক্তের মাঝে মুখ লুকিয়ে হাসছে। সে টের পেয়েছে তার মনের কথা। তার চোখে পড়েছে দেবশ্রীর হৃদয়ের আকুলতা। তার নিবারিত নির্লজ্জতা। দেবশ্রী হাত পেতে দাঁড়ালে কেশরের সাধ্য কি তাকে শূন্যহাতে ফিরিয়ে দেয়? কিন্তু তার দিক থেকেও তো নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রয়োজন। অমরনাথের প্রেমের নিষ্ঠা ও ত্যাগ তাকে প্রবুদ্ধ করেছে। নিজের প্রেমকে সত্য করে তোলবার জন্য তাকেও ত্যাগ করতে হবে। প্রতিবাদের ঝড়-ঝঞ্ঝা সইতে হবে। নিজেকে খর্ব করতে হবে।

কেশরের মনটা আজ খুশিতে ভরা। তার মনের গুমোট কেটে গেছে। মনে আর কোন ভার নেই। রাজা মনোহর লাল আজ সশরীরে কেশরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে কেশরের মার্জনা ভিক্ষা করে তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। তাকে ভগ্নি সম্বোধন করে তার মুখে হাসি ফুটিয়েছে। কেশর হৃষ্টচিত্তে তাকে মার্জনা করেছে। মামলা তুলে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এর বেশি কেশর আর কিছু তো চায়নি। কেশর চেয়েছিল তাকে একটু শিক্ষা দিতে। তার রাজদম্ভ চূর্ণ করতে। তার লাম্পট্যকে লবেজান করতে।

মনোহর অনুতপ্ত। তার অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে। হয়তো এই অপমান তাকে নতুন মানুষ গড়ে তুলবে। তার জীবনের গতি ফিরিয়ে দেবে।

কেশর এতটা ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি যে রাজা স্বেচ্ছায় স্বয়ং কারুকে কোন কিছু না জানিয়ে হঠাৎ তার বাড়িতে এসে হাজির হবে। কেশর প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। সঙ্গে কেউ নেই। একটা চাকর দরোয়ান পর্যন্ত নয়। মায় গাড়ির ড্রাইভারকে পর্যন্ত সঙ্গে আনেনি। নিজে ড্রাইভ করে এসেছে। একা এসে বাড়িতে ঢুকেছে।

—বোনের বাড়িতে ভাই আসবে সঙ্গে লোক আনবো কেন?

নানী তাজ্জব। কেশর অবাক।

তাদের মুখে কথা ফোটেনা।

—বোনের আমি অসম্মান করেছি। নিজে না এলে তার মন ভরবে কেন?

কেশর লজ্জিত হলো। কেশর সুখি হলো। তার অন্তর্দাহ প্রশমিত হলো। সে হাসিমুখে রাজাকে সম্বর্ধনা জানাল।

রাজা অনুশোচনার আর্দ্র কণ্ঠে বললে, আমি দেবতা নই বোন। সাধারণ মানুষ। ভুল মানুষেই করে। ভুলকে ভুল বলে বুঝতে পারলেই হয় তার স্খালন, তার প্রায়শ্চিত্ত। আমি জ্ঞান হারিয়ে পশুর মত তোমাকে আক্রমণ করেছি। তোমাকে অপমান করেছি। আমাকে তুমি মার্জনা করো। তোমার মার্জনা ভিন্ন আমি স্বস্তি পাবো না। আমি তোমার শরণাগত।

কেশরের দু-চোখ জলে ভরে এল। সে কথা বলতে পারল

না। অশ্রু-আকুল চোখে বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে রাজার হাত দুটি ধরে শুধু ডাকল, ভেইয়া।

কেশরের দেহের ও ডাকের স্পর্শে মনোহর শিউরে উঠল। তার চোখ দুটিও অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল। সে আনত মস্তকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উত্তর দিল, বহিন্।

তাদের বিরোধের অবসান ঘটল। তাদের নতুন করে পরিচয় হলো।

নানী বিস্ময়ে হতবাক।

উর্ধ্বশ্বাস উৎকণ্ঠায় কেশরের মহিমা দেখল।

রাজা মনোহরলাল নানীর পানে চেয়ে ভ্রূকুটি করে বলল, লজ্জার কথা, আপশোষের কথা নিজের নাতনিকে তুমি চেননা। তুমিও আমার চেয়ে কম অপরাধী নও। কী সর্বনাশ করতে বসেছিলে মেয়েটার!

কেশর ধিক্কারে মাথা হেঁট করল।...

মনোহর চলে গেলে কেশর হাসতে হাসতে নানীর চিবুক ধরে বললে, তোমার সঙ্গে রাজার রসের সম্বন্ধ হলো। রসের নাতি। চেষ্টা করে দেখোনা যদি রাজার হাতি হতে পারো।

হাসির ঢেউ তুলে নানীকে জড়িয়ে ধরে ঘুরপাক দিয়ে নৃত্য করল কেশর।

নানী বললে, আমি জানতুম।

—কী জানতে?

—রাজা ভেঙ্গে পড়েছে। মুষড়ে গেছে।

জিব বের করে মুখভঙ্গি করে কেশর বললে, তুমি আবার জানবে না? তুমি হলে বিন্দেদূতী। রাজা তোমার গলায় মুক্তোর হার পরিয়ে দিয়ে গেল।

নানীকে কেশর চেনে। নানীর উপর তার রাগ হয় না।

নানীর জন্য তার দুঃখ্যু হয়। নানী তাকে নিজের মত করে গড়ে তুলতে পারল না।

বেচারী নানী!

এই বিশ্রী কদর্য ব্যাপারটা যে এমন সুন্দরভাবে শেষ হবে কেশর কল্পনা করতেও পারে নি। রাগে ও অপমানে অন্ধ হয়ে মামলাটা করলেও অন্তরে সে সুখি ছিল না। লক্ষ্ণৌ শহরটা তাকে নিয়ে হৈচৈ করছে! তার চরিত্রকে নখে চিরে বিশ্লেষণ করছে। তাকে ঘিরে একটা হুলস্থুল পড়ে গেছে। তাকে দেখবার জন্য পথে ভিড় জমে যায়। হাঁপিয়ে উঠেছিল সে।

সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে হাঁপ ছাড়ল। তার মনটা হালকা হয়ে গেল। আনন্দ উথলে উঠল। খুশিতে ভরে উঠল মনটা। মনে পড়ল দেবশ্রীকে। দেবশ্রীকে জানতে দেয়নি ঘটনাটা। কে জানে কেমন ভাবে সে একটাকে নেবে। তার জন্যও মনে একটা অস্বস্তি ছিল। সে নির্ঝঞ্ঝাট হলো। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে আবার সে কাজ করতে পারবে। আবার সে একমন হয়ে দেবুকে ভাবতে পারবে।···

হাসি পায় মনে। দেবুকে ভাবাও কি তার অবশ্য কর্তব্যের তালিকাভুক্ত হলো নাকি? সে তো অস্বীকার করতে পারে না। দেবশ্রীর চিন্তা, দেবশ্রীর ছায়া, তার অস্থিমজ্জায় বাসা বেঁধেছে। এই একটি বছর দেবুকে ভাবা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেবুর কথা মনে পড়তেই প্রীতি উচ্ছ্বাসে মন তার অনর্গল হয়ে উঠল। দেবুর কাছে সে লজ্জিত হয়ে আছে। দেবুর কাছে সে অপরাধী হয়ে আছে। নিজের মনের এই দুর্ভাবনা তার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিল। সে ভারমুক্ত হয়েছে এইবার সে তাকে জানাতে পারবে।

মাথার চুলগুলো এলো করে সে বাদামী আয়নার সামনে একখানা টুলের উপর বসল। নিজের প্রতিবিম্বের পানে চেয়ে তার

মনে হলো, দেবু তার মনে উদয় হলে, তার মনের আয়নায় দেবুর অধিষ্ঠান হলে তার মুখের চেহারা বদলে যায়। তাকে ভারী সুন্দর দেখায়। দেবুর চিন্তা শুধু তার মনকে আলোকিত করে তোলে না, তার দেহকে উজ্জ্বল করে তোলে তাকে রূপময়ী করে তোলে। আয়নার বুকে নিজেকে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। নিজেকে তার সুন্দর মনে হয়। রূপকে তার ঘষে-মেজে আরো ফুটিয়ে তুলতে সাধ হয়। মনে বিরহের আঁচ লাগে। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। পড়ন্ত বেলার মত মনটা তার ছায়াঘন হয়ে ওঠে। এত আনন্দোচ্ছ্বাস, এত প্রীতির ভাগ নেবার মত দোসর নেই। কেশরের শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। এই বিরহের মাঝেও সে একটা অনির্বচনীয় আনন্দের স্বাদ পায়। দেহ সঙ্গীত-স্পন্দিত হয়ে ওঠে। পাথর-চাপা নিঝ রিণীর মত কলধ্বনি করতে থাকে।

কেশরের সাজতে সাধ যায়।

সে ঘন কৃষ্ণ চুলগুলোকে পিঠ থেকে বুকের উপর টেনে নিয়ে চুলের পাট করতে বসে। কণ্ঠ তার গুনগুনিয়ে ওঠে: বাবুল মোরি নৈহারা ছুট যায়—

চুলগুলোকে পাট করে তার বিনুনী করতে মন গেল না। সে এলো খোঁপা করে কাঁধের বাঁ দিকে কাত করে বসিয়ে দিল। প্রথম দিন কলকাতায় এমনি খোঁপা দেখে দেবু প্রশংসা করেছিল। তারপর থেকে প্রায়ই সে এমনি করে চুল বাঁধে।

চমকে উঠল কেশর নিচে কলরব শুনে।

ও কার কণ্ঠ? কেশর কি স্বপ্ন দেখছে নাকি? দেবু মাঝে মাঝে ওকে এমনি পেয়ে বসে। স্বপ্নের ঘোর কাটতে চায় না।

—কেশর—কেশরী—

নানী চেঁচামেচি করে তাকে ডাকছে।

—আগে আমার কথার জবাব দাও না নানী? মামলার কি হলো তাই বলো না?

—বলছি না, মামলা মিটে গেছে। আজ রাজা নিজে এসে ওর হাতে ধরে মাপ চেয়ে গেছে।

—সত্যি নানী সত্যি? আমাকে বাঁচালে নানী। একটা চুমো খাবো তোমার নানী—

নানী চেঁচিয়ে উঠল, আরে ও কেশর, দেখে যা কে এসেছে—

কেশর যে আগেই সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা জানতে পারে নেই।

—দেবু!

স্বপ্ন নয়। আচ্ছন্নতা নয়। ছায়া নয়। জীবন্ত সত্য। জলজ্যান্ত রক্তমাংসের দেবশ্রী নানীকে ধরে টানাটানি করছে। তার প্রীতি-উচ্ছ্বাস অনর্গল হয়ে উঠেছে নানীর শুভ সংবাদে।

মুহূর্ত দেবশ্রীর মুখের পানে চেয়ে এক নিমেষে সে বুঝে নিয়েছে দেবশ্রীর এই আকস্মিক আবির্ভাবের হেতুটা। মামলার কথা কোন রকমে জানতে পেরে, তার সম্মান আহত জেনে সে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ছুটে এসেছে তাকে কোন সংবাদ না দিয়ে। তার ভেতরের সত্যতার আন্তরিকতা কেশরকে প্রচণ্ড লজ্জা দিল। তার অন্তরটা কিন্তু স্নেহে গলে গেল। একটা অদ্ভুত ভাবদীপ্তিতে তার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। চোখদুটো নম্র আনন্দ-বেদনায় ছল ছল করে এল। তার দুচোখে অশ্রুর দুটি ধারা নামল। ঘুমন্ত মানুষের মত ভাবের ঘোরে তার হাত ধরে বললে, দেবু?

দেবশ্রী তার কাঁধের উপর হাত দিয়ে তাকে উপরে তুলে নিয়ে গেল।

কেশর উচ্ছ্বসিত আবেগে বারবার শুধু তার নাম উচ্চারণ করে গেল, দেবু! দেবু!

—কিন্তু তোমার এ হলো কি? আমি এসে কি তোমায় ব্যথা দিলুম কেশর?

কেশর তার কাঁধের উপর মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখ বুঁজল।

কণ্ঠের মাঝে তার রাগ-রাগিনীর শৃঙ্গার। দেহ তাদের নৃত্যের বিলাসভূমি। নিভৃত মিলনের পুষ্পশয্যা। তার অঙ্গজুড়ে লীলা করে কামোদ তিলক টোড়ি ভৈরবী। বসন্ত মালবিকা।

দেবশ্রীর চোখে সে তার দৈব আবির্ভাব। তার মাধুর্য পরম বিস্ময়। তার প্রাত্যহিকতা মুছে যায়। সে ডুবে যায় তার গভীরতম অনুভূতিতে। সে তখন আর মানবী নয়। সে একটা ভাব। একটা আলোর আভা। একটা ক্ষণিকের রশ্মি রেখা।

তার এই ভাবময় আবেশ দেখবার জন্য দেবশ্রী উন্মুখ হয়ে ওঠে।

রেওয়াজ শেষ হলে দেবশ্রী ভবানী ওস্তাদের কাছে রাজবাড়ির ঘটনা ও মামলার বিশদ বিবরণ শুনল।

কেশর মুখটিপে হাসতে হাসতে ভবানীর পানে চেয়ে বললে, কলকাতার খবরের কাগজে পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে।

—তা তো হবেই। রাজবাড়ির কিস্সা।

দেবশ্রী নিঃশব্দে কেশরকে ভ্রূকুটি করল। ভবানী হাসতে হাসতে দেবুকে বললে, মামলা হয়েছিল বলেই তো দাদার দর্শন মিলল।

কেশরের কান দুটি মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল। সে মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপল।

ভবানী যাবার সময় কেশরকে বললে, কাল তোমাকে একবার উকিল বাড়ি যেতে হবে। আপোসের দরখাস্ত সই করতে।

কেশর দেবশ্রীকে বললে, মনে থাকে যেন রাজার বোন আমি।

দেবশ্রী হাসতে হাসতে বললে, তার কোন দাম নেই। বাঙলায় মেয়েদের একটা প্রবাদ আছে ঃ ভাই রাজা তো আমার কী ?

—তাই বুঝি ?

কেশর তার পাশে গিয়ে বসল। বললে, মেয়েরা বলে, ভাই রাজা তো আমার কি ?

দেবশ্রী মুখ ঘুরিয়ে মাথা দুলিয়ে বললে, বলেই তো ? বোনেরা

কি কখন ভায়ের গৌরব করতে চায় নাকি? ভায়ের ঐশ্বর্যকে তারা ঈর্ষার চোখে দেখে।

—তাই নাকি?

—তা নয়তো কি? বাপের বাড়ি মেয়েদের কাছে তো স্কুল-কলেজের বোর্ডিং বা রেফিউজ। জ্ঞান হবার পরই সে বুঝতে পারে বাপের বাড়ির সে কেউ নয়। সেটা একটা তার অস্থায়ী আবাস। সেখানে সে ক্ষণিকের অতিথি। ডানা গজালেই সে নীড় ছেড়ে উড়ে যাবে এবং নতুন নীড় রচনা করবে অজানা অপরিচিত সাথীর হাত ধরে। কাজেই তার বাপের বাড়ির উপর আন্তরিকতা কম। ভায়ের সংসার তার কাছে নগণ্য। ভায়ের ঐশ্বর্য তার কাছে মূল্যহীন।

কেশর তার কাঁধে হাত রেখে বললে, মেয়েরা তা হলে অত্যন্ত স্বার্থপর বলো?

দেবশ্রী বিজ্ঞের মত ঘাড় দুলিয়ে গম্ভীর গলায় বললে, ঘোরতর স্বার্থপর। পরমুখাপেক্ষী এবং নির্মম।

কেশর মুচকি হেসে চোখের কোণ দিয়ে তার পানে চেয়ে বললে, দেবিকা সম্বন্ধেও কি তোমার ঐ একই ধারণা?

—তবে না তো কী? সে কি পয়গম্বর? সেও তো মেয়ে। সব মেয়েই এক।

একটা দীর্ঘশ্বাস তার অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়ল। সে আর্দ্রস্বরে বললে, এতো যে দাদা দাদা। দু-দিন যাক না। সব ধুয়ে মুছে যাবে। স্বামীর গৌরব আর স্বামীর সংসারের কথা ছাড়া আর কোন কিছুই তার মুখে শুনতে পাবে না। তার পর দুটো ছেলেপুলে হলে তো আর কথাই নেই। সব সম্বন্ধ উঠে যাবে।

কেশর আকুল চোখে তার মুখপানে তাকাল। তার মুখে বিষণ্ন কুয়াশা। কেশরের বুঝতে বাকি রইল না যে স্নেহময়ী বোনটির আসন্ন বিরহ ব্যথা তাকে উতল করে তুলেছে।

॥ ষোল ॥

রাত শেষ হয়ে আসে কিন্তু তাদের কথা আর শেষ হয় না। অফুরন্ত তাদের কথা। অশেষ তাদের জিজ্ঞাসা। সামনা-সামনি দুজনে বসে আছে দেবশ্রীর জন্য নতুন করে সন্ধ্যায় পাতা নিভাঁজ তকতকে বিছানার উপর। দুটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত। কেশরের কোন প্রশ্নের উত্তর দেবে দেবশ্রী? দেবশ্রীর কাছে কেশর অনাদি অনন্তকালের চিরন্তন প্রশ্ন। হিমালয় শিরের চিরতুষার রেখার মত চিররহস্য। চির দুর্জ্ঞেয়। সে স্তব্ধতাকে ঘোলাবার শক্তি তার নেই। তার চোখের সামনে আকাশ রয়েছে প্রসারিত আর সেই আকাশের বুকে সে উদার উন্মুক্ত বিশাল জীবনের প্রতিবিম্বন দেখতে পায়। এর বেশী সে কিছু দেখতে চায় না। দর্পণ ভেঙ্গে তার অন্তরের ছবিকে ধরবার আকুলতা তার নেই।

স্মিতমুখে কেশর বলে, অমঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলময়ের দর্শন মেলে।

—কি রকম?

—এরই মধ্যে আবার আমাদের দুজনের দেখা হবে ভাবতে পেরেছিলে কি?

দেবশ্রী হাসতে হাসতে বলে, ওঃ! তাই বুঝি মামলা করেছিলে?

—দেখা তো হলো—

—কিন্তু তুমি তো দেখা দিতে চাওনি।

আরক্ত মুখ নিচু করে কেশর বললে, তুমি তো সব জানো।

দেবশ্রী মুখ ভার করে বললে, না আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না।

কেশর তার হাতের উপর হাত রেখে হেসে উঠল : আজকাল আবার কথায় কথায় অভিমান হয়।

দেবু নিঃশব্দে তার হাতখানা চেপে ধরল।

কেশর প্রসন্ন মুখে বললে, তুমি যে খবর পেয়েই পাগলের মত সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে এ আমি সত্যি সত্যিই ভাবতে পারিনি।

তার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে দেবু প্রশ্ন করল, কিন্তু খুশি হয়েছো বলে তো মনে হলো না?

—খুশি?—

কেশরের সহসা বাকরুদ্ধ হয়ে এল। তার চোখ দুটি অশ্রুতে বিব্রত হয়ে উঠল। সে চোখের ডানা ঝাপ্টানী দিয়েও উদ্গত অশ্রুরোধ করতে পারল না। তার চোখ ফেটে মর্মরশুভ্র গালের উপর অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

দেবু অবাক হয়ে নিঃশব্দে তার মুখপানে চেয়ে রইল। কোন কথা বললে না।

কেশর আঁচলে চোখ মুছে বললে, অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘুমোও। আলো নিবিয়ে দাও। আমি যাই।

কেশরের হাত চেপে ধরে দেবশ্রী সহসা প্রশ্ন করল, কেন, ঘুম পেয়েছে?

—হ্যাঁ।

কেশর হাসল মৃদু রেখায়।

দেবু কুটিল হাসিতে মুখ ভরে চাপা গলায় বলে উঠল, মিছে কথা। ঘুমোতো তুমিও পারবে না। আমিও পারবো না। অন্ধকারে শুয়ে ছটফট করার চেয়ে দুজনে কাছাকাছি বসে জেগে রাত কাটানো মধুর।

কেশর সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল : পাগল!

দেবু বললে, আমি তো পাগল। আমার এই আসাটা নিছক পাগলামি। কিন্তু তোমার আজকের এই থেকে থেকে কান্নাটা

কী, আমায় বুঝিয়ে দেবে? আজকের আগে তোমার চোখে কখনো জল দেখিনি কিনা!

কেশর চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে ঝলসে উঠল, দেখোনি। দেখো। শেখো। এ-ও যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে হয়, তবে কিসের এম-এ পাশ করলে?

দেবু সশব্দে হেসে উঠল।

কেশর বললে পাগলামি করো না। ঘুমোয়। দু-রাত্রি তো ঘুমোওনি বলছো। শরীর অসুখ করবে।

—ঘুমোবার অনেক রাত্রি জীবনে আসবে কেশর। কিন্তু জেগে থাকবার এমন মধুর রাত্রি হয়তো মাথা খুঁড়েও পাবে না। আমাকে চাপা দিয়ো না। বলতে দাও।

—কী বলবে কী?

—এই পাগলামির একটা গল্প বলি শোন কেশর। কাল আসবার পথে ট্রেনে প্রত্যক্ষ করে এসেছি। এরই নাম পাগলামি। যে পাগলামি মানুষকে বংশপরম্পরায় বাঁচিয়ে রাখে। অমর করে রাখে।

দেবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, পাগলামি? মানুষের জীবনের অর্ধেক পাগলামি অর্ধেক সুস্থ। অর্ধেক আবিল অর্ধেক অনাবিল। আধেক আবর্ত, আধেক স্থির। মানুষের এই পাগলামিই সৃষ্টির ধারক। মানব মানবীর মুহূর্ত মত্ততায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী, শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও শ্রেষ্ঠ প্রতিভার হয়েছে জন্ম। সেই জীবনের জন্য যখন আমাদের রক্ত পিপাসিত হয়ে ওঠে—মত্ত হয়ে ওঠে, সেই পিপাসা সেই মত্ততাই নরনারীর মিলনের একটি পরিপূর্ণতম মুহূর্তের স্মারক রেখে যায়। আর তারি মাঝে তারা বেঁচে থাকে বংশপরম্পরায়। এই তো নরনারীর মিলনের একমাত্র সংজ্ঞা। সেই পিপাসাকে তুমি পাগলামি বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারো না।

অবশ, অসাড় গলায় কেশর বললে, আমি তো তা করিনি। কিন্তু তুমি যে কি গল্প বলবে বলছিলে ?

কেশর প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চায়। তার উত্তেজনাকে স্তিমিত করে আনতে চায়। সে ভয় পেয়েছে। হাঁপিয়ে উঠেছে রাত্রির এই নিগূঢ় ভয়াবহ স্তব্ধতায়। সে এই ঘোলাটে অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলতে চায়। নিজেকে আলোর আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চায়।

দেবশ্রী তার মুখপানে চেয়ে হেসে উঠল। নিজেকে যথাসম্ভব সৌজন্যে মোলায়েম করে এনে স্নিগ্ধস্বরে বললে, সত্যি তোমার ঘুম পাচ্ছে কেশর ? তাহলে তোমাকে আর আটকে রাখবো না—

কেশর হাসিমুখে বললে, না। তোমার গল্পটা শুনে যাই।

দেবশ্রী বললে, জাহানারার সঙ্গে ট্রেনে পরিচয় হলো। মনে আছে জাহানারা কে ? রতনের বাড়ির পাশের বাঈজী জাহানারা বেগম। সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি—

কেশর জিজ্ঞেস করল, সেই মল্লিক বাড়িতে আমাদের সঙ্গে যে গান গেয়েছিল ?

—হ্যাঁ। জাহানারা বেগম। আমি তাকে চিনতে পারিনি। সে আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছিল।

কেশর বাঁকা চোখে ঝলকানি দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, দুষ্টুমী মাখানো এ মুখ খানি যে একবার দেখেছে সে আর ভুলতে পারবে না।

—তাই নাকি ?

দুজনে একসঙ্গে হাসল।

ঘরের ঘোলাটে আবহাওয়াটা হাসির তোড়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল।

দেবশ্রী রঙ মাখিয়ে রসান দিয়ে ধীরে ধীরে বিবৃত করল জাহানারা অমরনাথের প্রেমের উপাখ্যান। কত ঝড় তুফান মাথায় করে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে অবশেষে তারা মিলিত হলো। জাহানারা

হলো জাহ্নবী। অমরনাথ কাপুরের পরিণীতা স্ত্রী। অতীতের আবর্জনা থেকে সে বেরিয়ে এলো তার পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যতে। অজস্র মুক্তিতে। তার স্বপ্নের স্নেহনীড়ে।

কেশর মৃদু হাসল। তার মর্মমূল থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস। তার ভীরু চোখদুটি স্বপ্নফেনিল হয়ে উঠেছে। মুখে নেমেছে রঙিন কুহেলিকা।

দেবশ্রী জিজ্ঞেস করলে, এ-কে কি বলবে পাগলামি ?

কেশর চোরা হাসি হাসতে হাসতে জবাব দিল, ভাববার কথা। ভেবে জবাব দিতে হবে।

একটু থেমে চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলো গালের উপর পাছড়াতে পাছড়াতে বললে, জাহানারা কিন্তু তোমার মাঝে প্রেমের জীবাণু সংক্রামিত করে দিয়েছে। তাদের দুঃসাহসী প্রেমের কহানী তোমাকে রাতারাতি প্রেমিক করে তুলেছে।

দেবশ্রী হাসল : করলেই বা। প্রেম তো একদিন জীবনে দেখা দেবেই।

কেশর গম্ভীর মুখে গাঢ়স্বরে বললে, কিন্তু সে প্রেম শিল্পীর অপঘাত না ঘটায়। শিল্পীকে অতি সাবধানে প্রেমের পথে পা বাড়াতে হয়। শিল্পীর প্রেম প্রত্যহের আবর্তে আবিল নয়। কামনার গোলকধাঁধায় জটিল নয়। দুর্গম নয়। প্রেম শিল্পীর সাধনা। সমাপ্তি নয়। শিল্পীর প্রেম অন্তরের অন্তহীন আকুতি। নিরুদ্দেশের পথে আত্মানুসন্ধানের অভিযান। শিল্পী আত্মনিষ্ঠ অন্বেষ্টা। তার অন্বেষণের শেষ নেই। তার প্রেমের তৃপ্তি নেই। বাণীহীন ব্যাকুলতাই তার প্রেম।

দেবশ্রী তার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, অর্থাৎ কেঁদে বেড়াও তবু হাত বাড়িয়ো না।

কেশর মাথা দুলিয়ে ভাবের ঘোরে বললে, হ্যাঁ। কেঁদে বেড়াও, হাতও বাড়াও। শুধু ধরে আর ধরা দিয়ে থেমে যেওনা।

দেবশ্রী অবাক হয়ে কেশরের পানে তাকাল। তার ছুচোখে অশ্রু টলমল করছে।

রতনের বিপদ-বার্তা কেশরকে ব্যথিত ও আকুল করে তুলেছে। সে অবাক হয়ে গেছে রতনের নিয়তির নির্মম চক্রান্তে। তার ভাগ্যবিপর্যয়ে। মার মৃত্যুও তার জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিল। কোথায় ছিল তার স্বামী, মরতে এল তার আঙিনায়। সারা জীবন যাদের নিয়ে অশান্তি ভোগ করল মরেও তারা তাকে নিস্তার দিল না।

কেশর ভাবে।

তার চিন্তাকুল মুখের পানে চেয়ে দেবশ্রী প্রশ্ন করে, তার জন্যে তোমার কোন কর্তব্য আছে নাকি?

কেশর উত্তর দেয়, কর্তব্য থাকলেও এই হত্যা মামলার মধ্যে আমি মাথা গলাতে পারবো না। উপস্থিত খবর রাখা ছাড়া আর কোন কর্তব্য নেই।

একটু থেমে কি ভেবে কেশর দেবুর মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু খবর রাখবে কে?

দেবশ্রী হাসতে হাসতে বললে, আমার ওপর তোমার কোন আদেশ থাকে, বলো—

—আমি তো পাগল হই নি যে তোমাকে বলবো এই খুনী মামলায় নিজেকে সনাক্ত করতে? বরং এটাকে আমার নিষেধ বলেই জানবে। আমার সবিশেষ অনুরোধ দেবু কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও কোনদিন ও পথে পা বাড়াবে না। ও বিষাক্ত বাতাসে নিশ্বাস নেবে না। খবরের কাগজের খবর ছাড়া কোন খবর রাখবার চেষ্টা করবে না।

কেশরের গলায় অভিভাবকের কাঠিন্য, বন্ধুর নির্দেশ, প্রিয়ার ব্যাকুলতা। দেবশ্রী নির্বাক হয়ে গেল তার মুখপানে চেয়ে।

সেই মুহূর্তটির অপার ও অটুট স্তব্ধতা যেন দেবশ্রীর কাছে কেশরের উপস্থিতিকে আরো নিবিড় ও নিরেট করে তুলল। কেশরকে তার অত্যন্ত আপন ও পরম আত্মীয় মনে হলো। সেই তার ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তুলবে। মধুময় করে তুলবে। সেই তার ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই হবে তার জীবনের প্রভু।

কেশরকে তার আশ্চর্য মনে হল। অপরূপ মনে হল। স্তব্ধতার মাঝে কেশরের সৌন্দর্য যেন শান্ত দীপালোকিত গৃহকোণের স্নিগ্ধ মাধুর্য নিয়ে আসে। চোখ জুড়িয়ে যায়। অলস চোখের পাতা জুড়ে ঘুম নেমে আসে। সে যখন চুপ করে থাকে তখনি সে বেশী কথা বলে। সে যখন মুখ বুঁজে থাকে তখন সর্বাঙ্গ তার কথা বলে। স্নিগ্ধ কম্পিত দীপ-শিখার মত হেসে হেসে মাথা দুলিয়ে নিঃশব্দে কথা বলে।

দেবশ্রী অপলক মুগ্ধ চোখে কেশরের পানে চেয়ে থাকে। কেশরের কুমারী দেহমনে লজ্জার শিহরণ জাগে। তার মুখখানি লাল হয়ে ওঠে। সে নিজেকে আড়াল করবার জন্য সহসা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

দেবশ্রী গম্ভীর হয়ে গাঢ়স্বরে বলে, এতো হাসি নয়। এ মুখ লুকোবার ঘোমটা।

—দেবু!—

চোখ রাঙাতে গিয়ে কিন্তু কেশরের চোখে বাদল নামল। গলা বুঁজে গেল।

কেশর চোখে আঁচল দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দেবু তার হাত ধরে কাছে বসাল। বললে, চোখে জল নিয়ে বাইরে গেলে নানী ভাববে আমাদের ঝগড়া হয়েছে।

কেশর হেসে ফেললে।

দেবু বললে, চোখের জল মোছ।

চোখের জল মুছে কেশর বললে, এতো দুষ্টু তা জানতুম না।

দেবু বললে, এতো কাঁদুনে তা জানতুম না।

কেশর তির্যক কটাক্ষ হানলঃ মেঘের নিচে শুধু জল নেই। আগুনও আছে।

—সে আগুন মনোহরলালের মত রাজা-রাজড়াকে পোড়াবে, আমার মত গরীব বামুনকে আলো দেবে।

কেশর তার গায়ে চিমটি কেটে বললে, আগুন কারুকে দয়া করে না। বাদ-বিচার করে না।

দেবু হাসতে হাসতে জবাব দিল, আমার পোড়বার ভয় নেই। আমি তো পতঙ্গ নই। আমি আলোর আকাশের পাখি।

কেশর খিল খিল করে হেসে উঠলঃ কিন্তু সাবধান, জাহানারার মত কেউ যেন ধরে খাঁচায় পুরে রাখে না।

বাইরে বিভার গলা শোনা গেল।

কেশর ডাকল, এসো বিভা-দি!

—মামলা মিটে গেছে শুনে ভারি খুশি হলুম।

কেশর বললে, না মিটিয়ে রক্ষে আছে, এই দেখনা কলকাতা থেকে দৌড়ে এসেছেন মামলার সালিশ করতে।

—তাই বুঝি?

নিঃশব্দে দুজনে দুজনকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাল।

দেবশ্রী বললে, না গো বিভাদি। আমি এসেছি আমার বোনের বিয়েয় তোমাদের নেমন্তন্ন করতে। ২১শে আমার বোনের বিয়ে, কেশরের সঙ্গে চলোনা, একবার কলকাতা বেড়িয়ে আসবে। অনেকদিন তো যাওনি।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, তুমি যদি সঙ্গে যাও তাহলে আমি যাই। নইলে আমার যাওয়া হবে না।

—কেন?

—একলা আমি যাবো কেমন করে? কী বলে পরিচয় দোব? আমার যাওয়া কি উচিত বিভা-দি?

একবার দেবুর পানে আরেকবার কেশরের পানে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বিভা বললে, উচিত অনুচিতের কথা আমি বলবো কেমন করে? আমি ওদের কারুকে চিনি না তোমাদের মনের কথা জানি।

কেশর চোখ পাকিয়ে তার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললে, আমাদের আবার মনের কথা জানবে কি?

কেশর চোখের নিষেধে বিভার মুখ বন্ধ করে দিল।

দেবু সশব্দে হেসে উঠল।

বিভা অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বলে উঠল, তবে না যাওয়াই ভালো। এরপর দেবুভাই এসে আমাদের একদিন ভালো করে খাইয়ে দেবে।

কেশর দেবুর পানে চেয়ে বললে, ও আবার কবে আসবে কে জানে।

বিভা হাসতে হাসতে বললে, তুমি ডাকলেই ও আসবে।

—ইস্! আমার ডাকেই ও আসে কিনা, আর আমিই বা ওকে ডাকবো কেন?

ভাবের ঘোরে বিভা হঠাৎ হেসে উঠল। চোখ মিট-মিট করে বললে, কেন ডাকবে আর ডাকলেই ও আসবে কিনা এ আমাদের মনের চিরকালীন জিজ্ঞাসা। তবু একজন ডাকে আরেকজন তার ডাকে সাড়া দেয়। এই অবিশ্রান্ত ডাকাডাকি জীবজগতের সর্বত্র। এ-পারের পাখির ডাকে ও-পারের পাখি সাড়া দেয়। ও-পারের পাখির ডাক শুনে এ-পারের পাখি উড়ে যায়। একজনের ডাকে আরেকজনের মনের আকাশ অসহ্য আনন্দে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ হয়ে ওঠে। একজনের প্রাণান্ত ডাক দূর যোজন পথকে কাছে এনে দেয়। একজনের পিপাসা আরেকজনকে পিপাসিত করে তোলে। না ডেকে উপায় আছে? এ-তো তোমার আমার ডাক নয় এ অসীমতার ডাক। এ অদৃশ্যের ডাক।

বিভা হঠাৎ থেমে গেল। নিজের মনেই সে হেসে উঠল। তাকে যেন কেমন উদাসীন ও অন্যমনস্ক মনে হল। সে থেমে গেছে তবু তার ঠোঁট-দুখানি মৃদু মৃদু কাঁপছে। সে যেন নিঃশব্দে কি আবৃত্তি করছে। কালো টানা ভুরু দুটি অসহিষ্ণু, দুই চোখে অবিচল শুভ্রতা, মুখজুড়ে পাণ্ডুর বিবর্ণতা। সে যেন হঠাৎ তার অতীতের দুর্ভেদ্য অরণ্যে ঢুকে পড়েছে। চোখে পড়েছে তার ব্যর্থ জীবনের বেদনাময় নিস্ফলতা।

কেশর আর দেবশ্রী রুদ্ধশ্বাসে তার মুখের পানে চেয়ে আছে। তারা চমকে গেছে তার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখে।

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে নিজেকে সোজা করে বিভা বললে, নিজের অন্তরের সত্যকে গোপন করার বিপদ আছে বই কি!

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তার হাসবার চেষ্টাকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এল।

কেশর আর দেবু মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। দেবু অতর্কিতে বিভার হাত দুটি ধরে স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বলে উঠল, বলো বিভাদি, শোনাও তোমার সত্য গোপন করার বিপদের কাহিনীটা। তোমার অন্তরের গোপন সত্য হলেও ভাইয়ের কাছে বা তোমার এই প্রিয় ছাত্রীটির কাছে বলতে নিশ্চয়ই দ্বিধা করবে না।

কেশর মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, এবার আর নিস্তার নেই বিভা-দি। কঠিন পাল্লায় পড়েছো।

বিভা কিন্তু ভীষণ লজ্জা পেল। তার সারা মুখখানা আকর্ণ রাঙা হয়ে উঠল। আবেগের প্রাবল্যে সে হঠাৎ আত্মোদ্ঘাটন করে বসেছে। দেবশ্রীর চোখে ধরা পড়েছে তার প্রকাশের দুর্বলতা।

কেশর বললে, তুমি রেডি হও বিভা-দি। আমি নানীকে বলি আমাদের আর এক প্রস্থ চায়ের ব্যবস্থা করতে।

বিভা মনে মনে ছটফট করতে লাগল।

দেবশ্রী বললে, মনের ভার নেমে যাবে বিভা-দি। গল্পটা শোনাও আমাদের। অন্ধদের আলো দেখাও।

বিভার অলক্ষ্যে কেশর দেবুর গায়ে চিমটি কাটল।

দেবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, অন্ধ জাগো।

কেশর চা ঢালতে ঢালতে বললে, প্রেমের গল্প পেলে দেবু আর কিছু চায় না।

—এটা যে প্রেমের গল্প শোনবার বয়স।

—শোনবার এবং শোনাবার।

দেবু উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বলল।

কেশর আর বিভা একসঙ্গে হেসে উঠল। দেবু একটা চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বললে, আর কালবিলম্ব নয়। আরম্ভ করো বিভা-দি!

কেশর চোখের কোণে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বললে, সাধে বলি পাগল!

দেবু নিঃশব্দে তার পানে চাইল।

বিভা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কোন ভূমিকা না করেই বললে, প্রেম পুরুষের সমগ্র জীবনের একটা অংশ, নারীর সমগ্র জীবন। তার অস্তিত্ব। তার প্রাণের চেয়ে বলশালী। তার জীবনের চেয়ে শক্তিমান। যে-দিন থেকে সে বুঝতে শেখে সেইদিন থেকেই সে প্রেমসুন্দরের আগমন প্রত্যাশায় নিজেকে সুন্দর করে রচনা-করে, দেহে ও মনে। উচ্চারণে ও অনুভবে। কবে কখন অতর্কিতে কোনদিক দিয়ে তিনি আসবেন তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে চেতনার সমস্ত দোর জানলাগুলি খুলে হৃদয়াঙ্গনে সুন্দরের উপযুক্ত আসন পেতে অপেক্ষা করে। নিজেকে সুন্দরতর করে তোলে। তারপর একদিন আকস্মিক ভাবে সুন্দরের আবির্ভাব হয়। ধ্যানাবিষ্ট চোখে সে তার অতিথির ধ্যানরূপ প্রত্যক্ষ করে। তার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে। এই

হলো নারীর প্রকৃতিগত প্রেমের অনুধ্যান। এই হলো নারী সত্তা।...

সতেরো বছর বয়সে আমি অনুভব করলুম আমার রক্তের মাঝে তার আবির্ভাবের অগ্নিময় আক্ষেপ। শুনতে পেলুম তার দৃপ্ত তেজোময় পদক্ষেপ। চোখ মেলে তাকালুম। স্বাগত জানাবার জন্য দুহাত প্রসারিত করে দিলুম। যে আমার হাত ধরল, যে প্রেমসুন্দরের অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল তার নাম তাপস। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। অজানা অচেনা না হলেও দুজনে নতুন করে পরিচয় হলো। মুখের পরিচয় চোখের পরিচয় হৃদয়ে বাসা বাঁধলো। সতেরো বছরের মেয়ে তেইশ বছরের প্রিয়দর্শন ছেলে। কাছে এলেই বাতাস বিদ্যুৎ চকিত হয়ে উঠতো। গোধূলির আকাশ থেকে সোনার আলো ঝরে পড়ে তাকে আরো সুন্দর করে তুলতো। তার দৃষ্টির আলো আমার সর্বাঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করতো। আমি দৃষ্টির পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে তাকে নিঃশব্দে আরতি করতুম।...

বিভা হঠাৎ থেমে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেশর ও দেবুর মুখপানে চেয়ে যেন তার বিবৃতিকে সংক্ষেপ করে বললে, স্বীকার করতেই হবে তাকে আমি ভালো বেসেছিলুম। সেই আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা। মনে হতো সে-ও আমাকে ভালো-বেসেছে। আমাকে দেখবার জন্য ছুটে ছুটে আসতো। দেখে খুশি হতো। তার চোখে মুখে উপচে পড়তো খুশির মধুর হাসি।...

...তার মুখে সত্যের আলো দেখেছি। নিজের অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করেছি। তবু আমরা নিজেদের উচ্চারণ দিতে পারলুম না। অন্তরের সত্যকে প্রকাশ করতে পারলুম না, লজ্জায়।

...তাপসেরি বন্ধু এলো তাপসের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে। বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া মেয়ে। আমাকে দেখেই সে পছন্দ করলো এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল অভিভাবকের মারফতে।

আমার অভিভাবকেরা হাতে স্বর্গ পেল। ভালো ছেলে। স্বাস্থ্যবান সচ্চরিত্র। সরকারী চাকুরে। পুলিশের ইনসপেকটার। আর কি চাই? গেরস্ত ঘরের মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট সুপাত্র। সুপাত্র নিঃসন্দেহ।···নিয়তির অমোঘ বিধানে কেশবের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। হ্যাঁ, আমার স্বামীর নাম ছিল কেশব।

···তাপস আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে রইল। তাপসের আমি বন্ধুর পত্নী। স্বর্গোদ্যানের নিষিদ্ধ ফল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো যেন তাপসের নির্বন্ধেই আমাদের বিয়ে হলো। আমার মাঝে মাঝে রাগ হতো, কিন্তু নিজের বিয়ের ব্যাপারে মুখ খোলা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। ঔৎসুক্য দেখানো নির্লজ্জতা। কাজেই নিঃশব্দে গলায় ফাঁশ পরতে হলো।

···অমোঘ ঘটনা-শৃঙ্খল। ভাগ্যের সঙ্গে বিরোধ করে লাভ নেই। নতি স্বীকার করাই বিধেয়। আর তাই করে আসছে এ-দেশের মেয়েরা চিরকাল। জীবনটা তো স্বপ্ন নয়। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে স্বামীর অনুগত হয়ে উঠলুম। ডানা গুটিয়ে স্বামীর সঙ্গে নীড় রচনা করলুম। স্বামীকে ভাল বাসলুম কিনা বুঝলুম না তবে তার প্রতি একটা মধুর মমতা জন্মালো। বাঙালী মেয়েদের নিজেকে পুরুষের উপযোগী করে তোলবার ক্ষমতা অদ্ভুত। যেখানেই যার সঙ্গে তার বিয়ে হোক সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভাববে। ভাববে এ ছাড়া আর কিছু হতে পারতো না।

আমিও নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবলুম। স্বামীর অপরিসীম স্নেহ অত্যধিক আদর-যত্ন, অকুণ্ঠ প্রেম আমাকে জয় করে নিল। আমিও প্রাণপণে তাকে সুখি করবার চেষ্টা করলুম।··

থানার কোয়ার্টার। আমরা দুটি প্রাণী। অবাধ উন্মুক্ত, জীবনের আকাশ। কোথায় দেয়াল নেই। নিচে আপিস। অবসর পেলেই ওপরে উঠে আসে। মুখে হাসি। চোখে তৃষ্ণা। আমারো ভাল লাগতো তার সান্নিধ্য। তরুণ রক্তে দোলা লাগতো।

তাপস আসতো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। স্বামীই তাকে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনতো। কাজে ব্যস্ত থাকলে একা তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিত। তার মনে কোন মেঘ ছিল না। সংশয়ের কালো ছায়া ছিল না।

স্বামীর বন্ধু। তাপসকে হাসিমুখে আদর অভ্যর্থনা করতে হতো। মনে কোন দ্বিধা ছিল না। কুণ্ঠা ছিল না। মনের মাটি অনেকটা শক্ত হয়ে উঠেছিল। তাপসও অত্যন্ত সংযত ও দৃঢ় চরিত্র। তার মাঝে কোন আবেগ উচ্ছ্বাস ছিল না। অধীরতা আকুলতা ছিল না। মনে যাই থাক বাইরে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ ছিল না। তাদের দুই বন্ধুর মনের আকাশে ছিল না অবিশ্বাসের কুয়াশা। তা ছাড়া আমার স্বামীর মনের আকাশ ছিল উদার ও অবারিত। একা তাপস নয় তার অন্যান্য বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গেও আমার মেলামেশা সে পছন্দ করতো। আসলে সে তার শিক্ষিতা স্ত্রীকে আধুনিক নব্য তন্ত্রের স্বাধীনা বলে পরিচয় করাতে চেয়েছিল। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেড়াবার একটা দারুণ শখ ছিল। আমার বেশ-বাসেও তেমনি একটা নতুনত্বের আভাস ফুটিয়ে তুলতে চাইতো। আমাকে রীতিমত সৌখিন করে তুলেছিল।

··একটি বছর আমাদের পরমানন্দে কাটল। পুরুষের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার একটা মত্ততা প্রত্যেক মেয়েকে পেয়ে বসে বিয়ের পর। তার সমস্ত সত্তাজুড়ে ঐ একটি মাত্র চিন্তার আলোড়ন চলতে থাকে। পুরুষের সঙ্গে মিলনের চিন্তা। সে রীতিমত একটা অনুষ্ঠান। একটা তপস্যা। তার জন্যে মেয়েরা নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকে। দেহকে পালিশ করে সুন্দর করে সাজায়। কর্মে ও আচরণে স্বামীকে সুখি করবার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়। যেন কোন দিক দিয়ে পুরুষকে হতাশ হতে না হয়। আমারো সে চেষ্টার অবধি ছিল না। কিন্তু তাকে সুখি করতে

পারতুম না। পারতুম না তার পিপাসা মেটাতে। নিজেও অসুখি হতুম তার জন্যে। মাঝে মাঝে আমার কান্না পেতো।

...একদিন সে আমায় বলে বসলো, তুমি আমায় ফাঁকি দাও। তোমার মন অন্য পুরুষের আশ্রয়ে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। লজ্জায় মর্মাহত হলুম।

...বুঝতে বাকি রইল না স্বামী আমার ওপর বিরূপ। সময়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলুম।

সেদিন তাপসের বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন ছিল। আমি সাজপোশাক করে ওর অপেক্ষা করছিলুম। ওপরে এসেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখে বলে উঠল, তাপসের জন্যে যেমন করে তুমি সাজো আমার জন্যে তেমন করে সাজো না। আমার রাগ হলো, বললুম, এই যদি তোমার মনের কথা হয় আমি তাপসের বাড়ি যাবো না। আর তাপসকে তুমি এখানে আসতে মানা করে দেবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে যাচ্ছিলুম ও আমার হাত-ধরে মাপ চাইল। প্রতিশ্রুতি দিল ও রকম ঠাট্টা আর কখনো করবে না।

নেমন্তন্ন গেলুম তাপসের বাড়িতে কিন্তু ওকে যেন অত্যন্ত উদাসীন আর অন্যমনস্ক মনে হলো। কী যেন একটা আলোড়ন চলছে ওর মনের গভীরে। ওর মুখের রক্ত উবে গেছে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারলুম না। তাপসের বাড়িতেও সে তেমনি পাথরের নিরেট দেয়ালের মত মুখ করে বসে রইলো। আনন্দ হাসিখুসিতে যোগ দিতে পারল না। লক্ষ্য করে দেখলুম মাঝে মাঝে সে হিংস্র দৃষ্টিতে তাপসের পেছনে তাকাচ্ছে। তার কালো চোখে একটা যেন কিসের আক্রোশ ফেটে পড়ছে।

...ফেরবার পথে গাড়িতে উঠেই বিরক্তিভরা কণ্ঠে সে আমায়

বললে, তোমার আমোদ আর ফুরোতে চায় না। এই দিল-খোলা হাসি আর তাজা প্রাণের সাড়া যদি এ অভাগার অদৃষ্টে একদিনও জুটতো! আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, এ-সব কি তুমি বলছো? তোমার হলো কি?

—আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবার তোমার সময় আছে কি? মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি।

—-আমি জানবো কেমন করে তুমি না বললে।

আমি হাতখানা তার কপালে রাখতে গেলুম। হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিলে।

বাড়ি ফিরেও সেই ছেলেমানুষী ঝগড়া। তাপস আর তাপস। তাপসের কাছে আমি বেশি হাসি। সে হাসির না কি রূপ আলাদা। সে মুখের হাসি নয়। সে আত্মার হাসি। আমাকে দেখলে তাপসের চোখ দুটো নাকি অগ্নিদীপ্ত হয়ে ওঠে। তার মুখের ভাব বদলে যায়। আমি বললুম, বেশ। তুমি না পারো আমিই তাকে কাল বলে দেবো সে যেন এখানে আর না আসে বা আমাদের সঙ্গে কোন সংশ্রব না রাখে।

—হুঁ! তাই করতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই। তাপসের হাত ধরে তুমি আধঘন্টা কোথায় ডুব মারলে কেউ জানতে পারল না। লজ্জার কথা। লোকে ভাবে কি?

আমি অপমানে, অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম। বললুম, তোমার প্রাণের বন্ধু তাসপকে জিজ্ঞেস করলে না কেন আমাকে আধঘন্টা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল সে? সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার বোনের কাছে। বোন এসেছিল শ্বশুর বাড়ি থেকে। তারা আমাকে আটকে রাখল।

আমাদের শোবার ঘরে দুটো সিঙ্গেল খাটে দুটো বিছানা শিয়রে দুটো বিছানার মাঝখানে একটা ড্রেসিং টেবিল। সে কাপড় জামা ছেড়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমিও আলোটা

নিবিয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লুম। রাগে, অভিমানে তার বিছানায় গেলুম না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ও তুজনে কিছুক্ষণ বচসা হলো। একটু পরে সে হঠাৎ আমার বিছানায় এসে বসল। আমি রাগে অন্ধ হয়েছিলাম। আমি চিৎকার করে উঠলুম, না, না। তুমি আমায় ছুঁয়োনা। আমার গায়ে হাত দিয়ো না। আমি অশুচি। আমি অবিশ্বাসিনী। আমার মুখের তোড়ে সে ভেসে গেল নিজের বিছানায়। কোন কথা বললে না। আমি শুয়ে শুয়ে কাঁদলুম। এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাপস আমাদের মাঝে দেয়াল তুলে দিচ্ছে।···কাঁদতে কাঁদতে কখন তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল একটা খসখসানি শব্দ শুনে। আমি স্থির হয়ে শুনলুম। ড্রেসিং টেবিলের টানা থেকে কি যেন বের করছে। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হলোঃ ভগবান আমার ভালবাসাকে তুমি অভিসম্পাত দিলে। হঠাৎ মনে পড়ল, ড্রয়ারে ওর রিভলভার আছে। আমি চমকে উঠে বসলুমঃ কী করছো তুমি? কোন উত্তর এলো না। আমি ত্র্যস্তে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলুম। আলো জ্বলার সঙ্গে রিভলভারটা নিজের রগের ওপর টিপে ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আমি মেঝের উপর মূর্চ্ছিতা হয়ে গেলুম।···

কেশর ও দেবশ্রী একসঙ্গে চাপা আর্তনাদ করে উঠল।

॥ সতেরো ॥

কলকাতার একটা বে-সরকারী কলেজে দেবশ্রী প্রফেসরী করছে আর তবলা বাজাচ্ছে। সঙ্গীত সমাজে তার প্রচুর খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়েছে। দেবিকার বিয়ে হয়ে গেছে। সে বর্ধমানে। স্বামীর কাছে। বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেছে। একা দেবিকা যেন বাড়িটা ভরে ছিল। ছোট-মা একা বাড়ির মাঝে টিম-টিম করছে। যেন পোড়ো বাড়ি। বাড়ির মাঝে প্রাণের সাড়া নেই। একটা অকুল স্তব্ধতা যেন বাড়িখানার প্রাণবায়ু শুষে নিচ্ছে।

সারা দুপুর ছোট-মা বাড়িতে একা। বাবা যায় আপিসে আর দেবু কলেজে। ছোট-মা ক্লান্ত হয়ে দেবুকে নালিশ জানায়, এই নিঝুম পুরীতে একা একা আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কেলে গোলার ডাক শুনে আর কাক তাড়িয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠি। কলেজ থেকে এসে দেখবি কোন দিন মরে পড়ে আছি।

দেবু মুখ টিপে তার পানে চেয়ে হাসে।

ছোট-মা বলে, হাসির কথা নয় দেবু। নিজের পেটে তো হলো না। তোদের ভাই বোনকে নেড়েচেড়েই তো জীবন কাটালুম। তুই বিয়ে-থা কর। তোর বউ-ছেলে নিয়ে দু-দিন সখ-সাধ মেটাই।

দেবু মাথা নেড়ে বলে, বেশী সখ সাধ ভালো নয় গো ছোট-মা। শেষে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবে। অশান্তির উপদ্রবের চাইতে শান্তির নীরবতা ভালো। বেশ তো আছি মায়ে ছেলেয়।

—তা বলে মায়ের জন্যে কি তুই সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি নাকি? না বাপু, আর ভালো লাগেনা। ভালো দেখায় না।

দেবশ্রী হাসতে হাসতে বলে, আচ্ছা ছোট-মা, আমি যদি কোন

অবাঙালী গাইয়ে মেয়েকে বিয়ে করি তোমরা তাকে বউ বলে ঘরে তুলে নেবে?

ছোট-মা তার মুখের পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, তুই ভেতরে ঐ রকম একটা কি করছিস বুঝি?

দেবু তার মুখপানে না চেয়েই বললে, না এখনো কিছু করিনি তবে যদি করি—তোমাদের মনোভাবটা জেনে রাখা ভালো।

ছোট-মা হাসতে হাসতে বললে, দেবি ঠিক বলতো—

—কী বলতো?

—বলতো দাদা একটা কাণ্ড করবে দেখো।

দেবু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে ছোট-মার হাত ধরে বললে, কোন ভয় নেই ছোট-মা, এমন কোন কিছু করবো না যাতে আমাদের বংশের অমর্যাদা হয়। যাতে তোমাদের মনে ব্যথা লাগে।

ছোট-মার চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। সে দেবুর চিবুক ধরে আর্দ্র কণ্ঠে বললে, আমি তা জানি বাবা। তুমি আমাদের সে ছেলে নও।

—না ছোট-মা। তোমাদের মনে ব্যথা দিয়ে কি আমি সুখি হতে পারবো?

ছোট-মার চোখ দুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বললে, শোন দেবু, আমাদের মুখ চেয়ে নিজে যেন ভুল করিস নে। কোন ভয় করিস না। যাকে পেলে নিজে সুখি হতে পারবে—তোমাকে পেলে সুখি হবে এমন যদি কারুর দেখা পেয়ে থাকো তবে নির্ভয়ে আমাকে জানিয়ো আমি তোমার বাপের মত করিয়ে নোব।

দেবুর মনের মাটি ভিজে ফেঁপে ফুলে উঠল। সে নিজেকে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরিয়ে নিল।

পাগল বই কি! কেশর ঠিকই বলে। নইলে বিয়ের কথা

হলেই কেশরকে তার মনে পড়ে কেন? কেশরকে সে বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখে নাকি? মমে মনে তার হাসি পায়। সে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে কেশরকে নিজের স্ত্রীরূপে কল্পনা করে।

উদ্ভট কল্পনা। এই সঙ্কীর্ণ সংসারের নিভৃতিতে কেশরকে নিজের বধূরূপে কল্পনা করা যেমন হাস্যকর তেমনি যন্ত্রণাদায়ক। কোন দিক দিয়েই নিজের এই সংসারের সঙ্গে সে খাপ খায় না। রাজ-সংসারে, রাজ-অন্তঃপুরের বধূরূপে তাকে কল্পনা করা চলতে পারে, কিন্তু এখানে তাকে জীবন্তে কবর দেওয়া হবে। তা ছাড়া তার বধূরূপ তার প্রতিভার অন্তরায়। কেশরকে বধূরূপে কল্পনা করা চলে না। কেশরকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখা ধৃষ্টতা। কেশর তাকে স্নেহ করে, হয়তো ভালবাসে, কিন্তু তাই বলে তাকে সে বিয়ে করবে না কি? বউ সেজে তার ঘর করতে আসবে নাকি। বেছে বেছে স্বপ্ন দেখারও বাহাদুরী আছে। দেবশ্রীর হাসি পায়। মনে মনে লজ্জাও হয়। কেশর তার প্রিয়া হতে পারে। প্রেয়সী হতে পারে। তার গীত সাধনার সাথী হতে পারে। তার প্রাণের উৎসবে তার সংসার-সাধনার সঙ্গিনী হতে পারে না। তার পৃথিবী আলাদা। তার রক্তের ছন্দ আলাদা। তার জীবনের শ্রুতি আলাদা। ধৃতি আলাদা।

না না। কেশরের কাছে সে কোন অশোভন দাবি করবে না। সে নির্মলতায় নিষ্ঠুর। সেই নিষ্ঠুরতাই তার জীবনের মহত্ত্ব। তার নারীত্বের নিরঙ্কুশ নির্ভর। দেবশ্রী তার সেই অনাবিল স্তব্ধতাকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের আবর্তে ঘোলা করে তুলতে পারবে না। তাদের দুটি মনের এই আত্মিক অন্তরঙ্গতাকে সে কামনা-ফেনিল করে তুলতে চায় না।

কেশর স্বপ্ন হয়েই থাকুক। যা পেয়েছে তার ঊর্ধ্বে সে হাত বাড়াতে চায় না। যা পেয়েছে তা সে হারাতেও পারবে না।

তাকে সে তার প্রেমের ধ্যানমূর্তি করে চিরকালের স্তব্ধতায় রেখে দেবে। তার তপস্যা ভাঙাবে না।

বাড়ি ঢুকেই দেবশ্রী চমকে গেছে।

তার কলেজের ব্রাহ্ম অধ্যক্ষ এসেছে তার বাড়িতে—তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। এত বড় বিস্ময়ের জন্য দেবশ্রী বেচারী মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

রবিবার। একটু শখ করে খাওয়া-দাওয়া করবার জন্য সে রবিবারে নিজে হাতে বাজার করে।

বাজার থেকে ফিরে ছোট-মার মুখে এই অসাধারণ সংবাদটা শুনে তার শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল। তবে শুভাগমনের কারণটা সঙ্গে সঙ্গেই ছোট-মা তার প্রশ্নের মধ্যে ব্যক্ত করে দিল: ওঁর একটি মেয়ে আছে দেখেছিস?

দেবু উত্তর দিল, লতা—সুলতা, কেন?

—দেখেছিস মেয়েটিকে?

—দেখেছি গো। সেই যে সে-দিন জন্মতিথি উৎসবে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল। উপহার কেনবার জন্যে তোমার কাছে টাকা চেয়ে নিলুম।

—কেন কি হয়েছে তার?

ছোট-মা প্রশ্ন করে, কেমন দেখতে রে?

—দেখতে যেমনই হোক। কিন্তু হলো কি তার?

ছোট-মা তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বললে, তুই আগে বোস। এক ঢোঁক গরম চা খা। তারপর সব বলছি।

দেবু কোঁচার খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে বললে, চা খাচ্ছি। কিন্তু দয়া করে আগে বলো ছোট-মা ব্যাপারটা কি?

দেবুর সামনে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে বললে, আমি তো সব জানিনা বাছা। তোর বাপ চায়ের কথা বলতে এসে বললে,

উনি তোকে জামাই করতে চান। বলে, ছেলেটিকে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিন আমি দুজনকে একসঙ্গে বিলেত পাঠিয়ে দিই।

দেবু হেসে উঠল ঃ হয় তুমি শুনতে ভুল করেছো নয় বাবা বলতে ভুল করেছে। কী বলছো তুমি? লতা বিয়ে করবে আমাকে? তার বাবা-মা রাজি হবে আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে? এযে আরব উপন্যাসের গল্প শোনাচ্ছ।

দেবুর হাসি থামে না। বিস্ময়ের ঢেউ কাটে না। ছোট-মা ধমক দিয়ে বললে, ওরে হতভাগা, আমি যা বলছি তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। তা নইলে আমাদের বাড়ি বয়ে এসেছে কি জন্যে?

দেবু বললে, তুমি জানোনা ছোট-মা, লতার বিয়ের পাত্র ঠিক আছে। বিলেতে ব্যারীষ্টারী পড়ছে। পাশ করে ফিরে এলেই বিয়ে হবে।

—তা জানি না বাছা। তবে তোমার বাবা যা বললে, তাই শুনলুম।

দেবশ্রী হঠাৎ কি ভাবলে। তারপর বললে, আমি এখন একটু গা-ঢাকা দিই। এসে, বাকিটা তোমার কাছে শুনবো।

মুখ টিপে হাসল ছোট-মা।

অধ্যক্ষ ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে অশ্বিনী হাসতে হাসতে স্ত্রীকে এসে বললে, বি-এ পাশ মেয়ে। বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাইকে একসঙ্গে বিলেত পাঠাতে চায়। মেয়েকে তো দেবু দেখেছে।

—দেবু বলছিল ওরা ব্রাহ্ম। আর মেয়ের নাকি বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। পাত্র বিলেতে পড়ছে। ফিরে এলেই বিয়ে হবে।

হাসল অশ্বিনী নিঃশব্দে।

—কী হাসছো যে?

অশ্বিনী স্মিতমুখে বললে, সবই তো ঠিক ছিল। দেবুকে দেখে, তার সঙ্গে আলাপ করে, মেয়ের মত গেছে বদলে। বয়স্থা শিক্ষিতা

মেয়ে তার মনকে তো বাতিল করা চলে না। বাধ্য হয়ে বাপকে ছুটে আসতে হয়েছে।

গৌরবের হাসিতে মুখখানি ভরে গেল ছোট-মার ঃ ছেলে যে আমার রাজ পুত্তুর! মেয়ে-ভোলানো চেহারা!

অশ্বিনী বললে, ছেলেটার ভবিষ্যৎ—তাই আমি ভাবছি। ব্রাহ্ম হলেও হিন্দু মতে বিয়ে দিতে পর্যন্ত রাজি।

—তা তুমি কী বললে?

ঘাড় নেড়ে অশ্বিনী বললে, না গো, কথা কিছু দিইনি। ছেলের মত না জেনে কোন কথা দিতে পারি?

—মেয়ের তো ছেলেকে পছন্দ, কিন্তু ছেলের মেয়ে পছন্দ কিনা আগে জানতে হবে।

—আমার মনে হয় দেবুরও পছন্দ। মেয়ে কি আর দেবুর মন না জেনেই মা-বাপকে বলেছে? দেবু যদি 'না' বলে মেয়েটা যে মর্মাহত হবে।

চোখে ঝিলিক দিয়ে মৃদু হাসল ছোট-মা। জিজ্ঞেস করলে, তোমার মনের কথাটা কি?

হাসল অশ্বিনী ঃ আমার আবার মনের কথা কি? ছেলে যাতে সুখি হবে তাই করতে হবে।

—তবু তোমার স্বাধীন মনের অভিপ্রায়টা কি? আমাকে বলবে তো। দেবু না হয় নাই জানলো।

একটা হাসির ঢেউ তুলল ছোট-মা।

মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশ্বিনী বললে, তাঁর যা অভিপ্রেত তাই হবে। তোমার আমার চেষ্টায় কিছুই হবে না।

একটু থেমে এ-দিক ও-দিক চেয়ে অশ্বিনী বললে, তবে এ বিয়ে হলে, ছেলের বিয়ে আর হবে না। দেবির মতো আরেক মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে। দেবিকে যেমন নিঃস্বত্ব হয়ে অনিমেষের হাতে

সম্প্রদান করে দিয়েছি এ-বিয়েতেও তেমনি দেবুকে এই মেয়েটির হাতে সমর্পণ করে দিতে হবে।

অশ্বিনী হেসে উঠল : তুমি যে বউ নিয়ে দু-দিন শ্বাশুড়ীগিরি ফলাবে বা বউ ঘরে এনে শখসাধ মেটাবে সে হবে না।

অশ্বিনীর গলার স্বরটা ভারি হয়ে এল। ভারাতুর গলায় আচ্ছন্নের মত বললে, আমার জীবনে কোন বড়ো স্বপ্ন নেই। কোন প্রত্যাশা নেই। আমার অবর্তমানে ভাবনা শুধু তোমার জন্যে। দেবুর আশ্রয় তোমার জন্য অবারিত আছে জানতে পারলেই আমার আর চিন্তার কোন কারণ থাকে না।

ছোট-মা নিঃশব্দে স্বামীর চিন্তাকুল মুখের পানে চেয়ে রইল। কোন কথা বললে না।

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে অশ্বিনী হেসে উঠল। বললে, কিন্তু সেটাকে তো বড়ো করে দেখা চলে না। এ-যুগে অন্ততঃ চলে না। এখন দেখতে হবে ছেলেমেয়ে সুখি কিসে? পরের মেয়ে আমার ছেলের জীবনে এসে সুখি হতে পারবে কিনা, আর ছেলে আমার সেই মেয়েকে পেয়ে সুখি হবে কিনা। এ ছাড়া আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। তারপর তাদের কর্তব্য তারা করবে। আমি আমার ছেলে বউয়ের কাছ থেকে অধিকার বা দাবি হিসাবে কোন বৃহত্তর প্রাপ্তির আশা করি না। না ভক্তি-শ্রদ্ধা, না সেবাযত্ন। তাদের সুখি দেখলেই আমি সুখি হবো। তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখলে তাদের গৌরব করবো। আমার ছেলে বউ, আমার মেয়ে জামাই-এর জন্য আমার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ আলো বাতাসের মত তাদের ঘিরে থাকবে তাদের হাত পেতে কোনদিন চাইতে হবে না।

ছোট-মা ঝলসে উঠল, তা কি আমি জানি না? তোমাকে নিয়ে এতোকাল ঘর করলুম আর তোমাকে আমায় মনের কথা বুঝিয়ে বলতে হবে? কিন্তু তোমার মনের কথার সঙ্গে যে মুখের কথার মিল খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাকে যেন কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে।

—আমার মনের দৃষ্টি কোন দিকে বুঝতে পারছো না বলেই আমাকে ঝাপসা মনে হচ্ছে।

হাসল অশ্বিনী।

ছোট-মা বললে, তোমার হেঁয়ালি রেখে আমায় স্পষ্ট খুলে বলো, কী ভাবছো তুমি।

—আমি ভাবছি মেয়েটার কথা। ব্রাহ্ম ঘরের বি-এ পাশ মেয়ে। অভিজাত সমাজে চলাফেরা করেছে। নিজেদের সমাজের অনেক শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। তা ছাড়া একজনের বাকদত্তা। ছেলে বিলেতে লেখাপড়া শিখছে। সেই মেয়ে হঠাৎ মনোনীত করল আমাদের দেবুকে। মনোনীত করেই ক্ষান্ত হলো না। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই সে লজ্জার মাথা খেয়ে বাপ-মাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল তার মনের অভিলাষ। সে মেয়ে মনে মনে সঙ্কল্প করবার পূর্বে বা বাবা-মাকে নিজের মনের গোপন কথা ব্যক্ত করবার আগে অবধারিত দেবুর সমস্ত খবর সে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেছে এবং দেবুর সঙ্গে আলাপ করে তার স্বভাব ও মনের পরিচয় পেয়েছে তবে না সে মনকে গুছিয়ে নিজেকে শক্ত করে তুলেছে। এখন বুঝতে পারছো আমার মনের দৃষ্টি কোথায়? আমি চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করছি মেয়েটার মনের চেহারাটা। ওর মনে সত্যিকার আলো জ্বলেছে। এ আলো ওকে নিবিয়ে দিতে হলে ওর প্রাণের আলো নিবে যাবে। ওর বুক ভেঙ্গে যাবে।

চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে হাসতে হাসতে ছোট-মা বললে, মেয়ে মনের কথা তুমি বোঝ নাকি?

—একটা নয়, দু-দুটো মেয়ে বুকের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে গেল তবু বুঝবো না?

হাসল ছোট-মা। বললে, দেবুর পছন্দ হলে তুমি তাহলে বিয়ে দিতে রাজি আছো? ব্রাহ্ম বলে তোমার কোন আপত্তি নেই?

—তুমি কি বলো? মেয়েটার মুখ চেয়ে কোন আপত্তি করা কি উচিত?

গলায় জোর দিয়ে ছোট-মা সজ্ক্ষিপ্ত উত্তর দিল, না।

অশ্বিনী আশীর্বাদের ভঙ্গিতে গাঢ়স্বরে বললে, ওরা সুখি হোক। ওদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

মৃদু হাসল ছোট-মা। বললে, দেবু কি তার মনের কথা আমাকে খুলে বলবে?

দেবু বলবে কি? দেবু নিজেই তাজ্জব বনে গেছে। দেবুই তো শুনতে চায়। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যোপান্ত ছোট-মার কাছে জেনে নিল। তার মনে হলো সে রূপকথার গল্প শুনছে। রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভার দ্বারীর গলায় মালা দিচ্ছে।

ব্যাপারটা অনেকটা সেই ধরণের। তেমনি বিস্ময়কর। তেমনি চমকপ্রদ।

সুলতা। সজ্ক্ষেপে লতা।

বর্ষার লতার মতই সর্বাঙ্গে যৌবন সমারোহ। উদ্ধত, গর্বী ও অহঙ্কারী বলেই মনে হয়েছিল দেবশ্রীর। নিজের সম্বন্ধে তার উচ্চ ধারণা। নিজেকে সে রূপসী ভাবলেও দেবুর মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি আসলে দেবু তাকে সে-চোখ দিয়ে দেখেনি। মন ছিল তার সম্পূর্ণ উদাসীন। তার মনে ছিল না কোন ঔৎসুক্য কোন সন্ধান। অধ্যক্ষের কন্যা। তাকে সে সম্ভ্রমের চোখে দেখেছিল। সঙ্কোচের সঙ্গে তার সঙ্গে পরিচয় করেছিল। তাদের সেই ক্ষণ পরিচয়ের মধ্যে ছিল না কোন প্রীতির উচ্ছ্বাস, ছিল না কোন বিশেষ অনুমোদন। তাদের সান্নিধ্যের মাঝে ছিল না কোন অধীরতা মদিরতা। বড় জোর বার দুইতিন তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। তার মাঝে তো অন্য কোন প্রেরণা ছিল না।

সুলতার আচারে ব্যবহারেও এখন কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়নি যে তার সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠবে।

দেবশ্রী অবাক হয়ে ভাবে আর মনে মনে হাসে। তার মাঝে এমন কি দেখল সুলতা, এমন কি খুঁজে পেল যা তার কুমারী মনকে এমন ভাবে বিপর্যস্ত করে তুলল। সে যেন দৈবাৎ ঝড়ের দাপটে দিশাহারা হয়ে যে-কোন একটা বন্দরের নিরাপদ আশ্রয়ে এসে মাথা গুঁজতে চাইছে।

এ কি প্রেম? এই কি প্রেমের সত্যকার চেহারা? এত দুর্বার আর এত দুঃসাহসী! এত নির্লজ্জ আর এত অসহিষ্ণু?

দেবশ্রীর কেমন বিসদৃশ মনে হয়। কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে।

এ কি তার রূপের আকর্ষণ?

সে রূপবান। কিন্তু নারীর চোখে বিত্তহীন পুরুষের রূপের নাকি মূল্য নে-ই।

না। কিছুতেই সে সুলতাকে বুঝতে পারে না। কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই সুলতা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট নয়। সাধারণ চলতি জীবনের সঙ্গে কোনদিক থেকেই তার সামঞ্জস্য নেই। কিংবা মেয়েদের প্রেমকে অনুভব করবার যোগ্যতা হয়তো দেবশ্রীর নেই।

দেবশ্রী আচ্ছন্নের মত অভিভূতের মত তন্ময় হয়ে সুলতাকে ভাবে।

সুলতা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তার অনুভবের আকাশে সুলতা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ ধরণের চিন্তাকেও সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। এ চিন্তা সৌজন্যবিরোধী। এ চিন্তা নীতি-বিগর্হিত।

কেশরকে ছাড়া জীবনে সে নিভৃতে অন্য কোন মেয়েকে চিন্তা করেনি। আর কোন মেয়ে তার মনে মোহ বিস্তার করেনি।

একটা অবাঞ্ছিত উপদ্রবের মতই সুলতা তার মনকে আলোড়িত করে তুলেছে! তার যৌবনকে উত্তেজিত করেছে। সুলতার মত মেয়ে যদি দুম করে বলে বসে, আমি তোমাকে ভালবাসি তুমি

আমাকে নাও, কোন ছেলে না চঞ্চল হয়ে ওঠে। কার রক্ত না তেতে ওঠে, কার হৃদস্পন্দন না বেড়ে যায় ?

উত্তেজনা হয়তো বা ক্ষণেকের, কিন্তু কৌতূহল যে মনের মাঝে শিকড় নামিয়ে দেয়।

সুলতা তাকে বিয়ে করতে চায় এ-কথা ভাবতে যেমন আত্ম-প্রসাদে মন ভরে যায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল প্রশ্ন করে ওঠে, কিন্তু কেন ?

এই 'কেন' তার মনের মাঝে অভ্রভেদী হয়ে ওঠে। সমুদ্রের মত ফেনিল ও উত্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। এই কেন-র উত্তর খুঁজতে গিয়ে সুলতাকেই সে দেখতে পায়। সুলতা তার সামনে এসে দাঁড়ায় নতুন রূপে, নতুন রঙে। তার জন্মতিথি উৎসবে সে বেশ সেজেছিল। সে মনে করতে চেষ্টা করে সে-দিনের তার সরু কাজল-আঁকা চোখ। তার ফুলের-মালা-পরা-বেণী। রঙানো ঠোঁটের হাসি তার শাড়ি পরার ভঙ্গি। কিন্তু কিছুই সে বিশেষ-ভাবে মনে করতে পারেনা। মনে করবার মত কিছু নেই কিংবা তার চোখে পড়েনি। তবে তার মনে পড়ে সুলতার গানের সঙ্গে তাকে তবলা সঙ্গত করতে হয়েছিল বিশেষ অনুরোধে। মনে পড়ে সুলতা গেয়েছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। দেবশ্রীকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। সে গানের সঙ্গে সঙ্গত চলে না। দেবশ্রী ঠেকা দেবার চেষ্টা করেও হতাশ হয়েছিল। সুলতার মাত্রাজ্ঞান নেই।

সুলতা সে-দিন যেন প্রাণখুলে দেবশ্রীর সঙ্গে মেলামেশা করবার চেষ্টা করেছিল মনে হয়। কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তার খাবার সময়। কথা বলেছিল অন্তরঙ্গ সুরে। দূর থেকে দু-এক ঝলক হাসি ছুঁড়েও দিয়েছিল তার দিকে। কিন্তু তার মাঝে প্রেমের কোন উৎক্ষেপ ছিল না। ছিল না অন্তরঙ্গ গোপন মনের কোন আবেগ উচ্ছ্বাস।

কী যন্ত্রণা! স্থূলতার চিন্তা যেন দেবশ্রীকে অনুপরমাণুতে গ্রাস করে বসেছে। স্থূলতা কি জোর করে তার ভালবাসা কেড়ে নিতে চায়? কিছুতেই তার ঘুম আসে না। সে অধৈর্য হয়ে উঠল।

এ চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। কেশরের ভাবনা দিয়ে স্থূলতাকে চাপা দিতে হবে। কেশরের আলোর জ্যোতিতে স্থূলতাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে হবে।

জীবন তার আলোয় ভরা। সে কেন অন্ধকারের অতলে আলোর সন্ধান করবে?

সে কেশরকে চিঠি-লিখতে বসল। কেশরের মাঝে সে সন্ধানের সমাপ্তি খুঁজল।

॥ আঠারো ॥

প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের শনিবারে দেবশ্রী যায় দেবিকাকে দেখতে। রবিবার বিকালে ফিরে আসে।

এবার কিন্তু দেবশ্রী বর্ধমানে এসে রীতিমত বিস্মিত হলো দেবিকা আর অনিমেষকে দেখে। তুজনেই খদ্দর পরেছে। দেবিকা চরকা কাটে। শুধু বিস্মিত হল না দেবশ্রী মনে মনে ভয় পেল। আই, এম, এস অফিসারের এ মনোভাব তো শ্রেয় নয়। শুভ নয়।

দেবিকার কাছে যা শুনল তাতে দেবশ্রী অনিমেষ ও দেবিকার ভবিষ্যত সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

দেবু শুনেছিল সুভাষ বোস অনিমেষের সতীর্থ এবং একসঙ্গে তারা বিলেতে ছিল। সুভাষচন্দ্র সম্প্রতি আই, সি, এস চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে এসে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারীরূপে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছেন। দেশে পূর্ণোদ্যমে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। বিপ্লবী তরুণ সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরেই সেই আন্দোলনের পুরোধা দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্যরূপে অল্প দিনের মধ্যেই বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

দেবিকার কাছে সংবাদ পেল, সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন বর্ধমানে এবং তাদের অতিথিরূপে তাদের বাঙলোয় অবস্থান করে গেছেন এক রাত্রি। দেবুর বুঝতে বাকি রইল না যে এ তারি প্রক্রিয়া। দেবশ্রী বিস্মিত হলো। অনিমেষের এ-দিকের মনের খবর তো সে জানত না।

দেশের রাজনৈতিক আকাশে তখন মহাবিপ্লব। ইংলণ্ডের

যুবরাজের ভারত আগমণ উপলক্ষে ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের সর্বত্র যে হরতাল প্রতিপালিত হয় ভারতের ইতিহাসে তা বিরল। সেই অবিস্মরণীয় হরতাল ভারত সরকারকে বিচলিত ও বিভ্রান্ত করে তুলল এবং যুবরাজের কলকাতা পৌঁছবার পূর্বেই আবুল কালাম আজাদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করল। দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হল এবং নেতৃবিহীন বাঙলায় যে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল প্রতিপালিত হলো তার তুলনা হয় না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন বাঙলার অবিসংবাদী জনপ্রিয় নেতা। তাঁর ত্যাগে ও মহিমায় সারা ভারত তখন মুগ্ধ। তাঁর গ্রেপ্তারে বাঙলার জনগণ বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হল।

দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র উভয়েরই বিচারে কারাদণ্ড হয়।

তাঁদের কারাদণ্ডে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু হয়। দেশের জনগণের উপর যে বিষময় প্রক্রিয়া হল অনিমেষ তারই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দেবিকাকে দেখে দেবশ্রীর মনে হল, দেশ সেবার অনুপ্রেরণায় সে জ্বলে উঠেছে। তার মনেও দেশাত্মবোধ জেগেছে। সে স্বামীর যোগ্য শিষ্য হবার জন্য নিজেকে তৈরি করে তুলছে।

দেবিকা হাসতে হাসতে বলে, চাকরি আর বেশীদিন নয় দাদা। শীগগিরী ও চাকরি ছাড়বে।

অনিমেষ দেবুকে অভয় দিয়ে বলে, নো ফিয়ার্স ব্রাদার, বোন তোমার ঠিক খেতে পাবে। চাকরি করি আর নাই করি।

—তা আমি জানি। কিন্তু সত্যিই কি চাকরি ছাড়বার মতলব আছে নাকি?

অনিমেষ জবাব দেয়, চাকরি করবার আইডিয়া তো কোনদিনই ছিল না। আর এই চাকরি করে কি আমার পেট ভরবে নাকি?

আমার সংসারটি তো নিতান্ত ছোট নয়। এই দেশ আমার সংসার। দেশবাসীর সেবার আদর্শ নিয়েই আমি ডাক্তারী পড়ি।

অনিমেষের চোখ দুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনের আবেগে অনর্গল ঝরে পড়ল তার হৃদয়ের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, সমাজচেতনা তার দীপ্ত মর্যাদাবোধ।

দেবশ্রী মুগ্ধ হল। তার চোখের সামনে বর্ধমানের ডাক্তার সাহেবের খোলস খসে পড়ল। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক দেশপ্রেমিক স্বাধীনচেতা সর্বত্যাগী বিপ্লবী।

দেবিকা মুখ টিপে হাসে। গৌরবে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

দেবশ্রী অপলকে দেবিকার পানে চেয়ে দেখে। এ সে দেবিকা নয়। তার হাতে-গড়া আনন্দময়ী বালিকা দেবিকা নয়। সে সেবাব্রতী মহিমময়ী নারী। সে স্বামীর অনুরক্ত শিষ্যা। সে সহধর্মিণী।

তার মহিমায় মুগ্ধ হল দেবশ্রী। তার মুখে নতুন জীবনের সূচনা। নতুন আলোর ঝলকানি।

দেবশ্রী একসময় দেবিকাকে বললে, আমাকেও এ চাকরি ছাড়তে হবে বাধ্য হয়ে।

—কেন, তোমার তো সরকারী চাকরি নয়।

—না, তা নয়।

দেবশ্রী তাকে তার কলেজের অধ্যক্ষ কন্যা সুলতার সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাবের কথা বলল।

দেবিকা হেসে উঠল : বিয়ে করে বউকে নিয়ে বিলেত গেলে তো চাকরি ছেড়েই যেতে হবে। মেয়েটা কেমন দেখতে গো দাদা? দুজনে যখন ভালোবাসা হয়েছে তখন তাকে পছন্দ হয়েছে নিশ্চয়ই। ভালো গান গায় বুঝি?

দেবশ্রী বললে, ভালোবাসা হয়েছে তোকে কে বললে? তার নাকি পছন্দ হয়েছে আমাকে—

দেবিকা ঝলসে উঠল, কী যে ন্যাকা ন্যাকা কথা কও। তার তোমাকে পছন্দ হয়েছে আর সে একটা ব্রাহ্ম ঘরের গ্র্যাজুয়েট মেয়ে তোমার মনের কথা না জেনেই তার বাবা মাকে সে বলে বসলো, আমি ওকে বিয়ে করবো? তাই কি কেউ বলে নাকি?

দেবশ্রীকে চটিয়ে দিয়েছে দেবিকা। সে মুখ রাঙা করে কপালে চোখ তুলে বললে, তবে কি তুই বলতে চাস আমরা দুজনে চক্রান্ত করে এ-টা করেছি?

দেবিকা হেসে ফেললে দাদার মুখের চেহারা দেখে। বললে চক্রান্ত হতেও পারে না-ও হতে পারে। কিন্তু মেয়েটি যে তোমার মনের কথা জেনে তবে তার বাপ-মাকে বলেছে এ-কথা অবধারিত।

দেবশ্রী গম্ভীর হয়ে গভীর মনস্তাপের সঙ্গে বললে, তুই-ও আমায় অবিশ্বাস করবি দেবি? আমি ছুটে এলুম তোর সঙ্গে পরামর্শ করে বাবাকে একটা জবাব দেব বলে, আর তুই কিনা—

দেবিকা তার কথার মাঝে প্রশ্ন করল, সত্যি, সুলতা তোমাকে তার মনের কথা জানায় নি?

—মনের কথা কেন, মুখেও আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি। হাব-ভাবেও আমাকে কোনদিন জানতে দেয়নি যে আমার জন্যে তার মনে কোন দরদ আছে। আর আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে হয়তো তিন চার দিন। তার মধ্যে একটি দিন—ঐ তার জন্মোৎসবের দিন—দুজনে বরং একটু কাছাকাছি হয়েছিলুম। গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছিলুম।

—ভালো গায় বুঝি মেয়েটা?

মুখ বিকৃত করে দেবশ্রী বললে, মাথা। সে কি আবার গান নাকি? তার চেয়ে তুই ভালো গাইতে পারিস।

—আমি কি খারাপ গাই নাকি? তোমার সাকরেদ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের, জজ সাহেবের বউ আমার গান শোনবার জন্যে আমায় নেমন্তন্ন করে।

—তা হলে তো তুমি নিশ্চয়ই বড়ো গাইয়ে।

দেবিকা হঠাৎ প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে বলে উঠল, জানো দাদা আমার এক ননদ আছে, সে লক্ষ্ণৌ-এর নামী বাঈজী। খুব ভালো গাইয়ে।

লক্ষ্ণৌর বাঈজী? চমকে উঠল দেবু।

—তোর ননদ? সে আবার কি?

দেবিকা হাসতে হাসতে বললে, আমার শ্বশুরের সে এক নতুন আবিষ্কার। অনেক দিন থেকেই তিনি চেষ্টা করছিলেন। সম্প্রতি তার সন্ধান পেয়েছেন।

দেবিকা একটু নড়েচড়ে আঁট হয়ে বসে বললে, সে এক ইতিহাস। আমার শ্বশুরের এক ছোট ভাই ছিলেন। নাম ছিল তাঁর হরিশ। তিনি ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীত অনুরাগী এবং সুকণ্ঠ শ্রুতিধর গায়ক ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি সংসার ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান সম্ভবতঃ সঙ্গীত শিক্ষার তাড়নায়। তারপর আবার তিনি সংসারে ফিরে আসেন লক্ষ্ণৌর এক বাঈজীর কন্যাকে বিবাহ করে। এবং ঐ অঞ্চলের এক রাজবাড়ির সভা গায়ক হন। মধ্যে একবার নাকি তিনি শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করে সব বলেছিলেন এবং মুর্শিদাবাদের পৈতৃক সম্পত্তির অংশ বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁদের একমাত্র কন্যা কেশর তার বাঈজী দিদিমার কাছে মানুষ হয় এবং গানবাজনা শিখে বাঈজীর পেশা অবলম্বন করে। তার নাকি প্রচুর খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং অগাধ ঐশ্বর্য।

বহুদিন থেকে শ্বশুর মশায় তার সন্ধান করছিলেন, তার পিতার সম্পত্তির মূল্য তাকে দেবার জন্যে। শেষে যে রাজবাড়িতে তিনি চাকরি করতেন সেইখানে লেখালিখি করে তার সন্ধান পেয়েছেন। সে নিজের হাতে শ্বশুরকে চিঠি লিখেছে এবং এখানে আসতে চেয়েছে। শ্বশুর তাকে খুশি হয়েই আসতে লিখেছেন। খুব নামী গাইয়ে। কলকাতায় এলে তোমায় তার গান শোনাব।

দেবশ্রী এতক্ষণ থার্সষ্টন সায়েবের ম্যাজিক দেখছিল। একটা দ্বিখণ্ডিত দেহকে জোড়া দিয়ে তার মাঝে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল। দেবিকার কাহিনী দেবশ্রীর কাছে তার চেয়েও রোমাঞ্চকর। তার চেয়েও বিচিত্র। কেশর কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক অভিলাষ ডাক্তারের ভ্রাতুষ্পুত্রী। অনিমেষের ভগ্নি। দেবিকার ননদী। এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু হতে পারে নাকি ?

বিস্ময়ের আঘাতে দেবশ্রী বিমূঢ়। বিহ্বল। বিপর্যস্ত।

কী যে বলবে সে দেবিকাকে, কী বলে আবার কথা আরম্ভ করবে ভেবে পেল না। সব চেয়ে বেশী আতঙ্কিত হল নিজের মুখের চেহারাটার কথা ভেবে। কি রকম তাকে দেখাচ্ছে কে জানে। তার মুখের চেহারা দেখে দেবিই বা কি ভাবছে। অন্ধকারে মুখখানা লুকোতে পারলে কিছুক্ষণ সে যেন স্বস্তি পেত। দেবিকার দিকে চেয়ে থাকা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল। এ অসহ্য বিস্ময় তার স্নায়ুগুলোকে মোচড় দিতে লাগল।

সমুদ্রের তরঙ্গের চূড়োয় শুয়ে দেবশ্রী সারারাত আথালি পাতালি করল। কেশরের বিস্ময়কর নতুন পরিচিতি তাকে আরো কাছে টেনে আনল, আরো আপন করে তুলল। হৃদয়ের গভীরে কেশর যেখানে জট পাকিয়ে তুষারের মত জমাট বেঁধে অবস্থান করছিল সেখানটা যেন নব সূর্যের নতুন আলোকে গলতে সুরু করেছে। সে তার মর্মের মাঝে, অস্থির মাঝে কেশরের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ অনুভব করে। রাত্রির রহস্যময় অন্ধকারে তার মনে হয়

কেশর যেন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। বাঈজীর খোলস খুলে ফেলে তার ভিতরের সম্ভ্রান্ত কুমারী মেয়েটা তাকে আত্মনিবেদন করতে চায়। তার জীবনের সাথি হতে চায়।

অভিলাষ ডাক্তারের ভায়ের মেয়ে। গৌরবোজ্জ্বল পিতৃকুল নিঃসন্দেহ। বংশ মর্যাদায় সুলতার চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। সুলতা কেশরকে তার মন থেকে মুছে দিতে চায়। পাগল! কেশরের কাছে সুলতা?

পরের দিন সকালে চা খেতে বসে অনিমেষ দেবিকার পানে চেয়ে সহাস্যে বললে, দাদা আমাদের ভাগ্যবান!

দেবশ্রী মুখ তুলে দেবিকার ও অনিমেষের পানে তাকাল উৎসুক দৃষ্টিতে।

দেবিকা মিটি মিটি হাসছে।

অনিমেষ বললে, অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা একসঙ্গে।

—আমার দাদাই বা রাজপুত্তুরের চেয়ে কম কিসে?

অর্ধস্ফুট তরল কণ্ঠে দেবিকা বললে।

দেবশ্রীর মুখখানা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। অনিদ্রার ক্লান্তিতে বোধ হয় মনটা তার ভারী হয়েছিল। সে মুখে একটা হালকা হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেও পারলে না। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠল, গড সেভ মি ফ্রম ইয়োর ফরচুন। আই অ্যাম সিক্‌অব দিজ্‌ ইলিউসনস!

হেসে উঠল অনিমেষ: ইলিউসন? মেয়েরা তোমার কাছে ইলিউসন? শুনছো দেবি, তোমার দাদা কি বলছে?

—সকালবেলা তুমি আমার দাদাকে ক্ষেপাচ্ছো কেন?

দেবিকা দাদার পানে চেয়ে অপাঙ্গে হাসল।

—তুমি থামো।

দেবিকাকে ধমক দিল দেবশ্রী।

অনিমেষ মুচকি হেসে বললে, আমার বউটিকে তুমি শাসাচ্ছো

কেন ভাই? তোমার সুলতা প্রসঙ্গ উনি বলবার আগে বাবার কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছি। তিনি সমস্ত খুলে আমায় লিখেছেন এবং তোমাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রোগনসিস সম্বন্ধে তাঁকে রিপোর্ট পাঠাতে লিখেছেন। তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

—দেবি তো আমাকে সে-কথা বলেনি—

দেবিকা মুখ তুলে বললে, আমাকে কি বলেছিলো নাকি?

অনিমেষ বললে, কাল সকালের ডাকে আমি চিঠিখানা পেয়েছি। বলবার সময় হয়নি।

দেবশ্রী মুখ নিচু করে তরল কণ্ঠে বললে, বাবা সবেতেই ব্যস্ত।

অনিমেষ বললে, ব্যস্ত হবেন না! তাঁকে তোমার প্রিন্সিপ্যাল সান্যাল-কে একটা উত্তর তো দিতে হবে? কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক। তার ওপর মেয়ের ফ্যান্সি—

খিল খিল করে হেসে উঠল দেবিকা।

—ডোনচ বি আন্-চেরিটেবল দেবি। অনিমেষ দেবিকার পানে চেয়ে মৃদু হাসল ঃ ইউ শুড্ অ্যাপ্রিসিয়েট হার ফিলিংস।

দেবিকার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। সে চোখের কোণ দিয়ে দাদার মুখপানে তাকাল।

দেবশ্রী হঠাৎ বশ্যতার ভঙ্গিতে অনিমেষকে বললে, ইউ শুড্ অ্যাপ্রিসিয়েট মাই ফিলিংস টু।

অনিমেষ তেরছা ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে বসে বললে, ছাটস্ হোয়াট আই একজ্যাকটলি ওয়াণ্ট টু নো। মেয়েটি সম্বন্ধে খোলা-খুলি মনোভাব জানতেই তো চান তোমার বাবা। তাঁর ধারণা—যাকগে, তার ধারণার কথা নাই জানলে। হোয়াটস্ ইয়োর ইম্প্রেশন অ্যাবাউট সুলতা?

দেবশ্রী বলে উঠল, ইম্প্রেশন আমার যা-ই হোক ওকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

—কেন, অসম্ভব কিসে?

অনিমেষ সোজা হয়ে বসে গলাটাকে শক্ত করে বললে, আমরা তোমার ভারডিকট চাই না। চাই তোমার রিসনস্।

হেসে উঠল দেবশ্রী: একসকিউজ মি। আমি একটা সম্ভ্রান্ত মেয়েকে নিয়ে ডিসকস করতে চাই না। সি ইজ নট মেণ্ট ফর মি।

অনিমেষ হাসতে হাসতে বললে, বাট ইউ আর মেণ্ট ফর হার। সি কেয়ার্স ফর ইউ।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—কারণ?

উত্তর দিল দেবিকা, কারণ সে বেচারী গানবাজনা জানে না।

—আই সি। তা হলে তো বাঈজী বিয়ে করতে হয়। আমার এক বোন আছে, লক্ষ্ণৌ-এ মস্ত বড় বাঈজী। তা হলে তার সঙ্গে চেষ্টা করি, দেবি যদি বাঈজী বউ-দি করতে রাজি থাকে।

অনিমেষের কৌতুক নিমেষে দেবশ্রীর মুখের রক্ত শুষে নিল। তার মুখখানা পাংশু ও বিবর্ণ হয়ে গেল। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। তার মনে হল অদৃশ্য কোন মহাশক্তি অনিমেষের কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়ে দৈববাণী করলেন। সে কম্পিত দীর্ঘতায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার সমস্ত শরীর জুড়ে উচ্চারিত হল একটা তীক্ষ্ণ ভঙ্গি। সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ উনিশ ॥

সময়ের ডাকে সাড়া দিল অনিমেষ। উপায় কি? সময়কে এড়িয়ে চলা দুঃসাধ্য।

চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অনিমেষ কলকাতায় এসে বাপের গদিতে বসেছে। অভিলাষ ডাক্তার অথর্ব। পক্ষাঘাতে পঙ্গু। চাকরি ছাড়ার অবশ্য সেও একটা কারণ।

আসলে দেশ তাকে ডাক দিল। দেশের ডাকে সাড়া দিল। একা অনিমেষ নয়। অনিমেষের আগেই অনেকে সরকারি চাকরি ছেড়েছে। অনেক উকিল ব্যারিষ্টার ব্যবসা ছেড়েছে। স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক ছাত্র। অনেক শিক্ষক।

অনিমেষও চাকরি ছাড়ল। সুভাষচন্দ্র তখন জেল থেকে ফিরেছেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সে পূর্ণোদ্যমে দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করল। দেশবন্ধু তখন বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। সুভাষ-চন্দ্র তাঁর দক্ষিণ হস্ত। কংগ্রেসের অধীনে সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় তখন বাঙলার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হচ্ছে। অনিমেষ বাহিনীর মেডিক্যাল অফিসর নিযুক্ত হল। এবং সুভাষচন্দ্রের হৃদ্যতায় দেশের মাঝে তার গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। দেবিকাও হৃষ্টচিত্তে এবং প্রফুল্লমনে স্বামীর সঙ্গে দেশসেবায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। অনিমেষের ডাকে দেবশ্রী কলেজ ছেড়ে যোগ দিল দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের ইংরাজি দৈনিক পত্র ফরওয়ার্ডে ও ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যাপক রূপে।

দেবশ্রীর পিতা অশ্বিনী কিন্তু সুখী হতে পারল না পুত্র এবং জামাতা কন্যার এই অভাবনীয় পরিবর্তনে। অথচ মুখ ফুটে কারুকে কিছু বলতে পারে না। বাতাসের মুখে পাল তুলে দিয়েছে তারা।

তাদের গতিরোধ করবে কে? দেশে তখন বিপ্লবের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দেশের কৃষক সম্প্রদায় এবং শ্রমিকদল পর্যন্ত তাদের ন্যায্য দাবি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা-কামী শিক্ষিত তরুণ দলকে বাধা দেবে কেমন করে?

তেমনি দিনে কেশর এল লক্ষ্ণৌ থেকে তার জেঠা মশায়ের ডাকে। তার পিতৃকুলের সঙ্গে পরিচিত হতে। সে গোপনে দেবশ্রীকে তার আগমন সংবাদ দিল এবং পরামর্শ মত একটা সম্ভ্রান্ত হোটেলে এসে উঠল। দেবশ্রী তার জন্য হোটেল ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

কেশর দেবুকে জিজ্ঞেস করলে, এত বড় সম্ভাবনা যে আমার জীবনে ছিল কখনো ভাবতে পেরেছিলে কি দেবু?

দেবশ্রী হাসতে হাসতে জবাব দিল, মরা মানুষকে জীবন্ত ভাবার মতোই যা অলৌকিক ও আজগুবী তাকে ভাববো কেমন করে? তোমাকে আমার বউ ভাবা যেতে পারে কিন্তু অনিমেষের বোন ভাবা যেতে পারে না।

কেশর চোখে আগুন আর মুখে হাসি ছড়িয়ে বললে, খুব দুষ্টু হচ্ছো। মুখে আর কিছু বাধে না?

—বাধবে কেন? এখন যে তোমার সঙ্গে রসের সম্পর্ক।

—ওঃ! তাই বুঝি?

তরল কণ্ঠে হাসল কেশর।

দেবু বললে, কিন্তু আমাদের পুরোনো পরিচয়টা গোপন রেখে আমরা নতুন করে পরিচয় করবো।

কেশর মুহূর্ত ভেবে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বললে, না। তা পারবো না। লুকোতে যাবো কেন? আমাদের মনে তো পাপ নেই। এখানে ওঁদের কাছে আমি কোন কথা গোপন করবো না। কোন অসত্য বলবো না।

দেবশ্রীর মুখখানা শুকিয়ে গেল। সে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তবে বলবে কী?

কেশর গম্ভীর হয়ে হাসতে হাসতে বললে, সত্যি যা তাই বলবো। বলবো আমাদের আগে থেকেই জানাশুনো আছে। ভাব আছে!

—কিন্তু ওঁরা ভাববে কী?

কেশর ধমকের ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে বললে, তোমার এতো ভয় কিসের বলোতো? যা বলবার আমি ঠিক বলবো। তোমার বে-ইজ্জত হবে না। বাজিয়ে হিসেবে তোমার মর্যাদা বাড়বে। মহাজনের কথাঃ সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়। কেশরের সুন্দর মুখ, তার ভব্যতা, তার সারল্য, তার চলন-বলন মুহূর্তে অভিলাষ ডাক্তার এবং তাঁর পরিজনদের জয় করে নিল। কে বলবে বাঈজী? কে বলবে পুরুষের মনোরঞ্জিনী পেশাদার নর্তকী? অবাক হয়ে উৎসুক চোখে আড়াল থেকে ভিড় করে সকলে তাকে দেখে। পীড়িত জেঠামশায়ের বিছানার প্রান্তে গিয়ে বসেছে চিরপরিচিত পরমাত্মীয়ের মত। চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্নেহ নির্ঝর। কণ্ঠে উদ্বেগাকুল কুশল প্রশ্ন। স্পর্শে মমতাময়ী কন্যার নিরাকুল নিবিড়তা।

অভিলাষের ঝাপসা চোখে অগাধ বিস্ময়ঃ হরিশের মেয়ে!

বিস্মৃত অতীতের অন্ধকার থেকে মাথা চাড়া দিয়ে হরিশের তরুণ মুখ খানি তার চোখের আলোয় ভেসে উঠেছে। হরিশের দেহের একটি টুকরো স্বপ্নের দূরত্ব থেকে ভেসে এসে তাকে শরীরী স্পর্শ দিয়ে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে।

একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় হল কেশরের। সকলেই কেশরকে প্রাতির চোখে দেখল। সে যেন এদের চিরচেনা। চিরজানা। দূরে ছিল কাছে এসেছে। প্রবাসে মানুষ হয়েছে। নিজের দেশ দেখতে এসেছে। নিজের পরিজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে এসেছে।

দেবিকার ঘরে গিয়ে কেশর তাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললে, বউ-দিকে আর আপনি বলবো না। তুমি-ই বলবো। আমার বউ-দিদি হবার আগে থেকেই তোমাকে আমি চিনি।

—কি রকম ?

নির্বাম্প, নিষ্কম্প গলায় কেশর উত্তর দিল, তোমার দাদা আমার বন্ধু। তোমার বিয়ের আগে থেকেই আমার সঙ্গে তার জানা চেনা।

সবিস্ময়ে দেবিকা বললে, ওমা, সত্যি ? আমার দাদার সঙ্গে তোমার চেনাজানা হলো কেমন করে ?

কেশর সগৌরবে স্পর্ধিত স্বরে বললে, গান বাজনার জগতের অতোবড়ো একজন গুনী লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে না ? ওর সঙ্গতের সঙ্গে গাইবার সৌভাগ্যও কয়েকবার হয়েছে আমার। কলকাতায়, কাশীতে এবং লক্ষ্ণৌ-এ।

—সত্যি ? আমার দাদার তুমি পরিচিত ? কেশর মৃদু হেসে বললে, রীতিমত বন্ধুতা দুজনে। লক্ষ্ণৌ-এ আমার বাড়িতে থেকে এসেছে।

—ওমা, তুমিই দাদার লক্ষ্ণৌ-এর বন্ধু ? দাদা বলতো লক্ষ্ণৌ-এ আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু আছে। মামার বাড়ি থেকে তার ওখানে গিয়েছিলুম। লক্ষ্ণৌ থেকেও আমাকে চিঠি লিখেছে।

কেশর তার চিবুক ধরে প্রসন্নমুখে বললে, তাইতো বলছি গো তোমাকে আমি চোখে না দেখলেও তোমাকে আমি চিনি। এবং তোমাকে চোখে দেখার আগেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। দেবুর মুখে শুনেছিলুম, তুমি খুব সুন্দর। কিন্তু এতো সুন্দর তা ভাবতে পারিনি।

দেবিকা উছলে হাসতে হাসতে তাকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু দাদা কী দুষ্টু! একদিন বলেনি, একদিনের জন্যে আমায় বুঝতে দেয় নি যে তুমি দাদার লক্ষ্ণৌর বন্ধু। আমি বুঝবো কেমন করে যে ওর বন্ধু মেয়েমানুষ বা লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ গায়িকা কেশর বাঈ।

—কোনদিন বলেনি বুঝি ? আমি ভেবেছিলুম তোমাকে অন্ততঃ বলেছে। তোমাকে যে ভালো বাসে!

—তাও তুমি বুঝেছো ?

—ওরে বাসরে! তা আবার বুঝতে কারুর বাকি থাকে। অমন ভাই পাওয়া ভাগ্যের কথা।

—তা সত্যি। আমাকে খুব ভালোবাসে। তাই তো ভাবছি আমার কাছে এ কথা লুকিয়ে রেখেছিল কেমন করে?

দেবিকা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, এখন আমার মনে পড়েছে—বর্ধমানে যে-দিন তোমার কথা দাদাকে শোনালুম দাদা প্রথমটা চমকে গেল তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। চুপচাপ সব শুনলে অথচ মুখ ফুটে বললে না যে আমি কেশরকে চিনি। কী দুষ্টু? দাঁড়াও না আসুক। এমন ঝগড়া করবো।

কেশর হাসল: ভারি লাজুক। আর বাঈজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব-টা প্রচার করবার মত গৌরবের বস্তুও নয়।

দেবিকা কি বুঝল কে জানে। সে নিঃশব্দে কেশরের মুখের পানে তাকাল।

কেশর উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসতে হাসতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার স্পর্শের উত্তাপে কেশরের মনটা হঠাৎ অসংযত ও অগোছাল হয়ে উঠল। অনেক দিনের অনেক কথা বলবার জন্য তার মন উত্তাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে শুধু আর্দ্রকণ্ঠে বললে, তুমি যে সম্পর্কে আমার বড়ো। নইলে তোমাকে আমার দেবি বলেই ডাকতে ইচ্ছে করে। নামটা বলে বলে এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে।

দেবিকা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, দাদাকে দেবু বলো তো?

—হ্যাঁ।

—বেশ তো আমাকেও আমার নাম করে ডাকবে।

কেশর বললে, নামটার ওপর লোভ আছে। নামটাকে ভালোবেসেছিলুম মানুষটাকে দেখবার আগেই।

প্রবল বন্যায় উত্তরবঙ্গ বিধ্বস্ত।

সহস্র নরনারী আশ্রয়হীন। বিপন্ন। [illegible] ডাক পড়ল। বন্যাত্রাণ সমিতি থেকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যার সভাপতি এবং সুভাষচন্দ্র সম্পাদক। অনিমেষকে সাড়া দিতে হল। সদলবলে অনিমেষ সফর করে এল উত্তরবঙ্গ। দেবিকা মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে দোরে দোরে অর্থ সংগ্রহ করতে বেরুল। কেশর তার তহবিলে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দান করল। এবং স্বেচ্ছায় কয়েকটি জলসার আসরে মুজরো করে সাহায্য তহবিলে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করে দিল। লক্ষ্ণৌর কেশর বাঈ সম্ভ্রান্ত বাঙালী ঘরের মেয়ে। কলকাতার এবং বাঙলার জনসমাজে কেশর চিহ্নিত হয়ে গেল। সঙ্গীত রসপিপাসুদের কাছে কেশরের সঙ্গে দেবশ্রীও বিশেষভাবে বিখ্যাত হল। মৃত বিধু মুখুজ্জে দেবশ্রীর মাঝে অমরত্ব লাভ করল। শহরে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল বাঙালী মেয়ে কেশরের কণ্ঠসঙ্গীত আর বাঙালীর ছেলে দেবশ্রীর সঙ্গত। রসজ্ঞ ধনী মহল থেকে প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন পেল তারা দুজনে। প্রতিটি পাই এমন কি উপঢৌকনের দ্রব্য সামগ্রী পর্যন্ত তারা আর্তত্রাণ সমিতির হাতে অর্পণ করল। জলসার শেষে কেশরের ও দেবশ্রীর গলার পুষ্পমাল্য ও উপহারের পুষ্পসম্ভার পর্যন্ত সর্বোচ্চ মূল্যে নিলাম হল এবং প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হল।

কেশর গভীর তৃপ্তিতে আবেশভরা অর্ধনিমিলিত চোখে দেবশ্রীর মুখের পানে চায়। দেবশ্রী পাথরে খোদাই করা নিরেট মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। মুখের দৃঢ় রেখায় ফুটে উঠেছে সতেজ সংযম। সে শিল্পী। সে তার সাধনার নিঃশব্দতার গভীরে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কেশরের কণ্ঠ ছাড়া সেখানে আর তার দ্বিতীয় সত্তা নেই। কেশর সেখানে অশরীরী। নিরবয়ব একটা শব্দতরঙ্গ। সেই শব্দের স্পর্শ তার শরীরময়। সেই শব্দের কুহক তার চোখের দৃষ্টিতে।

দেবশ্রীর আর তো কোন ভয় ভাবনা নেই। সে এতদিনে খুঁজে পেয়েছে তার একান্ত পরিচয়। এই পরিচয়ের মাঝে সে অমর হতে চায়। এই তো সে চেয়েছিল। কেশরের সাধনার বিস্তৃত জগতে নিজের একটু ঠাঁই। একটু প্রতিষ্ঠা। কেশরকে সে গোপন রাখতে চায় নি। কেশরের পাশে বিস্তৃত পাখা সঞ্চালন করে অবাধে উড়ে বেড়াতে চেয়েছিল তার সাধনার আনন্দলোকে। এর জন্য সে নিজেকে অনেক দিন থেকে প্রস্তুত করছিল। বিধাতা তাদের সে সুযোগ দিয়েছেন। কেশর তার সাধনার সাথি হয়ে, তার সহায় হয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হৃদ্যতা আজ সর্বজনবিদিত। দৈনিক সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় একত্রে তাদের দুটি নাম ও পাশাপাশি তাদের ছবি বেরিয়েছে। আর তার আঘাতের ভয় নেই। আঘাত এলেও আঘাত প্রতিরোধের শক্তি সে পেয়েছে।

তারা জাত শিল্পী। তাদের জীবনের মান আলাদা। তাদের জীবনের নীতি আলাদা। তাদের জীবনের ক্ষেত্র আলাদা। তারা সমাজনীতির বিধি-বিধানের তীর ঘেঁষে তাদের তরী ভাসায় না। মাঝ-দরিয়ার তুফানে তাদের নৌকোর পাল তুলে দেয়। তারা বে-পরোয়া। বে-হিসেবী। তাদের "জীবন মৃত্যু' পায়ের ভৃত্য— চিত্ত ভাবনাহীন"। শিল্পের সাধনাই তাদের জীবন তাদের মৃত্যু। তাদের সাধনাকেই জনগন দিয়েছে এত সম্মান। এত সম্বর্ধনা।

এই তো তাদের জীবনের মূল্য। সাধনার সার্থকতা।

দেবশ্রীর মনে আর কোন দ্বিধা লজ্জা নেই। প্রকাশ্য পাদ-প্রদীপের সামনে কেশরের পাশে দাঁড়িয়ে অগনিত দর্শকদের অভিবাদন করতে আর তার মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। আর তার বুক কাঁপে না কেশরের দীপ্ত চোখে চোখ রেখে প্রকাশ্যে তার সঙ্গে বাজাতে। কেশর তো আর গোপন নয়। অগোচর নয়। কেশর গোচর, প্রত্যক্ষ। কেশর তার গৌরব। তার গৌরবের গোপুর।

কেশরের পরিচয় তো আর ঘোলা নয়। অস্পষ্ট নয়। কেশরের নতুন পরিচয় তাকে নতুনতর মর্যাদা দিয়েছে। সে অভিজাত বাঙালী ঘরের মেয়ে। সে শহরের খ্যাতনামা চিকিৎসক অভিলাষ ডাক্তারের ভ্রাতষ্পুত্রী। অনিমেষের বোন। সমাজে সম্মানিত পরিচয় নিঃসন্দেহ। অনিমেষের উদার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন সাদরে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। সসম্মানে তাকে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছে।

দেবিকার সংশ্রবে এসে কেশর খদ্দর পরেছে। পুরোপুরি স্বদেশী বনে গেছে। রাশীকৃত খদ্দরের শাড়ি ব্লাউজ কিনেছে। খদ্দরের ছাপা শাড়ি ব্লাউজ পরে যখন সে আসরে গাইতে বসে কে বলবে তাকে অবাঙালী বাঈজী ? অনেকে লক্ষ্ণৌর নামী বাঈজীকে তার মাঝে খুঁজে পায় না।

দেবিকা বলে, বাঈজী না ছাই ! এমন সুন্দর টুকটুকে চেহারা বউ সাজলে কী সুন্দর মানাবে ! মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে দেখোনা।

কেশর তির্যক কটাক্ষের সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দেয়, তুমি পছন্দ করলে আর কি হবে বউদি ? তোমার তো বউ হওয়া চলে না। বউ হবো কার ?

দেবিকা হাসতে হাসতে বলে, বলো না খুঁজে দেখি। কিন্তু বাঈজীগিরি তো ছাড়তে হবে।

কেশর স্মিতমুখে প্রশ্ন করে বাঈজী বউ করতে বুঝি কেউ রাজি হবে না ?

—না হতেও পারে। অনেকদিন তো বাঈজী সেজে কাটালে, বাকি জীবনটা বউ সেজে দেখো না। কোনটা সুখের ?

কেশর তার চিবুক ধরে সোহাগ করে বলে, আমার ভায়ের মত বর তো সকলের অদেষ্টে জোটে না—

দেবিকা সলজ্জ ভঙ্গিতে মাথা হেঁটে করে বলে, তা সত্যি। মেয়েদের জীবন ভাগ্যের হাতে।

—বিয়ের সময় কে জানতো যে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে তার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে। কী আশ্চর্য ?—

দেবিকা হেসে ফেলল। বললে, তার চেয়ে আশ্চর্য তোমার সঙ্গে দাদার এই ঘনিষ্ঠতা। দুজনেই কেমন চেপে রেখেছিলে ?

—চেপে আবার কি রাখবো ? আর রাখবোই বা কেন ? আমাদের মনে কি কোন পাপ ছিল না আছে ?

—পাপ কেন ? মধু ছিল—মধুর সঙ্কোচ ছিল। কেশর হেসে উঠল ঃ সখা ভাবের মধ্যে মধু থাকবে বই কি। মধুর ভাবের কাছাকাছি।

—মধুর ভাবের সগোত্র।

হেসে লুটিয়ে পড়ল দেবিকা কেশরের গায়ে।

কেশর তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, ভাই বোন এক ছাঁচে ঢালা।

—তাইতো স্বাভাবিক।

কেশর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলে, দাদার বিয়ে হবে না! কথাবার্তা হচ্ছে না ?

দেবিকা বললে, একজায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। দাদা যে কলেজে কাজ করতো সেখানকার প্রিন্সিপ্যালের মেয়ে। মেয়ে বি-এ পাশ। বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাইকে বিলেত পাঠাতে চায়।

—তারপর ?

—দাদার বোধ হয় মেয়ে পছন্দ নয়। অথচ—

দেবিকা স্থলতা প্রসঙ্গটা তার কাছে সঙ্ক্ষেপে বিবৃতি করে বললে, অথচ দাদাকে সে তার মনোভাব কোনদিন জানায় নি।

—সত্যি ? তা মেয়েটি দেখতে কেমন ?

—আমরা কি দেখেছি, না দাদা তাকে দেখতে দিলে ? স্পষ্ট বলে দিলে আমি ওখানে বিয়ে করবো না। তবে দাদার মনোভাব

যতোটুকু আমি জানি গান-বাজনা জানা মেয়ে নাহলে ও বিয়ে করবে না।

কেশর ঠোঁট মুচড়ে হাসল। কোন কথা বললে না।

ঘরে ঢুকল অনিমেষ আর দেবশ্রী।

অনিমেষ বললে, এক্সকিউজ আওয়ার ইন্‌টারাপশন।

কেশর হাসতে হাসতে বললে, এই যে দেবু এসেছে। ভালোই হলো। দেবুর বিয়ের কথাই হচ্ছিল।

—কার সঙ্গে ?

প্রশ্ন করল অনিমেষ।

—সুলতার সঙ্গে। চলো দাদা আমরা একদিন সুলতাকে দেখে আসি।

—কিন্তু দেবু যে রাজি হচ্ছে না।

কেশর দেবশ্রীর চোখে চোখ রেখে অনিমেষকে বললে, মেয়ে পছন্দ হলে রাজি না হবার কারণ ?

অনিমেষ দেবুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললে, বল না হে কারণটা কি ?

—তোমরা বল। আমার বাজে কথা বলবার সময় নেই। যতো রাবিশ !

কেশর তার পানে চেয়ে ভ্রূকুটি করল।

অনিমেষ বললে, তা হলে আমাকে অনুমতি দাও। আমিই বলি। কেশরকে জানিয়ে রাখা ভাল।

কেশর ও দেবিকা উৎসুক প্রশ্নভরা চোখে অনিমেষের পানে তাকাল।

অনিমেষ বললে, ও গানকে বিয়ে করবে। আসলে ওর মনের বাসনা আমি ওর বোনটিকে নিয়েছি ও আমার বোনটিকে নেবে। টুথ ফর টুথ।

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে দেবশ্রী বলে উঠল, ডোনচ বি নটি অনুদা !

কেশর আরক্ত মুখে দেবশ্রীর পানে মুহূর্ত তাকাল। তার লজ্জা-মোচন করবার জন্যই যেন সে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, না দাদা, এ ওর মনের কথা নয়। আমি ওর মনের কথা জানি।

—কী ওর মনের কথা ?

কেশর বললে, সুলতাকে যদি তোমাদের সকলের পছন্দ হয় ও নিশ্চয়ই সুলতাকে বিয়ে করবে। সংসারের কল্যাণের জন্য। ওর প্রিয়জনদের সুখি করবার জন্যে। ও স্বার্থ সন্ধানী নয়। ও নিজের চেয়ে সংসারকে ঢের বেশী ভালোবাসে।

অনিমেষ ঘরের মেঝেয় পায়চারি করছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গাঢ় কম্পিতে স্বরে বলে উঠল, তার চেয়েও বেশী ভালোবাসে ওর দেশকে। ওর দেশবাসীকে। ও ভাগ্যবান। দেশের চরণে ও নিজেকে বলি দিতে চলল।

কেশর ও দেবিকা প্রগাঢ় বিস্ময়ে তার মুখপানে চাইল। প্রবল জোয়ারের মত হুহুচ্ছাসে ঘরের মাঝে ঢুকে পড়ল তাল তাল স্তব্ধতা। তাদের নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের মধুর শান্তি খুলিয়ে দিল একটা আকস্মিক অবাঞ্ছিত উপদ্রব।

নিষ্ঠুর নির্ভীকতায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনিমেষ বললে, হ্যাঁ। ওকে আদালতে হাজির করে দিয়ে জামিন করে নিয়ে এলুম। ও রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত। পুলিশ ওর সন্ধান করছিল তাই ওকে কোর্টে হাজির করে দিলুম। হয়তো সুভাষও এই কেসে আসামী হবে।

দেবিকা জিজ্ঞেস করলে, দাদার অপরাধটা কি ?

অনিমেষ বললে, বিদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ লিখেছিল ফরওয়ার্ডে। ও শুধু তবলা বাজায় না। ওর কলমে আগুন ঝরে। তাই সিডিশনের চার্জে গ্রেপ্তার হল।

—সাজা হবে ? প্রশ্ন করল দেবিকা।

—তবে কি তোমার ভাই বলে ওর সাত খুন মাপ ?

—আমি কি তাই বলছি ? কতোদিন হতে পারে ?

—তা বছর খানেক নিশ্চয়ই।

আচমকা একটা অস্ফুট আর্তধ্বনি উচ্চাবিত হল কেশরের কণ্ঠ থেকে।

সকলের সম্মিলিত দৃষ্টি ছিটকে গেল কেশরের দিকে। কেশরের মুখখানা মোমের মত ফ্যাকাশে আর শক্ত হয়ে গেছে। তার বিবর্ণ গাল বেয়ে দুই চোখে দুটি অশ্রুর ধারা নেমেছে। সে দেয়ালের গায়ে আঁকা মূর্তির মত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেবশ্রী তার পানে চেয়ে লজ্জায় মরমে মরে গেল। সে কাঁদবে কি হাসবে বুঝতে পারলে না। অনিমেষও দেবিকার ভীত ও সন্দিগ্ধ মিলিত দৃষ্টির নিচে সে হাঁপিয়ে উঠল। সে স্নায়ু শিরায় ছটফট করে উঠল। অলক্ষ্যে কে তাকে ঠেলা দিল। সে আচ্ছন্নের মত তার দিকে দুপা এগিয়ে গেল। আবার হঠাৎ থেমে গেল। পা থেমে গেল। কণ্ঠ উচ্চারিত হল। আকুল, আর্দ্রস্বরে সে ডেকে বসল, কেশর !

দেবশ্রীর ডাকের প্রবল ঝাপটায় আত্মহারা কেশর শীতের ঝরা পাতার মত উড়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল দেবশ্রীর বুকের মাঝে। সে ভুলে গেল ঘরের মাঝে অনিমেষ দেবিকার উপস্থিতি। সে ভুলে গেল জগৎসংসার। দেবশ্রীর কাঁধের উপর মাথা রেখে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডাকল, দেবু ! দেবু !

দেবশ্রী প্রগাঢ় স্নেহে তার মাথার চুলের উপর হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

অনিমেষ আর দেবিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে না কি ?

দুজনে চোখোচোখি হতেই অনিমেষের মর্মমূল থেকে একটা কম্পিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে বলে উঠল, গুড্ গ্রেসাস্। এ অজেয় দুর্গে স্থূলতা প্রবেশ করবে কোন দিকে ? যাও, ভালো করে চায়ের ব্যবস্থা করগে।

॥ কুড়ি ॥

রতন মুক্তি পেল।

তার বিরুদ্ধে তো কোন সাক্ষী প্রমাণ ছিল না। অদৃষ্টে ছিল দুর্ভোগ, নিগ্রহ আর লাঞ্ছনা। মাসাবধি হাজতবাস করে বেরিয়ে এল।

নির্যাতন একা তারই হলনা বেচারী দিনেশকেও সঙ্গে সঙ্গে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হল। উদ্বেগ, আশঙ্কা, হাঁটাহাঁটি, দৌড় ঝাঁপ তাকেই তো সব হেপাজত পোয়াতে হয়েছে। উকিল ঠিক করা, পুলিশের কাছে ধর্ণা দেওয়া, তদারক ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করা, লক-আপে রতনের খাওয়া দাওয়ার সুব্যবস্থা করা— কিনা সে করেছে। প্রণয়িণীর জন্য সে যা করল কোন স্বামীই বোধ হয় স্ত্রীর জন্য তার চেয়ে বেশী করে না। সব চেয়ে বড় ক্ষতি স্বীকার করল, সে তার সুনাম হারাল। তার এতদিনের গোপনতা ফাঁস হয়ে গেল। সে গ্রাহ্য করল না। রতনকে বাঁচাবার জন্য সে প্রাণপণ করল।

রতনকে সে ভালবেসেছে। সে ভালবাসার মাঝে ফাঁক ছিল না। ফাঁকি ছিল না। কপটতা ছিল না। ছলনা ছিল না। তার বলিষ্ঠ পক্ষপুটের নিবিড় আশ্রয়ে সে তাকে নিরাপদ দেখতে চায়। তাকে সুখি দেখতে চায়। তার নিরপত্তার জন্য, তার সুখের জন্য সে নিজের অক্ষত পারিবারিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করল। অনাহত সুনামে অপযশ আনল। প্রেমের সততা রক্ষার জন্য, প্রেমাষ্পদকে সুখি দেখবার জন্য সে তার অকলঙ্ক চরিত্রকে লোক-চক্ষে হেয় করল। তার জন্য মনে তার কোন ক্ষোভ নাই। খেদ নাই।

ভগ্ন দেহমন নিয়ে রতন বাড়ি ফিরে এসেছে, দিনেশ তার সঙ্গ দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে, তাকে সুস্থ ও প্রফুল্লচিত্ত করে তুলতে চায়। তার মুখে হাসি ফোটাতে চায়। কিন্তু রতন যেন আর পূর্বজীবনের আঙিনায় ফিরে আসতে পারে না। সে হাসতে ভুলে গেল। কথা বলতে ভুলে গেল। সে নিঃশব্দে দিনেশের মুখের পানে চায়। নিঃশব্দে তার চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মুখ তার বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে থমথম করে। মুখ তুলে সে দিনেশের পানে চায়। কিন্তু মুখ খুলে সে কোন কথা বলতে পারে না। অন্তরের গভীরতম বেদনা তার চোখ ফেটে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। দিনেশের সুনিবিড় সস্নেহ স্পর্শ তার ভিতরটা গলিয়ে দেয়। অপরিসীম বেদনায় ও অসহ্য আনন্দে তার শীর্ণ দেহলতাটি থেকে থেকে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। সে দিনেশকে আশ্রয় করে অন্ধকারের নিঃশব্দতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ভোগী সে। সম্ভোগের জন্যই সে চিরদিন পুরুষের শরণাপন্ন হয়েছে। ভোগের উপকরণ ভেবেছে পুরুষকে। অর্থের বিনিময়ে কোনদিন সে দেহকে পণ্য করেনি। অর্থ দিয়ে অনেক পুরুষকে সে ক্রয় করেছে। পুরুষের সে সেবা করেনি। পুরুষের সেবা কিনেছে। পুরুষের ওপর প্রভুত্ব করেছে। কাজেই প্রেমের প্রশ্ন ছিল অবান্তর। নিছক তনু সম্ভোগের মাঝে প্রেম ছিল অনাস্বাদিত। অনধিগম্য।

দিনেশ তার জীবন যাত্রার ধারাকে ওলোট পালট করে দিল। তার ভিতরের চিরন্তন নারীকে সত্য পথের ইঙ্গিত দিল। হলাহল মথিত করে অমৃত তুলে তার মুখে ধরল। সে তার জীবনে অমরত্ব লাভ করল। ভোগী মেয়েটা মরে নতুন করে জন্ম নিল। দিনেশ ছাড়া রতনের আর কোন চিন্তা রইল না। দিনেশ হয়ে উঠল তার ভাগ্যবিধাতা। সে হল দিনেশের সেবিকা। তার দাসী। তারই

মাঝে পেল সে পরম পরিতৃপ্তি। তারই মাঝে খুঁজে পেল সে নারী জীবনের সন্ধান ও সমাপ্তি।

হাজত থেকে ফিরে সে যেন বোবা বনে গেল। সে যেন ফুরিয়ে গেল। তার চোখের জল যেন শুকোতে চায় না।

দিনেশ বললে, দিনকতক আমরা কোথাও ঘুরে আসি চলো রতন, এখানে তোমার শরীর মন ভাল থাকছে না।

রতন বললে, গোয়ালিয়র তো একবার যেতেই হবে সেইখানে আমরা যাই চলো।

কেশর যখন কলকাতা এসেছিল তখন রতন গোয়ালিয়রে। কেশরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি।

রতনকে গোয়ালিয়রে রেখে দিনেশকে কলকাতা ফিরে আসতে হল। মায়ের সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থার জন্য রতনকে গোয়ালিয়রে কিছুদিন থাকতে হল। দিনেশের অনুপস্থিত কালে রতন তার পুত্র প্রভুদয়ালকে কাছে আনিয়ে নিল। অনেকদিন পরে প্রভু-দয়ালকে দেখে রতন খুশি হল। তার দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি লক্ষ্য করে পরম পরিতুষ্ট হল। মিশনারী স্কুলের ছাত্র সে। মনোরম পার্বত্য শহরে সে শিশুকাল থেকে প্রতিপালিত। মিশনারী সাহেব মেমদের প্রভাবে মন তার বেড়ে উঠেছে। সে পুরোপুরি সাহেব বনে গেছে।

রতন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে চেয়ে দেখে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না যে এই সুন্দর কিশোর তার গর্ভের সন্তান। প্রভুও মাঝে মাঝে বড় বড় কৌতুহল ভরা চোখের তীব্র দৃষ্টি দিয়ে এমনিভাবে তারপানে তাকায় যে সে লজ্জায় ঘেমে ওঠে। তার বাৎসল্য ব্যাহত হয়। তার মাতৃত্ব সঙ্কুচিত হয়। উচ্ছ্বাসের মত্ততায় তার ভিতরের মা হাত বাড়াতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নেয়। ছেলের ভাবলেশহীন উদাসীন মুখের পানে চেয়ে সে এগুতে পারে না। ছেলে নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কোন কথা উত্থাপন করতে চায়

না। মায়ের অন্তরের পানে সে চোখ ফেরাতে চায় না। প্রভু বলে, পরীক্ষার রেজাণ্ট বেরুলেই তার বিলেত যাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

রতন বলে, তা হলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। আমি আর একা এখানে কার কাছে থাকবো ?

প্রভু হাসে। তাচ্ছিল্যের হাসি। বলে, তুমি বিলেত গিয়ে করবে কী ?

—করবো আবার কী ? তোর কাছে থাকবো। তুই আমার কাছে থেকে পড়াশুনা করবি।

—তোমার কোন আইডিয়া নেই। দ্যাটস নো প্লেস ফর ইউ।

—আর কতোদিন আমি একলা থাকবো ? আমার জন্যে তোর একটুও মন কেমন করে না ?

প্রভু মুহূর্ত মায়ের মুখপানে স্থির নেত্রে তাকাল। তার মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। সে নিষ্প্রাণ নিষ্করুণ কণ্ঠে বললে, আমার শিক্ষা আমাকে সত্য বলতে শিখিয়েছে। সেই সত্যের মর্যাদা রাখতে হলে আমাকে স্বীকার করতে হবে আমার মন কেমন করে না। অতি দুঃখের কথা মা, মায়ের জন্যে আমার মনে একটুও ভিজে মাটি নেই। আমার মনের মাটিতে তো মায়ের স্নেহরস কোনদিন সিঞ্চিত হয়নি। আমার দুর্ভাগ্য, জীবনে মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেলুম না। নিজের মা-কে আমি চিনলুম না। রোগশয্যায় পীড়িত উত্তপ্ত ললাটে পেলুম না কোনদিন জননীর স্নেহশীতল স্পর্শ। যার পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যার জন্যে আমার অন্তরাত্মা হাহা করেছে।

প্রভু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে মায়ের একখানা হাত চেপে ধরে বলে উঠল, মায়ের ভালোবাসা দিয়ে কোনদিন সন্তানের ভালোবাসা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিলে ? সন্তানের ক্ষুধিত আত্মার মুখে কখন স্নেহামৃত তুলে ধরেছিলে ? না। না। তুমি আমায় অভাগিনী

পতিতার ছেলের মতো অনাথ আশ্রমে ফেলে দিয়েছিলে। শুধু একটি মাত্র কর্তব্য তুমি অকাতরে পালন করেছো। নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিমাসের নির্ধারিত দিনটিতে টাকা পাঠিয়েছো। কখনো তার অন্যথা হয়নি। তাই আমি ভাবতে পারি তুমি আমার মা। হয়তো বা তোমার আমি গর্ভের সন্তান। সেই অর্থের বিনিময়ে তুমি যদি সন্তানের হৃদয় জয় করবার প্রত্যাশা করে থাকো, ভুল করেছো মা। আমার মনের ও-দিকটা ফালতু জমির মত খাঁ-খাঁ করছে। ও-দিকে ফুল ফোটেনি শুধু তোমার অবহেলায়।

রতন অবাক হয়ে গেছে। বিস্ময়ের প্রচণ্ড আঘাতে সে অভিভূত হয়ে গেছে। তার বাকরোধ হয়ে গেল। তার নিষ্পলক নয়ন বেয়ে অশ্রুর দুটি ধারা নামল।

প্রভুর মনে হল মায়ের শরীরের স্পন্দন নেই। সে যেন শরীর থেকে মুছে গেছে। তার মনে মায়া জাগল। সে অন্তরে ব্যথিত হল।

সে বিগলিত স্নেহে মায়ের বেদনাবিধুর মুখের পানে মুহূর্ত চেয়ে দেখল। সে মুহূর্ত যেন একটা দীর্ঘ শতাব্দী। যেন অনন্তকাল। সে যেন আজ তার মাকে প্রথম দেখল। দেখল তার শিশু-মন দিয়ে। তার স্নেহ বুভুক্ষু মন তার সামনের ক্রন্দনরতা নারীর হৃদয়ের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অণু-পরমাণুতে গ্রাস করতে চাইল। তার প্রতিটি হৃদ-স্পন্দন সকাতরে মা-মা বলে চিৎকার করে ডাকতে চাইল। মাকে তার ভাল লাগল। মাকে তার সুন্দর মনে হল।

অস্থির আবেগে সে দৈবাৎ মাকে কাছে টেনে নিল। টেনে নিল একেবারে হৃদয়ের মধ্যে। রতন বালিকার মত তার বলিষ্ঠ আশ্লেষে নিজেকে মুক্ত করে দিল। অশ্রুপ্লাবিত মুখে প্রভুর গণ্ডে ও ললাটে চুম্বন করতে করতে আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, প্রভু! প্রভু! অভাগিনী মাকে তোর মার্জনা কর।

—তোমাকে আমায় ভালোবাসতে দাও মা। তোমাকে আমায় সেবা করতে দাও।

প্রভু তার আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিল।

অতীতের ঘুম থেকে জেগে উঠে রতন সে-দিন তার পুত্রকে চিনল। তার ভিতরের মা সে-দিন বাৎসল্যের অসামান্য সৌন্দর্য ও সুষমা দেখে মুগ্ধ হল। তার ভিতরের আর সব প্রবৃত্তিগুলো তার কাছে মাথা নত করল। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত পুত্রের অন্তরের স্নেহপিপাসা শুধু তাকে লজ্জা দেয়নি তার জীবনের অপার ব্যর্থতাকেই স্মরণে এনে দিয়েছিল। সেদিন সে প্রথম মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিল, স্নেহকাঙাল পুত্রের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের অর্থ। পুত্র সে। আকণ্ঠ অভিমানে সে তাকে যে ইঙ্গিত করে গেল তার অর্থ যেমন লজ্জাকর তেমনি অগৌরবের। অন্ধকারে চোখ বুজে সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল নারীর জ্যোতির্ময়ী মাতৃত্বের অপরূপ সৌন্দর্যকে। তার শুচিতা শুভ্রতাকে। তারই মাঝে নারীর মহিমা। তারই মাঝে নারীর ধর্ম।

আনন্দের উৎকট নেশায় সে তার মাতৃত্বের অপঘাত ঘটিয়েছে।

অতীত তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কুৎসিত কলঙ্কিত অতীত। অতীতের জীবন ছিল তার দুর্নীতির। ধর্ম ছিল না। প্রেমে বিশ্বাস ছিল না। দেহসম্ভোগকেই সবার উঁচুতে স্থান দিয়েছিল।

মনে তার প্রেমের দীপশিখা জ্বালল দিনেশ। তার স্তিমিত বাৎসল্যকে খুঁচিয়ে লেলিহান করে তুলল প্রভু। তার জ্যোতির্ময়ী মাতৃত্ব দু-হাত প্রসারিত করে সন্তানকে বুকে টেনে নিল। পুত্রের কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তাই হয়ে উঠল তার জীবনের সব চেয়ে বড় প্রেরণা।

সে সত্যিকার ভালবাসা পেয়েছে। পেল সন্তানের অকুণ্ঠ স্নেহ।

নিজেকে তার সুখি মনে হল।

কলকাতা ফিরে এসে এবার প্রভুর বিচ্ছেদ ব্যথা তাকে গভীর ভাবে বাজল। চোখের আড়ালে সে চিরদিন। তার বিরহ ব্যথায় কখনও সে কাতর হয় নি। এই কাতরতাই তার অন্তরের সত্য।

সত্যিকার জীবনের সুন্দর পথের সন্ধান পেয়েছে সে। সেই পথেই সে হাঁটবে।

সে ভিড় সহ্য করতে পারে না। সে বাঈজীর পেশা ছেড়ে দিল। রঙিন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ফেনিয়ে তুলে আর সে নিজেকে অশান্ত করে তুলতে চায় না। আর তার জীবনে কোন উচ্চাশা নেই। অর্থই যদি জীবনের শ্রেয় হয় তবে প্রচুর অর্থ তার করতলগত হয়েছে। তার মায়ের পরিত্যক্ত অর্থ তার ও প্রভুর পক্ষে অপর্যাপ্ত। প্রভুকে সে বিলেত পাঠাবে। কেম্বি জ পাশ করে সে বিলেত যাবে। সে ভাল ছেলে। তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। এতদিন সে তাকে ফাঁকি দিয়েছে। তার নায্য দাবীকে সে এড়িয়ে চলেছে। আর সে তাকে অবহেলা করবে না। তার সুখের জন্য সে প্রাণপাত করবে। তাকে সসম্মানে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে।

প্রভু তাকে মাতৃত্বে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। প্রভুর মত ছেলের মা সম্মানিত পরিচিতি বই কি! তাই সে নিজের জীবনকেও সুন্দর ও সুষ্ঠু করে তুলতে চায়। অতীতের আরাম বিলাসের সমারোহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে ডুব দিতে চায়। ভবিষ্যতে প্রভুর সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার যোগ্যতা অর্জন করতে চায়।

সে প্রভুর মা। সেই গৌরবময় পরিচয়ের মধ্যেই সে জীবনের অবশেষ করতে চায়। সেই হবে তার বাকি জীবনের একমাত্র সংজ্ঞা।

আর কেউ না জানুক, রতনের অন্তর্যামী জানে দিনেশের ভালবাসা তাকে বদলে দিয়েছে। তাকে সহজ, সুন্দর জীবনে

ফিরিয়ে এনেছে। পুরনো জীবনকে সে অস্বীকার করেছে দিনেশের ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে। দিনেশ শুধু তার প্রেমিক নয়। দিনেশ তার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। দিনেশ তার জীবন পুস্তকের প্রচ্ছদ। দিনেশ তার আশয় ও আশ্রয়। আদিম বাসনার আকৃতি থাকলেও তার মাঝে একটা অপরূপ সৌন্দর্য আছে। সে সৌন্দর্য চেতনাকে সে স্তব্ধতার অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় না। দিনেশ তার জীবনের কোলাহল কলরব থামিয়ে দিয়ে তার মাঝে বিশ্রামের বিরতি এনে দিয়েছে। একা দিনেশই তার জীবনের মৌনতাকে মুখর করে রেখেছে।

দিনেশই তার জীবনের আকাশ। সেই আকাশের আলোয় সে বাকি পথটুকু অতিক্রম করে যাবে।

গান সে গায়। গায় সে নিজের জন্য আর দিনেশের জন্য। জীবনের যত কিছু ব্যথা ব্যাকুলতা, আবেগ উচ্ছ্বাস মুক্তি পায় তার কণ্ঠ দিয়ে। সে গান কামনা-ফেনিল আবিল আবর্তের সৃষ্টি করে না। সে গান মনে মোহ জাগায় না। সে গান মনে বিস্ময় আনে। বিস্মৃতি আনে। সে শুধু কণ্ঠের গান নয়। সে অন্তরের অন্তরতম দেশের আকুল আর্তনাদ! সে তার আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য। প্রিয়তমের কাছে সর্বসমর্পণ।

রতনের মনের গুঞ্জরিত আনন্দ-বেদনা তার কণ্ঠের সুরে ভিজে অশ্রু হয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে আর তার সুরের বেদনা দিনেশের গভীরতম মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে তাকে ধ্যানমৌন করে তোলে।

রতনের সঙ্গ ও সেবা দিনেশের অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল। রতন তার চোখে মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। রতনের দুর্বল অধিকারের মধ্যেও ছিল অসীম জোর। সেই হৃদয়ের জোরেই সে দিনেশকে আয়ত্ত করেছিল। সে নিজেকে দান করে পরে দাবি করেছে। দিনেশও আদর করে তার হৃদয়ের শূন্য আসন তাকে ছেড়ে

—বেশ তাহলে বসে আলাপ করুন। তাড়িয়ে দিলেও অবিশ্যি কোন তুখ্যু ছিল না। তার জন্যেও তৈরি হয়েই এসেছি। তবে দেখেই মনে হলো তাড়িয়ে দেবার মানুষ নন আপনি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। মানুষের মুখই তো তার মনের আয়না।

হাসল রতন। রতনের বুঝতে বাকি নেই কোন স্বদেশী মেয়ে। দেশব্রতী। কিছু চাঁদা আদায় করতে এসেছে। পরনে রেশমী পাড় সাদা ধপধপে খদ্দরের শাড়ি। গায়ে রঙিন খদ্দরের নিমা। হিন্দুস্থানী ঢঙে শাড়ি পরা। মুখখানি কচি-কচি। রসাল টসটসে। আশ্চর্য মায়া-ভরা বড় বড় তুটি চোখ। হরিণ-চঞ্চল তুই চোখের শ্যামল গভীরতায় অদ্ভুত আলো চিকচিক করছে। ঠোঁটের কিনারে ক্ষীণ আলোক রেখার মত একটু লাজুক হাসি খেলা করছে। দেহে স্বাস্থ্যের বন্যা। যৌবন আর স্বাস্থ্য তার দেহে একটি অপরূপ শ্রী দিয়েছে। দেহের রঙ সোনার না হলেও তামাটে। গঙ্গা মাটির মত চিকণ আর মসৃণ তার দেহের ত্বক। পিঠের উপর ঘন এলো চুলের ঢেউ। ভিজে ছিল বলেই বোধ হয় বাঁধেনি। চুলের সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। টানা ভুরু তুটির মাঝে কাজলের একটি টিপ। মুখখানিকে তার সুন্দর মনে হলো। মেয়েটি তার মুখের উপর হতে উড়ো এলো চুলগুলোকে বাঁ হাতে সরিয়ে দিতে দিতে রতনের মুখপানে চেয়ে মৃত্যু হাসল।

রতন জিজ্ঞেস করলে, তোমার নাম কি ভাই ?

শুকনো ঠোঁট তুখানিকে জিভের রসে ভিজিয়ে নিয়ে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে, আমার নাম পার্বণী দিদির নাম তো রতন বাঈ ?

হাসল রতন। নাম ধাম জেনেই এসেছো ? মাথাটি ঈষৎ কাত করে পার্বণী বাঁকা চোখে তার পানে চেয়ে হাসল। বললে, কোথায় আসছি না জেনে আসবো কেমন করে ?

—তা বটে।

হেসে উঠল রতন। প্রাণখোলা মন-ভেজানো মধুর হাসি।

পার্বণীর গা সির সির করে।

রতনকে পার্বণী আকর্ষণ করেছে। তার হাবভাবে, কথার টানে, হাসির ছটায় এমন একটি স্বভাবজাত বিনয়ের কোমলতা আর ছেলেমানুষী সরলতা আছে যা তার দেহসৌষ্ঠবকে শ্যাম কিশলয়ের সৌন্দর্য শোভা দিয়েছে। মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে রতনের। তার নিঃসঙ্গ দুপুরের অনন্ত নির্জনতাকে তার মধুর সঙ্গ দিয়ে চঞ্চল করে তুলেছে। আনন্দমুখর করে তুলেছে।

রতনের মন দাক্ষিণ্যে উদ্বেল। সে পার্বণীর একখানি হাত নাড়তে নাড়তে সস্মিতমুখে প্রশ্ন করলে, বলো পার্বণী কী খাতির করবো? তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?

—খাতির করবে?

পার্বণীর বুক দুর-দুর করে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। সে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে ভেজাতে ভীরু লাজুক গলায় বললে, খাতিরের দাবি নিয়ে তো আসিনি দিদি। আমি ভিক্ষে করতে এসেছি। তোমার করুণা ভিক্ষে করতে এসেছি।

রতন আশ্বাসের কণ্ঠে হাসিমুখে বললে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তার জন্যে লজ্জা কী? সেও তো নিজের জন্যে নয়।

দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় জড় করে পার্বণী রতনের মুখের পানে চাইল: কী তুমি বুঝতে পেরেছো? কী ভেবেছো আমাকে তুমি?

তার ভয়ার্ত বিবর্ণ মুখের পানে চেয়ে রতনের মনে করুণা জাগল। সে তাকে অভয় দেবার ভঙ্গিতে কাছে টেনে নিয়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, আমি তোমার সম্বন্ধে অন্যায় কিছু ভাবিনি বোন।

দৈবাৎ তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানি চোখের সামনে তুলে ধরে বিগলিত স্নেহে বললে, এই সুন্দর মুখে অন্যায়ের কোন ছায়া আছে নাকি যে অন্যায় ভাববো?

রতনের স্নেহের উত্তাপে পার্বণীর চোখ দুটি বুঁজে এল। বোঁজা চোখের ফাটল চুঁইয়ে উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

রতন বললে, চোখের জল ফেলোনা ভাই, দুখ্যু লজ্জা করো না। তোমার মনের কথা খুলে আমায় বলো।

মুখ তুলে চোখ খুলে তাকাল পার্বণী। বললে, বলতেই তো এসেছি দিদি! না বলে আমার উপায় নেই। কিন্তু অভয় দিচ্ছো তো? বলবো? অপমান করে তাড়িয়ে দেবে না তো?

—ও কথা বলে আমায় লজ্জা দিচ্ছো কেন বোন। আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবো।

রতন আঁচলে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল।

পার্বণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমার চোখের জল মোছাতে একা তুমিই পারো।

—তোমার যদি তাই মনে হয়, তাই মনে করে যদি তুমি আমার কাছে এসে থাকো, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি তোমার দুখ্যু ঘোচাবো। তোমার মুখে হাসি ফোটাবো।

কল্পতরুর মতই বুক ফুলিয়ে রতন সোজা হয়ে তার মুখের পানে তাকাল। সে তো জানে না পার্বণী তার চোখ দুটি চেয়ে বসবে তার হৃৎপিণ্ডটা তাকে দান করতে বলবে।

পার্বণীর পরিচয় শুনেই আঁতকে উঠল রতন: পার্বণী দিনেশের বিবাহিতা স্ত্রী। শৈশবে বিবাহিতা পার্বণী ভাগলপুরে পিতৃগৃহে পালিতা। শ্বশুরকুলে পিতৃকুলে একটা মনোমালিন্যের ফলে তার শ্বশুরঘর করার সুযোগ হয়নি। স্বামীর সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয়নি। পার্বণীর পিতামাতার মৃত্যুর পর থেকে সে স্বামীর কাছে শ্বশুরঘরে আসবার বহু চেষ্টা করেও সফল হয়নি। সম্প্রতি সে গোপনে ভাইদের সংসার থেকে এখানে চলে আসে। শ্বশুর তাকে দয়া করে আশ্রয় দেন। কিন্তু দিনেশ তাকে স্ত্রীর অধিকার দিতে চায়

না। তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে চায় না। তার কোন সেবা নিতে চায় না। সে খোলাখুলি তার কাছে স্বীকার করেছে সে অন্য নারীতে আসক্ত। তার প্রণয়িনী আছে। সে তাকে ভালোবাসে। সেই তার জীবনের প্রথম ও একমাত্র নারী। তার হৃদয়ে অন্য নারীর স্থান নেই। প্রয়োজন বুঝলে সে তাকে বিবাহ করবে।

পার্বণী দিনেশের ধর্মপত্নী! দিনেশ বিবাহিত।...স্তম্ভিত হয়ে গেছে রতন। বিস্ময়ে সে বাণীহীন হয়ে গেছে।

॥ একুশ ॥

রতন পুড়ে খাঁটি হয়েছে। সেই খামখেয়ালি রতন সে নয়। ভালবাসার আঁচ লেগে সে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মেছে। আত্মত্যাগের শক্তি পেয়েছে সে। আত্মবলি দেবার প্রস্তুতি চলেছে তার মনে মনে। বলি তাকে দিতেই হবে। এ ত্যাগ তাকে স্বীকার করতেই হবে।

পার্বণী দুহাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়ে। সে তার স্বামীকে ফিরে চায়। তার স্বামীকে সে গ্রাস করে বসে আছে। দিনেশকে তার হাতে তুলে দিতে হবে। বুক ভেঙ্গে গেলেও পার্বণীকে সে নিরাশ করতে পারবে না। নির্ভীক, তেজস্বী মেয়ে। ঘর-সংসার, স্বামীপুত্র তার জীবনস্বপ্ন। সে-স্বপ্ন তার ভেঙ্গে দিতে পারবে না রতন। হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে ছিঁড়ে তাকে দান করতে হবে। স্বামীর সংসারের উপর তার অগাধ মমতা। স্বামীর সেবা করবার প্রত্যাশায়, শ্বশুরকুলের বধূরূপে প্রতিষ্ঠা ও পারিবারিক মর্যাদা পাবার লোভে সে দিশাহারা হয়ে ছুটে এসেছে ভায়ের আশ্রয় ছেড়ে। ভায়ের অমতে। স্বামীকে পাবার জন্য সে আকাশ-পাতাল করছে। স্বামীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েও সে আশা ছাড়েনি। কুলবধূর মানমর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়ে ছুটে এসেছে স্বামীর প্রণয়িনীর কাছে নিজের অধিকার ভিক্ষা করতে।

আশ্চর্য মেয়ে। স্বামীর উপর ঘৃণায় ও অভিমানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। নিজের সর্বনাশ করেনি। নিজের স্বত্ব, নিজের হৃত অধিকার উদ্ধার করবার এই অশেষ প্রয়াস ও অমিত নিষ্ঠা প্রশংসনীয় বই কি!

এ মেয়ে ভালবাসা দিয়ে দিনেশকে সুখি করতে পারবে। এর হাতে চোখ বুজে দিনেশকে তুলে দিতে পারলে দিনেশ সম্বন্ধে রতন নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

কিন্তু নিজে সে বাঁচবে কি নিয়ে? দিনেশ যে তার অস্থিমজ্জায় বাসা বেঁধেছে। দিনেশকে বাদ দিয়ে যে সে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না। এই নির্জনতার অন্ধকারে সে যে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে।

দিনেশের সঙ্গে চির বিচ্ছেদ তার জীবনে অপঘাত ঘটাবে।

কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি? পরের সম্পত্তি নিয়ে তো রাজত্ব করা চলে না। পরের দাম্পত্য জীবনে সে অভিশাপ হয়ে থাকবে না। তাদের জীবনের সংঘাতকে সে বিনষ্ট করে দিতে পারবে না। তারা সুখি হোক। তাদের জীবন সার্থক হোক।

দিনেশ পার্বণীর। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক দিনেশ তাকে ধর্মমতে শাস্ত্রমতে বিয়ে করেছে। তার শুভাশুভের সমস্ত দায়িত্ব-ভার দিনেশের। দিনেশ তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য।

দিনেশের বিয়োগ ব্যথা রতনের পক্ষে মর্মান্তিক। সেই অসহ্য ব্যথার ভারে যখন তার হৃদয়ের অনুভূতি ও দেহের ইন্দ্রিয়-চেতনা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে তখনি হবে তার প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষা। তখনি ঘটবে তার মোহমুক্তি। তখনি হবে তার নবজন্ম।

এ কাজ তাকে করতেই হবে। দিনেশের প্রেমই তাকে এ-কাজ করবার শক্তি দেবে। সাহস দেবে। প্রেমের জন্য কখন সে কোন গুরু দায়িত্ব মাথা পেতে নেয়নি। প্রেমের জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করেনি। করবার সুযোগ হয়নি। কারণ এর পূর্বে প্রেম কখন সত্য হয়ে দেখা দেয়নি।

দিনেশ-ই প্রথম তার মনে সত্যিকার প্রেমের আলো জ্বালল। দিনেশ-ই তার মনের অন্ধকার অবগুণ্ঠন মোচন করে তাকে নতুন

দিগন্তের সন্ধান দিল। সেই প্রেমের মর্যাদা দেবার জন্যই দিনেশকে তার মর্যাদার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দিনেশকে সে ত্যাগ করবে। দিনেশই তার জীবনের সম্ভোগ বাসনা। দিনেশই তার জীবনের কাম ও প্রেম। সে বৈরাগী হয়ে কামকে জয় করবে। প্রেমের সাধনা করবে ত্যাগের আসনে বসে। কিন্তু দিনেশকে শুধু ত্যাগ করেই তার কর্তব্যের শেষ হবে না। দিনেশকে তার দাম্পত্য জীবনে তাকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পার্বণীর স্বপ্নকে সার্থক ও সফল করতে হবে। তার মুখে হাসি ফোটাতে হবে।

আত্মগৌরবে ও আত্মপ্রসাদের গভীর তৃপ্তিতে তার মন ভরে যায়। একটা অনির্বচনীয় পুলকে, গৌরবে তার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অশ্রুর আভাসে তার চোখের পাতাগুলি থর থর করে কাঁপতে থাকে। ভিতরের আকাশ তার আলোয় আলোয় ভরে ওঠে।

হ্যাঁ। ত্যাগ তাকে করতেই হবে। ত্যাগের মহিমায় দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত। দেশের জন্য ত্যাগ তখনকার দিনের গরিমাময় ঐতিহ্য। ত্যাগের প্রতিকায় দেশবন্ধু তখন দেশের প্রতিভূ। দেশের বুকে বৈরাগ্যের বাতাস বইছে। দেশবাসী বিলাসব্যসন ত্যাগ করেছে। নারীর তনুদেহে উঠেছে মোটা খদ্দর। ত্যাগের প্রতীক খদ্দরই তখনকার একমাত্র কুলীন বেশ। ত্যাগের সাধনা করছে দেশবাসী। ত্যাগের মহিমাগান করছে। সে-টা ত্যাগের যুগ।

দেশের জন্য ত্যাগ। ধর্মের জন্য ত্যাগ। প্রেমের জন্য ত্যাগ।

রতন তার প্রেমের জন্য ত্যাগ করবে। তার অন্তরের প্রেমকে একটি মহান রূপ দেবে। সে তার এই ত্যাগের মহিমায় দুটি প্রাণীর হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবে। পার্বণী সে-দিন চাক্ষুষ করে গেছে দিনেশের প্রতি রতনের আসক্তির চেহারাটা। রতন পার্বণীর জন্য

চায়ের ব্যবস্থা করতে উঠে এসে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। পার্বণী এসে সস্নেহে তার মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে তাকে প্রবোধ দিয়েছিল। সান্ত্বনা দিয়েছিল। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল।

রতন পার্বণীর মন বোঝবার জন্য তাকে প্রশ্ন করেছিল, স্বামীকে না পেলে তুমি কী করবে পার্বণী?

অতল নিরাশার কণ্ঠে পার্বণী বলেছিল, কী আর করবো! স্বদেশী করে জেল খাটবো।

—তারপর? জেল থেকে বেরিয়ে এসে?

পার্বণী বলেছিল, স্বামীর ঘরেই ফিরে আসবো। তাড়িয়ে না দিলে সেইখানেই পড়ে থাকবো। চোখে দেখবো আর আড়াল থেকে যতোটুকু পারি ওর সেবা করবো।

—তবু ভায়েদের ঘরে ফিরে যাবে না?

—না। কেন যাবো? সধবা মেয়ে বাপের ঘরে থাকলে, স্বামীর অকল্যাণ হয়। নিজেকে বিধবা বলে মনে হয়। তাইতো পালিয়ে এলুম।

রতন অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে দেখেছিল। তার মুখের আয়নায় চিরন্তনী হিন্দুনারীর প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছিল।

পার্বণী বলেছিল, আমি ওকে আর চোখের আড়াল করে থাকতে পারবো না। যেখানেই থাকি প্রেতের মতো, ছায়ার মতো, আমি ওর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াবো। আমি ওর পত্নী, ওকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো?

রতন তাকে আদর করে বুকে টেনে নিয়ে নিজের অগোচরে ভাবাবেগে বলে ফেলেছিল, দিনেশকে যে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি। তাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

পার্বণী তার কণ্ঠবেষ্টন করে তার মুখচুম্বন করেছিল। রতন বলে উঠেছিল, ছিঃ।

দুষ্টু পার্বণী চোখ পাকিয়ে বলেছিল, ছি, কেন? আমার স্বামীর যদি প্রিয় হয়, আমার হবে না কেন? আমার স্বামীকে যে ভালোবাসে আমিও তাকে ভালোবাসি।

রতনের মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠেছিল। চোখ দুটি আনন্দাশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

রতন পার্বণীকে ভালবেসেছে। করুণায় মমতায় তার মন গলে গেছে। বাইশ তেইশ বছরের বিবাহিত মেয়ে, ভরা যৌবন অথচ দেহমনে আজো অনাহত কুমারী। স্বামীর সঙ্গ পেল না। প্রাণরসোচ্ছল জীবনের মাধুর্য উপভোগ করতে পেল না। স্বামীর স্পর্শ পেলে যৌবন কোরক উন্মিলিত হত। দেহে ফুল ফুটত ফল ধরত। এতদিনে দিনেশের সন্তানের জননী হত।

ছিঃ ছিঃ! রতনের লজ্জা হয়। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সে নিজের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। পরের অধিকার অপহরণ করে দস্যুর মত সে অবাধে তার উপর নিজের ভোগ-মন্দির গড়ল। আর যার অখণ্ড অধিকার, যার নির্বূঢ় স্বত্ব, সে উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশ্রী অকিঞ্চনের মত তার দোরে এসে হাত পেতে দাঁড়াল। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস।

রতন নিজেকে ভাঙ্গছে। অস্থিপঞ্জর ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করছে। সেই পঞ্জরাস্থি-চূর্ণ দিয়ে পার্বণীর জন্য পথ তৈরি করবে। সেই পথ দিয়ে সে পার্বণীকে দিনেশের কাছে পৌছে দেবে। নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তার পা রাঙিয়ে দেবে। ললাটে রক্ত কুঙ্কুম পরিয়ে দেবে। শ্মশান কালীর মত অমানিশার মহাশ্মশানে এসেছে পার্বণী তার শিবকে সন্ধান করতে। শিবকে শব ভেবে ভুল করে নিষ্ঠুর কামাচারী তান্ত্রিকের মত রতন তার বুকে সাধনার আসন পেতেছিল। সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ভুল বুঝতে পেরেছে। সে শিবকে জাগিয়ে তুলবে। তার মহাঘোর ভাঙ্গিয়ে দেবে।

দিনেশ ফিরে এসেছে।

রতন অলক্ষ্যে আড়াল থেকে কিছুক্ষণ তাকে দেখল। কী দেখল সেই জানে। তার চোখে সে কন্দর্প। রতনের গা কাঁপে, বুক কাঁপে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। সে পা টেনে টেনে মুখে হাসি ফুটিয়ে দিনেশের কাছে এসে দাঁড়াল। দিনেশ তার হাত ছুখানি জড়িয়ে ধরে মুখের পানে চেয়ে বলে উঠল, এমন শুকনো কেন? শরীর ভালো আছে তো?

হাসল রতন। শরীর কেন ভালো থাকবে না? তবে মনের কথা তোমার তো অজানা নয়। একলা। তোমার অদর্শন—।

—মন কেমন করছিল নাকি?

—ছটফট করছিলুম।

দিনেশের হাতের তালুতে মৃছু চাপ দিয়ে মোহিনী হাসি হাসল রতন।

দিনেশ বললে, তোমার হলো কি, তুমি যেন দিন দিন ছেলেমানুষ হয়ে যচ্ছো।

—তুমি কি আমায় বুড়ি করে দিতে চাও?

হেসে উঠল দিনেশ: আমার সাধ্য কি? সময় পারলে না তা আমি? তোমার বয়স, তোমার যৌবন স্থিরপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি রতন, কে বলবে সতেরো আঠারো বছরের ছেলের তুমি মা।

হাসতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছিটকে এল তার বুকের তলা থেকে। সে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বললে, তা নইলে কি তোমাকে ধরে রাখতে পারতুম?

দিনেশ তার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, ধরে কি তুমি আমায় রেখেছো বিবি সায়েব। ধরে রেখেছি আমি তোমাকে।

—তুমি?—

রতন কি-যেন বলতে গিয়ে সহসা থেমে গেল। নির্নিমেষে

দিনেশের চোখের পানে চাইল। অপরূপ সুন্দর দুটি চোখ। সেই চোখের অতলে কী যেন সে খুঁজতে লাগল।

পার্বণীর ছায়া কি?

পার্বণী প্রসঙ্গটা উত্থাপন করবার জন্য সে হাঁস-ফাঁস করছে অথচ পারছে না। পারছে না তাকে আকস্মিকের আঘাতে চমকে দিতে। শুধু চমকে যাবে না, সে প্রচণ্ড লজ্জা পাবে। সে যে বিবাহিত, এ-কথা সে কোনদিন রতনকে বলেনি তো। তাই সে সূত্র খুঁজছে। পার্বণীকে তাদের মাঝে এনে দাঁড় করাতে না পারলে সে যেন সহজ হয়ে নিশ্বাস নিতে পারছে না। অথচ তার মনের দৃঢ় বিশ্বাস একবার কথাটা সাহস করে বলে ফেলতে পারলে দিনেশ কখনো তার কাছে সত্য গোপন করবে না।

কিন্তু কথাটাকে সে উচ্চারণ দেয় কেমন করে? পার্বণীর আগমন-বৃত্তান্ত তার কাছে সে গোপন রাখতে চায়। পার্বণীকে সে খাটো করতে চায় না।

—কী ভাবছো বলোতো? কেমন যেন আনমনা হয়ে আছো। দিনেশ অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ছলনাময়ী রতনকে নতুন করে ছলনার আশ্রয় নিতে হলো। সে সোহাগের কণ্ঠে বললে, ভাবছি তোমাকেই। তোমাকে ভাবতে ভাবতেই আনমনা হয়ে পড়ছি। দেহ অবশ হয়ে আসছে। ভাবা তোমাকে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু এ ক-দিন একটু বেশী ভাবছি। কি মাথামুণ্ডু ভাবছি আর ছাইভস্ম স্বপ্ন দেখছি তুমি শুনলে হাসবে। এমন তো কখনো হয় না।

তাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে দিনেশ বললে, তোমার মন বড় পাতলা।

—মন পাতলা তো হবেই। অধিকার যে দুর্বল। সদাই একটা আতঙ্কিত ভাব। হারাই হারাই ভয়।

—ও-সব মনের জোয়ার-ভাটা। সশব্দে হেসে উঠল দিনেশ।

রতন তার বুকের উপর হেলে পড়ে কুটিল ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে, স্বপ্নের কথা শুনলে তো তুমি আরো হাসবে। কিন্তু আমার এমনি ভয় করে মনে করতে যে—

রতন যেন বিভীষিকা দেখে চোখ বুজল। বললে, সে যেন প্রেতের মত, ছায়ার মত আমায় ভর করে আছে। ক-দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

দিনেশ তাকে বুকে চেপে ধরে প্রশ্ন করল, কে সে ? শোহনলাল না তোমার মা ?

—না। না। তা-রা নয়। একটি অপরিচিত মেয়ে। সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী তরুণী। আশ্চর্য স্বপ্ন। সে বলে সে তোমার বউ। আমাকে সে কখন গালাগাল দিয়ে বলে চোর, কসবী। পরের স্বামীকে তুমি গ্রাস করে বসে আছো, আবার কখনো হাতজোড় করে তোমাকে আমার কাছে ভিক্ষে চায়। কতো কাঁদে। কী আশ্চর্য স্বপ্ন বলোতো ? একদিন নয় উপরো-উপরি ক-দিনই ঐ এক স্বপ্ন। দিনের বেলা পর্যন্ত ঘুমের মাঝে ঐ স্বপ্ন দেখেছি। তন্দ্রার ঘোরে তার কান্না শুনেছি। অথচ আমি তো জানি তোমার বিয়ে হয়নি।

কথা বলতে বলতে রতন চোরা চোখে দিনেশের মুখের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করছিল। তার মুখের ওপর থেকে ধীরে ধীরে একখানা যবনিকা সরে যাচ্ছে। ভোরের তিমিরাচ্ছন্ন আকাশপটে দিনের আলো ফুটছে। সত্য আত্ম-প্রকাশ করছে। দিনেশের আত্মার সত্য তার মুখে ফুটে উঠছে। রতনের স্বপ্নের ধারালো সত্য তার মিথ্যার ভিত ধ্বসিয়ে দিয়েছে। এইবার সে ভেঙ্গে পড়বে।

রতন উর্ধ্বশ্বাসে তার মুখপানে চেয়ে আছে। তার বুক দুর-দুর করছে।

দিনেশ হঠাৎ মেঝের উপর নতজানু হয়ে রতনের হাঁটুর ওপর মুখ রাখল। অপরাধীর মত ভীরু কম্পিত স্বরে বললে, তুমি জানোনা

রতন বিয়ে আমার হয়েছে। আমার শিশুকালে। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে সম্প্রতি সে নিজে থেকে ফিরে এসেছে। তার অধিকার দাবি করতে।

—সত্যি ?

আর্তস্বরে প্রশ্ন করল রতন।

—সত্যি রতন সত্যি। তোমার এ স্বপ্ন নয়। জীবন্ত সত্য। আমিই তোমাকে বলবো ভেবেছিলুম কিন্তু তোমার মনে আঘাত করতে সাহস হয়নি। তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি।

রতনের মর্মান্তমূল থেকে একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল : স্বপ্নও তা হলে সত্য হয় ?

দিনেশ বললে, এ-তো স্বপ্ন নয়। এ অলক্ষ্যের অদ্ভুত চক্রান্ত। এ নিয়তির নির্বন্ধ। এ আকাশবাণী।

রতন ঘুমন্ত মানুষের মত বললে, হ্যাঁ। আকাশবাণী। আমাদের মনের একই আকাশ। একের ব্যথার ঝঙ্কার অপরের বুকে কাঁপন জাগায়। একই বীণার দুটি তারের মত। একের স্পন্দন অপরকে স্পন্দিত করে।

রতনের মুখখানা গাম্ভীর্যে থমথম করছে। মন তার অবগাহিত। তার সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মিশে আছে একটা সংশয়ের আভাস। দিনেশ তার মুখপানে তাকাতে পারে না। সে লজ্জায় আধমরা।

রতন অর্ধস্ফুটস্বরে বললে, আমি একটা সঙ্কেত পেয়েছিলুম। অশুভ কিছু একটা ঘটবে।

—কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো ?

অসহায় ভয়ার্ত মুখ তুলে রতনের মুখপানে তাকাল দিনেশ।

রতন তার ভাবনা থেকে হঠাৎ চমকে উঠল। দিনেশ তাকে তার উদ্বেগের গভীর থেকে টেনে তুলেছে। কোন জবাব না দিয়ে

রতন তার বড় বড় দুইচোখ বিস্ফারিত করে দিনেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দিনেশের মুখখানা পাংশু, বিবর্ণ। একটা ফয়সালা করবার জন্য সে যেন উন্মুখ হয়ে আছে। রতনের মনে করুণা জাগে। সে ঈষৎ অবনত হয়ে তার মাথার চুলের উপর একখানি হাত রাখল। তার স্নেহস্পর্শের উচ্ছ্বাসে দিনেশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে অগাধ অসহায় কণ্ঠে বলে উঠল, আমায় বাঁচাও তুমি রতন। বলে দাও আমি কি করবো?

—আমি বলে দেবো তুমি কি করবে? রতনের অধরে মৃদু হাসির রেখা। সে তার চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে প্রশ্ন করল, সে তোমায় ভালোবাসে?

—আমি জানবো কেমন করে? আমার সঙ্গে তার কোন হৃদ্যতা নেই। ঘনিষ্ঠতা নেই।

—আমি তোমায় বিশ্বাস করি। অত জোর দিয়ে বলতে হবে না।

একটু থামল। একটু হাসল রতন। একটু চোখ ঘুরিয়ে মাথা নেড়ে বললে, ভালোবাসলেও আমার মতো ভালোবাসতে পারবে না নিশ্চয়ই। কি গো, পারবে? না পারবে না। তুমিও পারবে না আমার মতো তাকে ভালোবাসতে।

উচ্ছ্বসিত আবেগে, ঘোষণা করার ভঙ্গিতে দিনেশ বলে উঠল, না। না। এ ভালোবাসা কারুকে আমি দিতে পারবো না। আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা। এ তো ভালোবাসা নয় এ আমার হৃৎপিণ্ড। আমার প্রাণবায়ু।

—আমি জানি। এ ভালোবাসা সে পাবে কোথা? তার ছোট্ট বুকে এ উন্মাদনার ঠাঁই কোথা? এ প্রেম বন্ধনহীন। এ প্রেম লক্ষ্যহীন। আদর্শহীন। এ ভালোবাসা গৃহী নয়। এ ভালোবাসার শৃঙ্খলা নেই। নীতি-দুর্নীতি নেই। পাপ-পুণ্য নেই।

এ লোকমত মানে না। লোকনিন্দা গ্রাহ্য করে না। লোকলজ্জার কুণ্ঠা নেই। এ নির্বাধ। নিষ্কম্প। নির্ভয়। এ প্রেমের স্বাদ সে পাবে কোথা থেকে? সে তো অভিসারিকা নয়।

একটু থেমে প্রশ্ন করলে, তা মেয়েটা দেখতে কেমন গো?

—কে জানে, আমি ভালো করে দেখিনি পর্যন্ত।

—তাই সম্ভব। আমারো তাই বিশ্বাস। মেয়েটা তোমার বাড়িতে রয়েছে তো?

—উপায় কি? তাড়িয়ে তো দেওয়া যায় না।

—ছিঃ।

—বাবার কাছে কাছেই থাকে। বাবার সেবা যত্নও নাকি করে।

—আর তোমার?

—আমার কাছ ঘেঁষতে সাহস করে না।

—কাজ কর্মও তোমার কিছু করে না?

—আমি না থাকলে ঘরে ঢোকে কিনা জানি না।

তির্যক ভঙ্গিতে মাথা কাত করে রতন প্রশ্ন করল, তোমার বউয়ের নাম কি গো?

—তা জেনে তোমার কি হবে?

ভ্রূভঙ্গি করল দিনেশ।

রতন তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললে, জানতে দোষ কি? বলোনা।

—পার্বণী।

—পার্বণী না পার্বতী?

—পার্বণী।

—বেশ নাম তো। নামের মাঝে বিনয় আছে।

—বিষও আছে। খদ্দর পরেন। দেশব্রতী।

রতন হাসল: সে তো যুগের হাওয়া।

দিনেশ বললে, কিন্তু কী করা যায় বলোতো, একটা পরামর্শ দাওনা।

রতন হেসে উঠল ঃ আমি পরামর্শ দোব? ভালো পরামর্শের লোক ঠাউরেছো তো? ডাইনীর হাতে ছেলে সমর্পণ?

—সত্যি রতন, আমিও বিব্রত হয়ে উঠেছি। কোথা থেকে এ ঝুট-ঝামেলা যে এলো এই এদ্দিন পরে?

রতন মিটিমিটি হাসে।

দিনেশ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে, তোমার যে খুব আনন্দ দেখছি?

রতন হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে তার গায়ে। বলে, তোমারো তো আনন্দ হওয়া উচিত। আনন্দের কথা যে গো, এতোদিন পরে—

সুর করে ভাউ বাতলে গেয়ে ওঠে ঃ

"পিয়া ঘর আয়ে"—আনন্দ হবে না? আমার তো তোমাদের দু-মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

—আমায় ক্ষেপিয়ো না রতন।

—আমার সঙ্গে তোমার বউ-এর আলাপ করিয়ে দাও দিনেশ। তাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। লক্ষ্মীটি, একবার দেখাও ভাই! আমার স্বপ্নে-দেখা মেয়েটির সঙ্গে এর কোন মিল আছে কিনা দেখতে চাই।

মন্দ কি! দিনেশ পার্বণীকে খোলাখুলি বলেছে রতনের কথা। বলেছে সে তাকে ভালবাসে। স্বামী স্ত্রীর মত তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করছে। বিয়ে না হলেও তাদের প্রেমে তাদের মিলন সত্য হয়েছে। সে বাঁধন ভাঙবার নয় ছেঁড়বার নয়। দেখে যাক না পার্বণী আসল মানুষটাকে। দেখে যাক সে তার চেয়ে কত সুন্দর। অনুভব করে যাক তাদের বাঁধনের কাঠিন্যটা।

রতন বললে, তোমার কোন ভয় নেই, আমি তাকে অপমান করবো না। তার অসম্মান হবে না। তাকে আমি খাতির করবো।

তাকে আমার দেখবার দুরন্ত লোভ হচ্ছে। তার মনের কথাটাও সেই সঙ্গে জেনে নিতে পারবো।

—মনের কথা আবার জানবে কি? আমার বুকের ওপর বসে রাজত্ব করতে চান।

রতন গম্ভীর হয়ে গাঢ়স্বরে বললে, চাইবেই তো। রাজত্ব যে তার। ইংরেজের মতো গায়ের জোরে তার অধিকার আমি দখল করে বসে আছি বই তো নয়।

—পারে, তার শক্তি থাকে, কেড়ে নিক।

ভ্রূভঙ্গি করে রতন বললে, বড়াই করো না গো। শক্তি তার আছে। তুমিই তো এখুনি বলছিলে বিষ আছে। খদ্দর পরে।

—তা পরে। তাতে কি?

—তাতেই সব। ঐ খদ্দরই দেশ থেকে ইংরেজকে তাড়াবে। আমাকেও ঘাল করবে।

হেসে উঠল দিনেশ: তুমি খদ্দরকে ভয় করো?

—না। খদ্দরকে ভয় করি না। ভয় করি সতী নারীর নিষ্ঠাকে। ওর খদ্দর সেই নিষ্ঠা। ওর ব্রত। সতী নারীকে আমি শ্রদ্ধা করি। পূজা করি। সে আমার প্রণম্য।

রতন হাতদুটি জড়ো করে কপালে ঠেকাতে গিয়ে চমকে উঠল। সে বড় বড় চোখ দুটি আরো বড় করে দরজার দিকে চেয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বলে উঠল, তুমি?

মুক্ত দরজার ফাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে পার্বণী। পার্বণী ধীরপায়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, হ্যাঁ, দিদি, আমি তোমার ছোট-বোন। বাড়িতে বড় বিপদ। বাবার খুব অসুখ। তাই বাধ্য হয়ে আমায় ছুটে আসতে হলো। ওঁর সন্ধান তো আর কেউ জানে না।

কঙ্কাল গলায় ভাষা পেল। কঙ্কালের মতই এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল দিনেশ। সে চকিতে বলে উঠল, বাবার অসুখ?

—হ্যাঁ। বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাই তোমায় নিতে এলুম।

পার্বণী দিনেশের পানে মুখ তুলে চাইল।

দিনেশ রতনকে উদ্দেশ করে বললে, চললুম।

পার্বণী রতনের একখানি হাত ধরে দ্বিধাজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তুমি?

রতন স্থির শুভ্র কণ্ঠে বললে, আমি? আমার তো অধিকার নেই ভাই। ভাগ্যবতী তুমি। স্বামীর সহায় হয়ে পূজনীয় শ্বশুরের সেবার ভার তুলে নাও।

রতন পার্বণীর হাতখানি দিনেশের হাতে সমর্পণ করে বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললে, আমি নিঃস্বত্ব হয়ে তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়ে দিলুম।

॥ বাইশ ॥

বিচারে দেবশ্রীর ছ-মাস জেল হয়েছে। সে সগৌরবে কারাবরণ করেছে। তার জীবনাদর্শ ভিন্ন হলেও সে সাময়িক ভাবস্রোতে ভেসে যায়নি। সে যা সত্য বলে ভেবেছে, কর্তব্য বলে জেনেছে তা থেকে কেউ তাকে টলাতে পারেনি। 'ফরওয়ার্ড' পত্রে যোগদান করেই সে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক রূপে পরিগণিত হয়েছিল। তার রচনা শৈলী এবং ইংরাজী ভাষার উপর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তার রচিত সম্পাদকীয় কয়েকটি নিবন্ধ ইংরেজ মহলকে চমকে দিয়েছিল। চঞ্চল করে তুলেছিল।

অনিমেষ সত্যিই বলেছিল, ওর আঙুল দিয়ে শুধু তবলার মিঠে বুলি বেরোয় না। ওর আঙুলের ডগা দিয়ে আগুন ঝরে।

অনিমেষ আর দেবিকা তার এই কারাবরণকে তার জীবনের পরম গৌরবময় ঘটনা বলে গ্রহণ করল। তার পিতা অশ্বিনী কিন্তু ভেঙ্গে পড়ল। ছোট-মা তাকে সান্ত্বনা দিল। প্রবোধ দিয়ে বলল, ছেলে তোমার মুখ উজ্জ্বল করেছে তার গৌরবের প্রতিধ্বনি তোমার বংশকে গৌরবান্বিত করেছে। তুমি অমন মুখ কালো করো না বাপু, ছেলের অকল্যাণ হবে।

অশ্বিনী আর্দ্রগলায় বললে, তার এই অসাধারণ প্রতিভা আমার সর্বনাশ করল। কী যে ঝড় উঠলো দেশে, সব তছনচ করে দিল।

—সে তো একা তোমার ছেলে নয়। সারা দেশ দুলে উঠেছে। বাসুকী মাথা তুলেছে।

অশ্বিনী চোখ বুঁজে ভবিষ্যৎ দিগন্তের চেহারাটা কল্পনা করে।

মেয়ে জামায়ের জন্যও উদ্বেগ তার কম নয়। বিলেত-ফেরত জামাই করল, কপাল দোষে উলটো হল।

ছোট মা হাসতে হাসতে বলে, সব চেয়ে আশ্চর্য ঐ দেবি। ও যেন চোখের পালটে বদলে গেল। কে বলবে ও আমাদের সেই মেয়ে। ওর হাব ভাব, চলন বলন সব যেন দেখতে দেখতে বদলে গেল। ও যেন অনিমেষের বউ হয়েই জন্মেছিল। ও যখন মোটা খদ্দরের শাড়ি পরে ভবিষ্যযুক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় আমি অবাক হয়ে ওর পানে চেয়ে থাকি। মনে হয় কী সুন্দর ওকে মানিয়েছে। গয়না-গাটি, রেশম সিল্ক পরে সহস্র সাজলেও ওকে এর চেয়ে ভালো মানাতো না। যেন দেশমায়ের ছবি। আর কি-সব কথা বলে গো? মনে হয় সারা দুনিয়ার ইতিহাস ওর কণ্ঠস্থ। সারা পৃথিবীর খবর ওর নখদর্পণে। এ-সব ও শিখলো কবে, শিখলো কার কাছে। অদ্ভুত মনে হয়।

অশ্বিনী তার মুখপানে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসে। গৌরবে তার চোখদুটি চিক চিক করে।

ছোট-মা উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বলে, আর তোমার সেই ভীতু পা-জড়ানো মেয়ের সাহস দেখলে তুমি চমকে যাবে। কী বক্তৃতা দেয় গো! গলায় যেন শাঁক বাজে। আর কি দুর্জয় সাহস। তোমাকে লুকিয়ে একদিন মেয়েদের পার্কে মিটিং শুনতে গিয়েছিলুম। আসলে গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে দর্শন করতে। গিয়ে দেখি বাসন্তী দেবীর পাশে বসে আছে আমাদের দেবি। গিয়ে তো আমি ভয়ে মরি। পার্ক ভরে গেছে লাল পাগড়িতে। মেয়েদের মিটিং। তবুও লাঠি হাতে পুলিশ এসে পার্ক ঘেরাও করেছে। শুনলুম পুলিশ মিটিং করতে দেবে না। তবুও মিটিং আরম্ভ হলো বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে। বাসন্তী দেবী বক্তৃতা করতে উঠলেন। পুলিশ বাধা দিল। অনুনয় বিনয় করল সভাভঙ্গ করবার জন্যে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সমবেত

মেয়ের দল। ভয়ে ভয়ে অনেকে পার্ক থেকে সরে পড়ছিল। হঠাৎ দেবি উঠে দাঁড়াল। শাণিত কণ্ঠে ঝলসে উঠল, দাঁড়ান। যাবেন না। সভা আমাদের চলবে। পুলিশের সাধ্য নেই আমাদের সভা ভেঙ্গে দেয়। পুলিশের নিষেধ আমরা মানবো না। তাদের হুকুম অমান্য করবো বলেই এ সভা ডেকেছি। আপনারা ভয় পাবেন না। পুলিশের সাধ্য নেই আপনাদের অঙ্গে হাত দেয়। আপনাদের ওপর বল প্রয়োগ করে। যতক্ষণ না পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করে ততক্ষণ সভা চলবে।⋯ ⋯আমার চোখের পলক পড়ল না। আমি পাথরের মত শক্ত হয়ে নিষ্পলক চোখে তার পানে তাকিয়ে রইলুম। সে রূপের তুলনা দিতে নারি। সে রূপ মানুষের নয়। বিশ্বপ্রকৃতির। তার দুই চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। অধরে কঠিন সঙ্কল্প, শুভ্র ললাটে দুর্জয় দৃঢ়তা। দুই পায়ে শক্তি ও সাহস। ঋজু হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দর্প। আমার দেবি! মনে করতেও গৌরবে বুক দশ হাত হয়ে উঠল। পাড়ার মেয়েরা, যাদের সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম তারা অভিনন্দন জানাল দেবির মাকে।

অশ্বিনী প্রশ্ন করল, সেইদিন পুলিশ ওদের অ্যারেষ্ট করে?

—হ্যাঁ, সে এক দৃশ্য। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে তাদের পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ফুলের মালায় বাসন্তী দেবী, আর দেবিকার বুক ভরে গেল। সে যদি দেখতে চক্ষু সার্থক হত।

চক্ষু সার্থক হতো কিনা কে জানে। তবে চোখ দুটি অশ্বিনীর অশ্রুতে আকুল হয়ে উঠল। সে ভাবাবেগে রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তাই তো বলছিলুম ওদের ভাইবোনের প্রতিভা ওদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ছোট-মা সহাস্যে প্রশ্ন করল, এ প্রতিভা কার, তোমার না ওদের মায়ের?

অশ্বিনী দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে শূন্যদৃষ্টিতে তার প্রথমার ব্রোমাইড করা ছবিখানার পানে তাকাল।

ছোট-মার মনে হল, ভাগ্যবতী অভাগিনী।

কেশর লক্ষ্ণৌ-এ।

দেবশ্রী জেলে।

কলকাতা-লক্ষ্ণৌ অনেকটা কাছাকাছি হয়েছিল। কিন্তু জেল তাদের দূরত্ব বাড়িয়ে দিল। এতদিন যা অবারিত ছিল এখন তা নিবারিত। পথ সুগম হলেও অনধিগম্য দেব দেউল। তীর্থে পৌঁছলেও দেবশীলার দর্শন মিলবে না।

অদর্শনের অসহিষ্ণুতা ছিল না এতদিন। বিরহে হয়তো বা একটা সূক্ষ্ম সুর ছিল। অস্থিরতা ছিল না। ছিল না কাতরতা। কারণ বাধা-নিষেধ ছিল না এতদিন। এই লৌহকারার দুর্ভেদ্য আড়াল হঠাৎ কেশরের অন্তরের প্রীতিউচ্ছ্বাসকে বাধাস্ফীত প্লাবনের গতিবেগ দিল। বাইরেটাকে সে শান্ত রাখলেও ভিতরটা তার বর্ষার খরস্রোতা গোমতীর মত উচ্ছল ও উত্তরঙ্গ হয়ে কূল ছাপিয়ে, তট ভেঙে উন্মত্ত বেগে ছুটে চলল। আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আর সে কোন বাধা-নিষেধ মানতে চায় না। দুর্বার দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল। আর সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় না। মনে যে ফুল ফুটেছে সে ফুল সে লোকচক্ষের আড়ালে রাখতে চায় না। তাকে সে দেখাতে চায়। প্রকাশ করতে চায়। প্রচার করতে চায়। আর সে আত্মগোপন করবে না। নিজের গৌরবময় পরিচিতি-কে আর সে বাঈজীর খোলস চাপা দিয়ে রাখবে না।

না। আর তাদের আলাদা করা যাবে না। গোমতীর জল-মাটি গঙ্গার জলমাটির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। দেবশ্রীর মাঝে কেশর লুপ্ত হয়ে গেছে। তার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

দেহ ছাড়া আর সব সে দেবশ্রীকে অর্পণ করেছে। এবার কলকাতা গিয়ে সে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করেছে। দেবশ্রী তাকে চায়। দেবশ্রীর জীবনে অন্য নারীর স্থান হবে না। তাই সে তার পিতার ইচ্ছাকে সম্মান দিতে পারে না। সুলতার পিতার প্রস্তাবকে সে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেছে। দেবশ্রীকে সুখি করবার জন্য নিজেকে আর লুকিয়ে রেখে ছায়ার মধ্যে বাস করা চলবে না। নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টি দেবারও সময় এসেছে। আর এমনভাবে চলতে পারে না। হোক সে দেবশ্রীর চেয়ে বয়সে বড়। কী যায় আসে; সে পুরুষ। সে তার চেয়ে অনেক বলবান ও শক্তিশালী। বিশাল বনস্পতির মত তার বলিষ্ঠ পৌরুষের কাছে সে ক্ষীণকায়া লজ্জাবতী লতা। পরিণত পৌরুষের প্রভাবে সব মেয়েই বয়স হারিয়ে ফেলে। প্রেমের তীব্রতায় বিধবাও লজ্জাভীরু কুমারী মেয়ের মত সসঙ্কোচে পুরুষের আলিঙ্গনে ধরা দেয়। প্রেমের চোখে বয়স নগণ্য। যৌবন তো বয়সের সমানুপাতে পা ফেলে চলে না।

বয়স কেশরের বেশী হলেও দেবশ্রীর যৌবন সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠেছে। সে-ই তার অধীন। দেবশ্রীই তার বড়। তার সমস্ত চলা-ফেরায় এমন একটা বরিষ্ঠতা আছে যে তার কাছে তাকে মাথা নত করতে হয়। অমোঘ নিয়তির মত তাকে তার জীবনের পুরুষ ও প্রভু বলে মেনে নিতে হয়। তার তরুণ অথচ সতেজ যৌবন যেন একটা উত্তপ্ত শিখার মত তাকে গলাতে থাকে। তার অস্থি ভেদ করে মর্মমূলে গিয়ে প্রবেশ করে তার যৌবনের তাপ প্রবাহ। অদৃশ্য কোন শক্তি যেন তাদের যুক্ত করে দিয়েছে। তাদের আর আলাদা করা সম্ভব নয়। আর তার নিজেকে দুভাগ করে চেতনার দুই স্তরে বাস করা চলবে না। দেবশ্রীকে সে আর মুহূর্ত চেতনা থেকে সরাতে পারবে না।

কেশরের আর কোন চিন্তা নেই। দেবশ্রীকে ছাড়া আর কোন কিছুই সে চেতনা দিয়ে ধরতে পারে না। দেবশ্রী যেন সর্বক্ষণ তার

সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে আছে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে বুকের মাঝে তার কায়িক উপস্থিতি অনুভব করে। তার মোহময় স্পর্শের কুহকে রক্তে তার আগুন ধরে যায়। আগুন যেমন শুকনো পাতার স্তূপের উপর লেলিহান হয়ে ওঠে তেমনি তার শরীরের শিরা উপশিরাগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। পোষা জন্তুর কোমল লোমশ থাবার নিচের ধারাল নখর দিয়ে তার উন্নত বুক দুটিকে ক্ষত বিক্ষত করে তোলে। আদরে সোহাগে, আশ্লেষে চুম্বনে, নিপীড়নেও নিষ্পেষণে তার তনু দেহকে আহত ও অভিনন্দিত করে। সে বিধ্বস্ত বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। এক অনির্বচনীয় আনন্দ যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। বাস্তবের নির্মম শূন্যতায় তার অন্তর জুড়ে একটা হাহাকার ওঠে। নিষুপ্ত রাত্রির নির্জনতায় দেবশ্রীর বিরহ ব্যথা পাষাণভারের মত তার বুক চেপে ধরে। তার চোখদুটি অশ্রুতে আকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় তার বুকটা খালি হয়ে গেছে। তার হৃৎপিণ্ড নেই। হৃৎপিণ্ড যেখানে ছিল সেখানে দেবুর বিচ্ছেদব্যথা অন্ধকারের মত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

এ-ধরণের আকুলতার সঙ্গে পূর্বে তার পরিচয় ছিল না। দেবুকে তার ভাল লাগত, দেবুকে সে স্নেহ করত। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তার উপর কোন লোভ ছিল না। পরস্পরের এ ধরণের সম্বন্ধের কল্পনাও তার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঠেকত। ভারি কুৎসিত মনে হত। দেবশ্রীর কাছে এই ধরণের আত্মসমর্পণের চিন্তা তার মনে বিভীষিকা জাগাত। তার কুমারী দেহ লজ্জায় ও আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে উঠত। দেবুকে ভালবাসলেও এ-ভাবে তার কাছে ধরা দেবার কথা কোনদিনই তার মনে হয়নি। মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠত।

তার গোপন মনের এই লোভের চেহারাটা প্রথম তার কাছে প্রকট হয়ে উঠল কলকাতায় যে-দিন সে অনিমেষের কাছে তার

গ্রেপ্তারের সংবাদ পেল। সংবাদটা একটা প্রচণ্ড আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। সে নিজেকে ভুলে গেল। দেবশ্রী যে তার প্রাণমূল সেইদিন সে প্রথম উপলব্ধি করল। সে অনাবৃত হয়ে জীবনের উত্তাপ অনুভব করল। হৃদয়ের দুঃসহ ব্যথার মধ্যেই সে জীবনের তপ্ত স্বাদ পেল। দ্বিধা, সংশয়, লজ্জা ভয় অতিক্রম করে সে নিজেকে ছেড়ে দিল। হৃদয়কে মুক্ত করে দিল তার দিকে। ধরা দিল তার ব্যগ্র বাহুর আলিঙ্গনে। উষ্ণ অশ্রুধারায় তার কাঁধ ও গলা ভিজিয়ে দিল। দেবশ্রীর আসন্ন বিয়োগব্যথা তাকে আত্মহারা করে দিল।

দেবশ্রী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সে নিঃশব্দে, নিজের অগোচরে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। সে বিস্মিত, বিমূঢ় ও ভয়ে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল। তার কাঁধের খাঁজে কেশর তার মুখখানাকে ডুবিয়ে দিয়ে অসহায় বালিকার মত কেঁদেছিল। দেবশ্রী তার এলোমেলো চুলের দিকে আকুল চোখে চেয়ে রইল। কেশরের নগ্ন মুখের স্পর্শে, তার তপ্তশ্বাসে ও উষ্ণ অশ্রুধারায় তাঁর কাঁধের ভিতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ শরীর বেয়ে নেমে গেল। তার দিক থেকে চোখ ফেরাবার শক্তি রইল না। তাকে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা রইল না। কেশর যেন তার শরীরটাকে সাপের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার মুক্ত হবার ক্ষমতা নেই। ইচ্ছাও বুঝি বা নেই। তার সমস্ত শক্তি যেন কেশর শুষে নিয়েছে মনে হল।

সেইদিন কেশর তার নিজের ভিতর একটা অন্ধ অচেতন রহস্যময় জীবনের স্রোতাবেগ অনুভব করেছিল। নিজের কুমারী জীবনকে ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত মনে হয়েছিল। সেইদিন সে দেবশ্রীর মাঝে পুরুষ স্পর্শের স্বাদ পেয়েছিল। দেবশ্রীর মাঝে তার জীবনের পুরুষের সাক্ষাৎ মিলে ছিল। তার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছিল। তারপর থেকে তারা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। সোৎসুক হয়ে উঠেছে। দুজনের চোখেই কামনার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে।

কেশর আজকাল নিজের শরীরের ভিতর আর একটা নতুন শরীরের অস্তিত্ব অনুভব করে। দেহের অভ্যন্তরে ভ্রূণের মত কুসুম-পেলব গোলাপী একটা শরীর ধীরে ধীরে রূপ পাচ্ছে। কামনাময় স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ পাবার জন্য যেন উদ্দাম হয়ে উঠছে। সেই উদ্দামতার একটা সুস্পষ্ট বেদনা তার অনুভূতিকে মোচড় দিতে থাকে।

আর তার নিজের কোন লজ্জা নেই। লজ্জার বদলে আজকাল সে উত্তেজনায় রাঙা হয়ে ওঠে। নাকের ডগা, কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। নিশ্বাসে আগুনের হলকা বেরোয়। বাইরের লজ্জাও তাকে কাটাতে হবে। আর তার লজ্জা করলে চলবে না। জন্ম-কুমারী হয়ে জীবনকে সে বিড়ম্বিত করতে পারবে না। তার ভেতরের সংযত মেয়েটা কুমারী ব্রত উদযাপন করবার জন্য অস্থির ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। জীবন তার বহ্নিদীপ্ত হয়ে উঠছে। সে পুরুষের নারী হতে চায়। সন্তানের জননী হতে চায়। দেবশ্রীর সন্তানকে গর্ভে ধরে সে মাতৃত্বে উত্তীর্ণ হতে চায়।

কেশরের নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হয়। তার শরীর মন বিশ্রাম চায়। সে ঘুমোতে চায়। দেবুর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে দেবুর মাঝে সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। সে ঘুম যদি কখনও না ভাঙ্গে তাতেও কোন ক্ষতি নাই। সেই মৃত্যুই হবে তার বিশ্রাম। সে তো মধুর মৃত্যু।

কেশর আর জোর করে জেগে থাকতে পারছে না।

সে ঘুমে ঢুলে পড়ছে। চোখ তার বুজে আসছে। সে ঘুমোতে চায়।

সে আহত হয়েছে। দেবশ্রীর কারাদণ্ড তার মনকে আহত করেছে দেহে একটা বিষণ্ণ শৈথিল্য এনেছে।

ছ-মাস। এই বিরহ ভার বয়ে দীর্ঘ ছ-মাস তার কাটবে কেমন করে? ছ-মাস যে শতাব্দীর পাষাণভার নিয়ে তার বুকে চেপে

বসেছে। তার বুকের হাড় যে গুঁড়িয়ে যাবে। সে বাঁচবে কেমন করে?

জেলের জীবন! দীর্ঘ ছটি মাস।

ভাবতে ভিতরটা তার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চোখ দুটি অশ্রুতে সাঁতার দেয়।

নানী আড়াল থেকে তাকে দেখে। হন্যে হয়ে গালাগালি দিতে দিতে ছুটে আসেঃ ভালো পিরীত করলি তুই কেশরি। চোখের জল সার হলো।

গালাগাল দিতে দিতে আসে। এসে কিন্তু গলা জড়িয়ে ধরে আঁচলে তার চোখের জল মুছে দেয়।

—মরে যাবি। গুমরে গুমরে কেঁদে কেঁদে মরে যাবি। তোর কি সব উলটো? আমাদের কালে আমরাও পিরীত করেছি। পিরীতের রোশণিতে আমরা তাগড়া জোয়ান হয়েছি, প্রাণভরে হেসেছি। পেটভরে খেয়েছি। আর তুই কিনা কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেলি। হাসতে ভুলে গেলি। খাওয়া ত্যাগ করলি। তোর হোল কি?

কেশর তারপানে চেয়ে মুচকি হাসে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ও ফেলে। ঠোঁট উলটে নানীর পানে চেয়ে বলে, ছাই!

—কি?

—প্রেম করেছিলে না ছাই? প্রেম করে যে চোখের জল না ফেলল, সে প্রেমের কোন স্বাদই পেল না। প্রেমের মর্ম বুঝল না। অতো সোজা নয় গো নানী। প্রেম তোমার গোলাপী রেউরি নয় যে চুষে চুষে রসে গাল ভরে নেবে। পিরীত করে রাধা একশো বছর চোখের জলে মাটি ভিজিয়েছিল।

তখনকার দিনে ও অঞ্চলে নানীর দলের যারা তারা সকলেই নিজেদের রাধা ভাবত। এখনকার দিনে মেয়েরা যেমন নিজেদের সিনেমা তারকা ভাবে। গুপ্ত প্রেমলীলাকে তারা ব্রজলীলা বা

কৃষ্ণলীলা ভাবত। নিজেদের রাধা ভাবত। উপরি পাওনার মত ক্ষণিকের প্রেমবৈচিত্র্যের লোভকে বা সম্ভোগলালসাকে তারা রাধাবেশ পরিয়ে দিতে কুণ্ঠা করত না। রাধার অভিসার তাদের গোপন লীলার প্রেরণা দিত। রাধা-কলঙ্কে কলঙ্কী হবার শক্তি ও সাহস জোগাত। নানীও যৌবনে নিজেকে রাধিকা ভাবত। তার ধারণা রাধা অনাদিকালের মেয়েদের গোপন মনের সহজাত ব্যতিক্রম। রাধা নিয়মের ব্যতিক্রম হলেও তাদের গোপন মনে প্রেম যমুনায় উজান বয়, তাদের মনে বাঁশী বাজে, নিভৃত নিকুঞ্জ তাদের ডাক দেয়, তাদের ভিতরের চির অভিসারিকা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মেয়ে মাত্রই চির রাধা। তাদের উদ্দাম যৌবনই রাধা মনের আকুলতা ব্যাকুলতা। আবেগ উচ্ছ্বাস। আক্ষেপ অনুরাগ।

নানী তাই অধীর হয়ে কেশরের মাঝে রাধাকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু নানীর রাধাকে কেশরের মাঝে খুঁজে পাবে কেন? নানীর রাধা সুখ সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল। মিলন ছাড়া অন্য কোন ভাব নেই তার মাঝে। সে সাধারণ নায়িকা। কেশরের রাধা অনেক উঁচুস্তরের। ভাবের রাজ্য তার বিচরণ ক্ষেত্র। সে সাধিকা। সে সংযত। তার অনুরাগ ভক্তি মাখানো। তার ভিতরের রাধা অতি বিনয়ী। তার মাঝে সর্ব সমর্পণের বশ্যতা। সে তার কৃষ্ণের দাসী হতে চায়। জীবন মরণের জন্মজন্মান্তরের প্রাণনাথ বলে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। এ প্রেমময়ী রাধার মূর্তি কল্পনা করবে কেমন করে নানী?

নানী বলে, পুরুষের কাছে নিজের অধিকার জোর করে দাবি করতে না শিখলে তোমারো ঐ রাধিকার মত কেঁদে কেঁদে জনম যাবে।

হেসে উঠল কেশর: অধিকার দাবি করবো? কার কাছে? কিসের অধিকার? জানো নানী চাইতে আমায় হয়নি। চাইবার

আগেই আমার কিষণজী বলে,—কেশর অপরূপ ভঙ্গিতে গভীর ভাবাবেগে সুর করে গেয়ে উঠল ঃ

"রাই, তুমি সে আমার গতি
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশিদিন বসি গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমারি কারণে,
বসে থাকি তার তীরে ॥···

কেশরের চোখে অশ্রুর প্লাবন। তার সমগ্র সত্তা যেন বাঁশী হয়ে ওঠে। তার সর্বাঙ্গে একটা অপরূপ দীপ্তি উথলে ওঠে।

বিস্ময়ে নানী নির্বাক হয়ে যায়।

কেশর হঠাৎ তার বুকের উপর আছড়ে পড়ে বলে ওঠে, কিন্তু বিরহের এ অকূল পাথার পার হবো কেমন করে নানী ?

॥ তেইশ ॥

কেশরের নিজেকে বাসন্তিকা মনে হয়। দেহটাকে মনে হয় বসন্তের মালঞ্চ। ফুলের একটা রঙিন জগৎ। ফুলে ফুলে ভরে আছে। ভোরের বাসন্তিকা। ভোর হবার আগেই ঘুম ভেঙ্গেছে। চেয়ে আছে ধূসর দিগন্তের দিকে আলোর আশায়। নবারুনের সোনার রোদে সে গা মেলে দিতে চায়। সোনার আলোয় ডুব দিয়ে সে সোনা হতে চায়। সূর্যের কবোষ্ণ আলোয় গা এলো করে ফুলের মত সে পাপড়ি মেলতে চায়। বাতাস থেকে সৌরভ শুষে নিতে চায় দেহের অনু-পরমাণুতে।

কেশর মনে মনে হাসে। একটা গভীর তৃপ্তিতে তার মনের দুকূল ছাপিয়ে ওঠে। তার মনে হয় যে জগতে সে এতদিন বাস করেছে, এ সে জগৎ নয়। এ এক অভিনব বিচিত্র জগৎ। যে জগতে জন্মের পর থেকে সে জীবন যাপন করেছে সে জগতের সঙ্গে এ জগতের ঘনিষ্ঠ কোন যোগ নেই। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক অদৃশ্য মহাশক্তি তাকে এক নতুন জগতে নিয়ে এসেছে। এক প্রচণ্ড প্রবল শক্তির তাড়নায় সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় নয়। কিন্তু কি আছে এ জগতে কে জানে। এর অনন্ত সৌন্দর্য তার চেতনাকে মুগ্ধ করেছে। তাকে সম্মোহিত করেছে। সে চোখ ফেরাতে পারে না।

তার চোখে এ এক অনাবিষ্কৃত রহস্যময় দেশ। কামনার মহাদেশ। নরনারীর জীবনের পরম রহস্যের গোপন মায়াপুরী।

আর কোন বিরোধ নেই কেশরের মনে। নেই কোন দ্বিধা সংশয়। আত্মপ্রত্যয়ের আলো জ্বলেছে তার মনে। দৃঢ় সংকল্প নিয়েই সে তার মিলন তীর্থের পথে এগিয়ে চলেছে। এর দীর্ঘ

পথকে সে সঙ্কেপ করতে চায় তার যাত্রাপথকে আনন্দ উজ্জ্বল ও গীতিমুখর করে তুলতে চায়।

এতটা ভাবেনি কেশর। তার বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা আর পিতৃকুলের পুণ্য ফলে সম্ভব হতে চলেছে।

দেবিকা তাকে নিয়মিত চিঠি লেখে। দেবশ্রীর কারাজীবনের প্রতিটি সংবাদ পরিবেশন করে। দেবিকার কাছে কেশরের গোপনতা নেই। তার মনের কথা দেবিকা জানে। দেবিকা তার পূজনীয় বউদি। সে তার ননদিনী। তার মনের গুপ্ত কথা সর্বাগ্রে সেই তো জানবে। তার অধিকারই যে সর্বাগ্রগণ্য। তাই তার মনে সংশয় জাগতেই সে তার গলায় আঙুল দিয়ে তার মনের কথা পাম্প করে বের করে নিল। কেশরও দরদী শ্রোতার কাছে নিজেকে উদ্ঘাটন করে দিতে পেরে মনে স্বস্তি পেল। নিজেকে প্রকাশ করে দিতে পেরে সে শুধু ভারমুক্ত হল না, নিজের ভার কিছুটা দেবিকার কাঁধে তুলে দিল।

দেবিকা আগে থেকেই কিছুটা আন্দাজ করেছিল মনে মনে। কিন্তু এতটা নয়। কেশরের ভালবাসার চেহারা দেখে সে শুধু চমকে যায়নি। রীতিমত ঘাবড়ে গেল। নিদারুণ একটা সমস্যার মত তাকে প্রচণ্ড আলোড়িত করে তুলল। যে-প্রশ্ন কেশরের চোখে তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছিল তার পানে চেয়ে দেবির মুখের আলো নিভে গিয়েছিল। সে চোখে অন্ধকার দেখেছিল। সেই প্রাণময় প্রশ্নের মৃত্যুময় ও আত্মঘাতী উত্তর কল্পনা করে সে অন্তরে শিউরে উঠেছিল। কী যে বলবে, কী যে বলা উচিত সে বুঝে উঠল না। কিন্তু সে তার মনোভঙ্গের কারণ হতে পারল না। সে তাকে খোলাখুলি প্রশ্রয় দিতে না পারলেও তার প্রেমের সততা ও নিষ্ঠাকে প্রশংসা করতে হল।

জীবনটা তো স্বপ্ন নয়। বাস্তব তো এ প্রেমকে সমর্থন করবে না। সমাজ সংসার এ প্রেমকে প্রশ্রয় দেবে না। কেশরের পেশা,

তার মাতৃকুল ও বয়স তাদের মিলনের অন্তরায়। দেবশ্রীর জীবনের সাথী হবার পক্ষে অনুকুল নয়।...এই ছিল দেবিকার মনোভাব।

অনিমেষকে সে বলেছিল, জীবনের ফরমূলায় আসে না। এ প্রেমের জাত আলাদা। সাধারণের চেয়ে কড়া ধাতের।

অনিমেষ গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিল, নির্জলা মদের মত। আর ডোজ-ও একটু বেশী হয়ে গেছে। এই মদ আর প্রেম দুটোই ভাল জিনিস। কিন্তু বেশী হলেই সর্বনাশের সম্ভাবনা।

চোখে ঝিলিক দিয়ে হাসতে হাসতে দেবী বলেছিল, তুমি ডাক্তার। ডোজের কথা তুমি জানো। তোমার বোন তো ডাক্তার নয়। সে বাঈজী। সে শিল্পী। সে আবেগের তোড়ে ভেসে গেল। মেঘলা আকাশে বিলম্বিত সূর্যোদয়ের মত তার মনের আকাশে প্রেমের আবির্ভাব হলো বিলম্বে। কিন্তু সে আবির্ভাব বিলম্বিত সূর্যোদয়ের মতই রূঢ় প্রখর ও তীব্রোজ্জ্বল। তার মহিমায় সে বিস্মিত হল। তার জ্বলজ্যোতি তার চোখ ঝলসে দিল। তার আতপ্ত আলোয় তার দেহ গলে গেল। তার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু কামনাময় জীবনের পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই প্রবল প্রচণ্ড শক্তির হাত থেকে সে অব্যাহতি পাবে কেমন করে?

অনিমেষ হাসতে হাসতে বললে, তার ওপর তোমার দাদার আনুগত্য ও আন্তরিকতা তার প্রেমের পৃথিবীতে আনন্দোজ্জ্বল স্থিতিলাভ করল। স্মরণীয় হয়ে রইল।

দেবিকা ঝলসে উঠল, তা ছাড়া আমার দাদা করবে কী? তোমার মত মেয়েটার হাত ধরে জলে নামিয়ে নিজে সাঁতরে ডাঙ্গায় উঠে আসবে, গায়ের কাদামাটি ধুয়ে?

হেসে উঠেছিল অনিমেষ: আমার মতো?

দেবিকাও হাসতে হাসতে তার গায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিল, হ্যাঁ গো। বিলেতের তোমার ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে মেরিডিথের কথা

ভুলে যাচ্ছো কেন? আমি তো দেখতে যাইনি। তুমিই গল্প করেছিলে।

অনিমেষ তাকে জড়িয়ে ধরে হো-হো করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, সে-কথা আমার মনে ঝাপসা হয়ে এলেও তোমার মনে রইল ঠিক। আশ্চর্য এ দেশের মেয়েদের মন। যেমন টাচি, তেমনি সেন্টিমেনটাল। বিশেষ করে স্বামী সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত সোনোরস্ এবং সফিস্টিকেট। এতোটুকু-কে এতো বড়ো করে মনে রাখতে তোমাদের তুলনা নেই।

—মনে রাখবার মতো কথা হলেই মনে থাকে। তুমি কি কম দুষ্টু নাকি? অকপট একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব পিরীত করে, রোগশয্যায় তার সেবাযত্ন আদায় করে, তাকে লোভ দেখিয়ে সগ্‌গে তুলে দিয়ে দিব্যি পাশ কাটিয়ে পালিয়ে এলে। খুব মানুষ তুমি?

অনিমেষ মুগ্ধ প্রশংসাভরা চোখে স্ত্রীর সুন্দর মুখের পানে চেয়ে হাসল।

দেবিকা বললে, সত্যি মেয়েটাকে মাঝে মাঝে আমি ভাবি,—

—কী ভাবো?

—ভাবি, সত্যিই কি তোমাকে সে ভালোবেসেছিল? তার মনের পরিচয় জানবার একটা কৌতূহল জাগে। কে জানে সে-দেশের মেয়েদের প্রেমের চেহারা কেমন?

অনিমেষ হাসতে হাসতে কৌতুক করে বললে, তোমাদের প্রেম একটানা। তাদের প্রেমে জোয়ার ভাটা খেলে। তোমাদের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সব অনুসন্ধানের যেমন পরিসমাপ্তি ঘটে তাদের বেলায় তা নয়। বিয়েই তাদের পথের শেষ নয়। বিয়ের পরও তারা জীবনের নতুন পাতা ওলটাতে পারে। নতুন অধ্যায় আরম্ভ করতে পারে।

—তা হয়তো পারে। জীবনকে ভেঙ্গে গড়তে পারে। কিন্তু প্রেম অবিনাশী। ক্ষয়হীন। বিশেষ করে মৌলিক বা প্রথম প্রেম। আদিম

স্রোতের ওপর জোয়ার ভাটা খেলে। প্রভাব থেকেই উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। পুরোনো ভিতের ওপর নতুন সৌধগড়া। ঐ যে মেয়েটি যে স্বেচ্ছায় আত্মীয় পরিজনহীন দূরদেশে তোমার সেবার ভার নিয়ে তোমার রোগশয্যায় বসে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করল দিনের পর দিন, সে যদি তার কুমারী-হৃদয়ের প্রথম প্রেম তোমাকে নিবেদন করে থাকে কিংবা তোমার রোগপাংশু যন্ত্রণাকাতর মুখ এবং তোমার উচ্ছ্বসিত তপ্তস্পর্শ তার মমতাকে গলিয়ে প্রেমে রূপান্তরিত করে থাকে, সে কি কোন দিন ভুলতে পারবে তার সেই প্রথম প্রেমের সুমধুর স্মৃতিকে, না মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে এই সুন্দর মুখখানিকে ?

দেবিকা নিজের মুখখানি তার গালের উপর রেখে চোখ বুজল। তার উষ্ণ চোখের জল অনিমেষের গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

অনিমেষ চমকে উঠল : আরে তুমি কাঁদছো কার জন্যে ? মেরিডিথের জন্যে নাকি ?

দেবিকা আঁচলে চোখ মুছে রাঙা চোখে বললে, বিশ্বের মেরিডিথের জন্যে। ফর উইমেন ইন্ লভ।

অনিমেষ সোৎসুক দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকিয়ে রইল।

দেবিকা তার একখানা হাত ধরে প্রশ্ন করলে, মেরিডিথকে তুমি একটুও ভালোবাসতে না ? সত্যি বলবে।

অনিমেষ হেসে ফেলল : তোমাকে হঠাৎ মেরিডিথে পেলে কেন বলতে পারো ?

দেবিকা রাঙা মুখে হেসে উঠল : না গো মেরিডিথে পায়নি। পেয়েছে তোমার বোন, কেশর। তার ভালোবাসাকে আমি বুঝতে চাইছি। মেরিডিথ সেই ঢেউয়ের বুকের ফেনা। আর মেরিডিথ তো ফেলনা নয়। তার কাছে আমি জীবন-ঋণী। সে তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছিল।

—তা বাঁচিয়ে ছিল।

দেবিকা [illegible] মত অধৈর্য হয়ে বললে, বলো না, তাকে ভালোবাসতে না ?

—বুঝতে পারতুম না। সেখানে গিয়ে পর্যন্ত আমি মেয়েদের সম্বন্ধে রীতিমত উদাসীন ছিলুম। তাদের সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য ছিল না। তার কারণও ছিল। প্রথমতঃ আমার মা-র পায়ে হাত দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম ও-দেশে বিয়ে করবো না। তা ছাড়া দেশের প্রতি আমার আনুগত্য ও কতর্ব্যবোধ আমার চেতনার ও-দিকের দরজা জানলাগুলোকে বন্ধ করে রেখেছিল। মনে ঠিক তখনো প্রেমের রঙ ধরেনি। এক বাড়িতে বাস করলেও বা সদাসর্বদা দেখা সাক্ষাৎ হলেও মেরিডিথ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। সে-ও গায়ে-পড়া মেয়ে নয়। মুখের পরিচয় মনে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। আমাদের অন্তরঙ্গতা গভীর হল আমার অসুখের পর। তার আন্তরিক সেবা-যত্ন, পরমাত্মীয়ের মত আমার স্বাস্থ্যের প্রতি তার সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি ও উৎকণ্ঠা আমার মনে রেখাপাত করলো। তাকে আমার ভালো লাগতো। সবিশেষ সুন্দরী না হলেও সে সুশ্রী ও প্রিয়দর্শনা। মধুর ভাষিনী। সে যতক্ষণ বাড়িতে থাকতো আমার কাছে কাছে থাকতো এবং আমার কাজই করতো। আমার সেখানকার দিনগুলিকে মধুর করে তোলবার আগ্রহাতিশয্য আমার মনে দোলা দিত কিন্তু সেটাকেও ঠিক প্রেম বলতে পারবো না। তবে তার হাবভাবে, কথাবার্তায় যে-ভাব ফুটে উঠতো সে-টা প্রেমের কাছাকাছি। এ-দেশ হলে প্রেমই বলা যেতো। কিন্তু ও-দেশে ফ্লার্ট করা মেয়েদের একটা সহজাত বৃত্তি। বিয়ে বা প্রেম করার আগে রিহার্সেল দেওয়ার মত সেখানকার ছেলেমেয়েরা একটা মধুরতরো হৃদ্যতার সুযোগ সুবিধা পায়। প্রণয়ী না হলেও প্রণয়ীর নিচেই তাদের আসন। নকল প্রণয়ী বলা চলে। তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমাদের দেশে সে ধরণের প্রেমের ঠাঁই নেই। কাজেই আমি মেরিডিথের

গভীর অন্তরের গোপন কথা বুঝতে পারতুম না। আমার প্রকাশ ক্ষমতা চিরদিন দুর্বল। নিজে থেকে কোন কথা বলতে পারতুম না। ইচ্ছে থাকলেও বলবার সাহস ছিল না। যখন সে নিজেকে প্রকাশ করল, ইট ওয়াজ টু লেট। আমার তখন ফেরবার প্যাসেজ বুক করা হয়ে গেছে। দেশের মাটিতে পা দিয়েই চাকরিতে জয়েন করতে হবে।

দেবিকা প্রশ্ন করলে, না হলে কি করতে? অনিমেষ বললে, করবো আর কি? আমার যে হাত-পা বাঁধা। কর্তব্যের কাছে প্লেজ বাউণ্ড। তাই—

—তাই কি?

তাকে কাছে টেনে নিয়ে কুটিল কটাক্ষ হেনে অনিমেষ হাসতে হাসতে বললে, তাই এই ইরেজারের সন্ধান করলুম মনের কোণের ক্ষীণ দাগটুকু মুছে ফেলবার জন্যে।

—মনে তা হলে দাগ পড়েছিল? প্রশ্ন করল দেবিকা।

—তা একটু পড়েছিল বই কি! তোমাকে বুকে নিয়ে তো মিছে কথা বলতে পারবো না। সব চেয়ে দাগা দিয়েছিল শেষের দিনের তার একটি কথা। বাঙালী মেয়ের মত হাপুস কান্না কাঁদতে কাঁদতে সে আমার সঙ্গে ইণ্ডিয়ায় আসতে চেয়েছিল। বলেছিল, "ইফ ইউ এভার কল মি, আই উইল কাম ফ্রম দি আদার এণ্ডস অব দি আর্থ"—

দেবিকা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে নিমীলিত নয়নে একটা কম্পিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অনিমেষ তাকে বুকে চেপে ধরে সোহাগ করে বললে, বুকভরা মধু বাঙলার বধূ···

দেবিকা মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে মুখ তুলে হাসতে হাসতে বললে, সর্বদেশের সর্বকালের এবং সর্বজাতের বধূর বুক মধু ভরা। বাঙলার কবি বাঙালী মেয়ের গৌরব করেছেন।

অনিমেষ বললে, সে-কবি দু-দুটি বিদেশী মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন।

দেবিকা বললে, তিনিই অন্যত্র বলেছেন, রূপেগুণে শিক্ষায় দীক্ষায় বাঙ্গালী মেয়েরা য়ুরোপীয় মেয়েদের শতাংশের একাংশও নয়।

অনিমেষ হেসে উঠল: অর্থাৎ তাঁর মতের সঙ্গে পথের মিল ছিল না।

—পুরুষ মাত্রেরই মত ও পথ আলাদা। তাইতো তাদের হাতে পড়ে মেয়েদের এতো দুঃখ ভোগ করতে হয়।

—তাই বুঝি?

বাঁকা চোখে অনিমেষ তার পানে চাইল।

ঘাড় দুলিয়ে মুচকি হেসে দেবিকা বললে, তাই-তো। পুরুষের মনের সঙ্গে কথার কোন মিল নেই। কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই। যে-দিকে যাবো বলবে, যাবে ঠিক তার উলটো দিকে।

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে দেবিকা বললে, এ দেশের ছেলেরা ফ্লার্ট করতে কম ওস্তাদ নয়। এ-দেশের কত ছেলে ও-দেশের কত মেরিডিথকে যে ভূত বানিয়ে দিয়ে এসেছে তার ইয়ত্তা আছে নাকি?

অনিমেষ হাসিমুখে তার গাল টিপে দিল।

শ্বেতপদ্ম রোদের ঝাঁজে রাঙা হয়ে উঠল। দেবিকা হাসতে হাসতে বললে, আমার দাদা হলে কি হবে? ওস্তাদ ছেলে। কেশরের মত চৌকোস মেয়েকে একেবারে ঘায়েল করে দিয়েছে। তার আর পদার্থ নেই। তবু দাদার চেয়ে বয়সে বড়ো।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা শব্দ করে উঠল অনিমেষ, ফুঃ!

দেবিকা প্রশ্ন করল, মেরিডিথ ও তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো ছিল নাকি?

গম্ভীর হয়ে অনিমেষ উত্তর দিল, জানবার অকেশন হয়নি।

দেবিকা তার গায়ে চিমটি কেটে কুটিল চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে বললে, তুমিই জানো। আমি জানতে চাই না। আমার অত দুঃসাহস নেই।

সশব্দে হেসে উঠল অনিমেষ। দেবিকাকে আকর্ষণ করে মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করল, কেন গো দেবিকারাণী, সাহস নেই কেন? কাকে ভয়?

—এই দুর্মুখকে। কী বলতে কি বলে বসবে। আমি মরি আর কি ছটফটিয়ে।

হাসল অনিমেষ: আমি তো জানি আমার দেবি, আউট অ্যাণ্ড আউট স্পোর্টস।

তির্যক ভঙ্গিতে মাথা কাত করে দেবিকা উত্তর দিল, একটি জায়গা ছাড়া।

অনিমেষ কোন কিছু বলবার আগেই দেবিকা প্রশ্ন করলে, আচ্ছা স্বামীস্ত্রীর বয়স সম্বন্ধে তোমাদের মেডিক্যাল শাস্ত্র কি বলে? স্ত্রীর বয়স বেশী হওয়াটা কি ঘোরতর কোন আপত্তির কারণ?

মৃদু হাসল অনিমেষ। বুঝতে বাকি রইল না দেবিকার চিন্তার ধারাটা কোন খাতে বইছে। সে হাসতে হাসতে জবাব দিল, আপত্তির কারণ হবে কেন? বর কণে দুজনেই অ্যাডল্ট হলে স্বাস্থ্যের দিক থেকে বয়সের কোন প্রশ্ন ওঠে না। পরিণত গর্ভের সন্তান পুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান হয়। আমাদের দেশে নাবালক ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় বলেই তাদের আভিভাবকরা বরকণের বয়স সম্বন্ধে এত সতর্ক। ওর একটা সামাজিক দিকও আছে। অল্পবয়সের মেয়েরা সহজে বশ হয়। স্ত্রী স্বামীর অধীন। পতি তার পরম গুরু। কাজেই পতির বয়স বেশী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রৌঢ়ের এবং বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা একছাড় চোখে পড়ে। এ দেশে এবং বিদেশে। বিদেশে প্রৌঢ়ার তরুণ স্বামীও দেখতে পাওয়া যায়। সেটা দৃষ্টিসুন্দর না হলেও দৃষ্টিকটু নয়। শুধু এ দেশের পুরুষ

মাত্রেই চায় অলপ বয়সী বালা। উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী। অর্থাৎ একটি মেয়ের যৌবনের আদি থেকে অন্তপর্যন্ত নিঃশেষে উপভোগ করতে চায় তার স্বামী দেবতা। তা ছাড়া মেয়েদের যৌবনকালটা বড় ক্ষণস্থায়ী। কাজেই স্ত্রীর বয়স স্বামীর বয়সের চেয়ে বেশী হলে, দাম্পত্য সম্ভোগ স্বল্পায়ু হয়। স্বামীর যৌবনবেগ স্তিমিত হবার আগেই স্ত্রীর যৌবন সূর্য অস্ত যায়। কাজেই বাস্তবের দিক থেকে স্ত্রীর বয়স কম হওয়াই সুবিধার। দুজনে এক বয়সের হলে বোধ হয় সব চেয়ে ভালো হয়। কারুর কোন আক্ষেপের কারণ থাকে না। স্ত্রীর বয়স বেশী হলে কিন্তু স্বামীর প্রতি অনুরাগ তার গাঢ় হয়। তাদের সম্ভোগের চেহারাটা অনেক শান্ত ও সমাহিত। তাদের মাঝে আবেগ ঝঞ্ঝার মাতামাতি থাকে না।

দেবিকা এতক্ষণ শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটির মত স্থির হয়ে বসে শুনছিল আর মিটিমিটি হাসছিল। অনিমেষ শেষ করলে দেবিকা সরাসরি প্রশ্ন করল, তাহলে তোমার মত আছে ?

—কিসের ?

—দাদার সঙ্গে কেশরের বিয়ে হতে পারে ?

অনিমেষ হেসে উঠল ঃ হতে কেন পারবে না ? কিন্তু আমার মতের দাম কি ? আমিই বা এর মাঝে মাথা গলাতে যাবো কেন ?

—কেন, দোষ কি ?

—প্রথমতঃ প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে যাওয়া শুধু অশোভন নয় মারাত্মক অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ দুপক্ষই আমার পরমাত্মীয়। কারুরি মনোভঙ্গের কারণ হতে পারবো না। কারুরি সেন্টিমেণ্টে আঘাত করতে পারবো না। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই।

মৃদু হাসল দেবিকা ঃ তা বললে তো চলবে না। ওদের ভালোবাসা ব্যর্থ হলে ওদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সব চেয়ে বড় কথা কেশর আমাদের ঘরের মেয়ে। তোমাদের বংশের রক্ত ওর

দেহে। ও আমাদের মাঝে ফিরে আসতে চায়। ওকে শুচি সুন্দর শুভ্র ও সম্ভ্রান্ত জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে তোমরাই পারো। আমার মনে হয় তোমাদের বংশের রক্তকে সম্মান দেওয়া শুধু কর্তব্য নয়, তোমাদের ধর্ম।

হেসে ফেলল অনিমেষ বোধ হয় দেবিকার উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে।

দেবিকা কৌতুক ভরা গলায় জোর দিয়ে বললে, না গো ঠাকুর, কাঠের জগন্নাথের মত হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। কিছু একটা করতেই হবে।

অনিমেষ হাসতে হাসতেই বললে, তোমার মনের কথা আমি বুঝি। তোমার অভিপ্রায় মহৎ। কিন্তু সে-কথা আর কেউ বুঝবে কি? তোমার বাবা কেশরের মত বউ নিয়ে সংসার করতে রাজি হবেন?

ঠোঁট মুচড়ে হাসলে দেবিকা। সেই তো ভাবনার কথা।

অনিমেষ দেবিকার রেশমের মত চুলগুলি নাড়তে নাড়তে বললে, ওদের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। মাটি থেকে রস শুষে নিয়ে যে গাছ বেড়ে উঠছে তারা মাটির রসেই বেঁচে থাকবে। তাদের গোড়ায় জল ঢালবার দরকার হবে না। এক গাছের ডাল হাত বাড়িয়ে আরেক গাছের ডালকে জড়িয়ে ধরেছে। তাদের মেলাবার জন্যে বাঁশ দড়ির বাঁধন দরকার হবে না। তারা ডালে ডালে পাতায় পাতায় মিলে মিশে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে। নাই পেল তারা লোকালয়ের সন্ধান। নাই পেল তারা অপ্রকৃত সভ্যতার আলো। দেশের বনজ ঐশ্বর্যের মত থাকনা তারা বন আলো করে। তাতেও তো পৃথিবীর কল্যাণ। দেশের মঙ্গল।

—অর্থাৎ, বাঁধনের বাইরে ওরা জীবন-যাপন করুক।

—ক্ষতি কি? ওদের বিস্তারকে সঙ্কিপ্ত নাই করলে? কাটা ডালপালার রস শুকিয়ে সেই কাঠে নাই বানালে পালিশ-করা

বিলাস-শয্যা ? সবুজ বর্ণসমারোহের মধ্যে তারা রহস্য-নিবিড় হয়ে বেড়ে উঠুক। আকাশের পানে মাথা উঁচু করে মেঘলোক থেকে শুষে আনুক সূর্যতপ্ত দেশের জন্যে স্নিগ্ধ আর্দ্রতা। দুজনের মিলনের ঘনতায় ছায়াশীতল হোক আতপ্ত মাটি।

—কী যে তুমি বলো!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবিকা স্বামীর মুখ পানে চাইল।

॥ চব্বিশ ॥

একখানি ছোট চিঠি। চিঠি নয় যেন বিষ মাখানো তীর। কেশরের বুকে এসে বিঁধছে তীরের ফলাটা। তাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। চোখে অন্ধকার দেখছে সে। দিনের আলো নিভে গেছে কিংবা সে অন্ধ হয়ে গেছে। তার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে আসছে। ফলার বিষ রক্তের সঙ্গে মিশছে।

অপরিচিত হস্তাক্ষর।

অপরিচিত স্বাক্ষর।

পরিচিত শুধু স্বাক্ষরিত নামটি। দেবশ্রীর পিতা। অশ্বিনী মুখোপাধ্যায়। শিরোনামায় দেবশ্রীর বাড়ির ঠিকানা।

বার বার চিঠিখানা পড়ে তার মর্ম উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে কেশর। সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। কোন কিছু চেতনা দিয়ে ধরতে পারছে না।

সংক্ষিপ্ত ক-টি লাইনের চিঠি। লিখছেন :

কল্যাণীয়াষু,

মা, আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আমার নাম তোমার পরিচিত। বিপন্ন ব্রাহ্মণ দেবশ্রীর পিতা। নিরুপায় হয়ে তোমার শরণাপন্ন হতে হলো। আমাদের এই আসন্ন পারিবারিক বিপর্যয় থেকে একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পারো। তুমি বুদ্ধিমতী। একটা সম্ভ্রান্ত বংশের মান মর্যাদার তুলনায় তোমাদের এই প্রণয়কে নিশ্চয়ই অসঙ্গত ও অযৌক্তিক মনে হবে। তোমার বিচার এবং শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে আমাদের পুণ্য বংশমর্যাদা। আমাদের অক্ষত সামাজিক কৌলিন্য।

তোমাদের মিলন দরিদ্রের শান্তিপূর্ণ সংসারে মারাত্মক সঙ্কট

সৃষ্টি করবে। দেবুর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কুৎসিত অন্ধকারে ডুবে যাবে। দেবুকে বাঁচাবার জন্যে হয়তো তোমাকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু উপায় নেই মা। কোন উপায় থাকলে তোমাকে আমি বিব্রত করতুম না। আমাকে ভুল বুঝোনা। আমি তোমার গুণমুগ্ধ। তোমাদের চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।...

সঙ্গে এসেছে দেবিকার একখানা চিঠি। প্রীতি ও স্নেহোচ্ছ্বাসে ভরা সে চিঠি। সে সংবাদ দিয়েছে দেবশ্রীকে বহরমপুর জেলে বদলি করেছে কাজেই সম্প্রতি দেখা হয়নি দেবশ্রীর সঙ্গে। আরো লিখেছে এ সময় তুমি আসতে পারলে একসঙ্গে একবার বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ বেড়িয়ে আসা যেতো। তোমার মুর্শিদাবাদ দেখাও হতো দাদাকে দেখে আসাও হতো।...কিন্তু কেশর পারল না তার স্নেহ প্রশ্রয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে। অশ্বিনীর চিঠিখানা অন্ধকারের মৃত একটা ভারের মত তার বুক চেপে ধরেছে। প্রেতায়িত, ভয়াবহ ভার।

অশ্বিনীর চিঠিখানা পড়ে কেশরের মনে হল এক নিষ্ঠুর তান্ত্রিক তার হাত ধরে তাকে তার শ্মশান যজ্ঞে আহুতি দিতে ডাকছে। বিশ্বের কল্যাণে, প্রিয়জনের হিতার্থে, নিজের আত্মার ইষ্টে তাকে বলি হতে আহ্বান করছে।

সে ঘুণাক্ষরেও প্রথমটা ভাবতে পারেনি যে দেবুর পিতা তাকে চিঠি লিখেছেন। উর্ধ্বশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে তার অবিশ্বাস্য মনে মনে হলো। এর কোন অর্থ খুঁজে পেল না। এ কখন সত্য হতে পারে? কালো ধোঁয়ার মত তাল তাল সন্দেহ, তার নিশ্বাস বন্ধ করে দিল। সাপের তীব্র ছোবলের মত রাশি রাশি জিজ্ঞাসা তাকে দংশন করতে লাগল। তবু সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার তীক্ষ্ণ চোখে সমস্ত অন্তর ঢেলে দিয়ে প্রত্যেকটি লাইন এবং প্রত্যেকটি অক্ষরকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করে সে নিঃসংশয় হল। নির্ভুল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। অকস্মাৎ

একটা প্রবল ঢেউয়ের মত চিঠিখানা তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। প্রস্তুত হতে সময় দেয়নি। পালাবার অবসর দেয়নি। মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েও তার অর্থ বুঝতে কোন কষ্ট হল না। সহজ, সরল এবং অতি স্পষ্ট এর প্রত্যেকটি লাইন। কোন জটিলতা নেই। দ্বর্থবাচক শব্দ নেই। অনাবৃত তীক্ষ্ণতায় ফলার মত ঝকঝক করছে।

দেবশ্রীর পিতা তাকে চিঠি লিখেছেন। তাদের অবিচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গতার কথা তাঁর শ্রুতিগোচর হয়েছে। আসন্ন বিপদের অশুভ সঙ্কেতে তিনি আতঙ্কিত হয়েই তার শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ হবে, কৌলিন্য আহত হবে, দেবশ্রীর অকলঙ্ক চরিত্র কলঙ্কিত হবে। তার ভবিষ্যৎ আশাহীন অন্ধকারে ডুবে যাবে। তাই তিনি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। ত্যাগের পথ। তপস্যার দূর দুর্গম পথ। কঠিন সাধনার পথ।

অর্থাৎ দেবুকে তাকে ভুলতে হবে। দেবুর স্বপ্ন চোখ থেকে মুছে ফেলতে হবে। দীর্ঘ দুটি বছরের দিনে দিনে তিলে তিলে গড়া হৃদয়সৌধ নির্মম হয়ে ধূলিস্যাৎ করতে হবে। জীবনের যে নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছিল সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত হতে হবে। জীবনে থাকবে না কোন মধুর প্রতীক্ষা। থাকবে না কারুর সান্নিধ্যের স্বপ্ন। থাকবে না কোন সুদূর প্রত্যাশা।

এত শূন্যতা, এত রিক্ততা নিয়ে কি বাঁচা যায় নাকি ?

হঠাৎ তার চেতনা ফিরে এল। তার বুকের নিচেটা অসহ্য ব্যথায় টনটন করে উঠল। হৃৎপিণ্ডটা মোচড় দিতে লাগল। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা কাঁপুনি জাগল। প্রবল জ্বরের কাঁপুনির মত।

সে বসে থাকতে পারল না। নিজেকে তার অত্যন্ত অসুস্থ মনে হল। কাঁপতে কাঁপতে সে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। বালিশে মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

কেঁদে কেঁদে যখন তার চোখের জল নিঃশেষ হয়ে গেল তখন তার মনে হল সংসারের হীন ষড়যন্ত্র দেবুকে তার বুক থেকে কেড়ে নিতে পারে কিন্তু দেবুর প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগকে কেড়ে নেবে কেমন করে? কেউ তা পারবে না। দেবুর প্রতি তার ভালোবাসা তার মনের আকাশে প্রভাত রোদের মত ঝলঝল করে উঠল। সর্বাঙ্গে সে সংস্পর্শের তাপ অনুভব করল। দেবুর মধুময় স্মৃতি তার কুমারী চেতনায় সঞ্চারিত করল একটা দৃপ্ত মর্যাদাবোধ। তার প্রচ্ছন্ন মনের গভীর প্রণয়কে দিল একটা অসামান্য পবিত্রতা। একটা অত্যুজ্জ্বল শুভ্রতা। কামনায় সে প্রেমের জন্ম নয়। দেহ-সম্ভোগের ফেনিল আবর্তে আবিল নয়।

সে এক পরমাশ্চর্য আনন্দময় চেতনা। সে এক আলৌকিক অপ্রকট অনুভূতি। তাকে কি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় নাকি?

ভোলা তাকে যায় না।

এ ভালবাসা ঈশ্বরের দান।

একে অস্বীকার করতে হলে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হয়। ঈশ্বর-চিন্তা ভুলতে হয়। স্মরণের অন্তরালে বসে, অনধিগম্য দূরত্বের পার থেকে দেবশ্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বিষাদ-মলিন ছলছল চোখে তার পানে চেয়ে থাকে। মুখ ফুটে না বললেও তার অনুভাবে মনে হয় সে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্ত থাকো। আমি তোমার-ই। কেউ পারবে না তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে। কেউ পারবে না আমাদের দুজনের মাঝে দেওয়াল তুলে দিতে।

কেশর বিছানা ছেড়ে উঠল না। ওঠবার ইচ্ছা হল না। ওঠবার শক্তি পেল না। সে যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। শরীর জুড়ে নেমে এল বিষাদ ধূসর গোধূলি। মনে হল প্রাণের আলো নিবে আসছে। জীবন সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

সূর্য চিরস্থায়ী নয়। জীবনও চিরস্থায়ী নয়। যাক না সূর্য

ডুবে। পৃথিবী জুড়ে নেমে আসুক প্রেতলোকের অন্ধকার! আলোর পৃথিবীর সঙ্গে সে আর কোন সম্বন্ধ রাখতে চায় না।

সারাদিন সে চুপটি করে বিছানায় শুয়ে রইল। চান করল না। খেল না। নানীকে বললে অসুখ করেছে।

সত্যিই সে অসুস্থ। ভিতরে সে অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছে। তার অস্থিমজ্জা যেন গলে যাচ্ছে। একটা তীব্র যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার তুষারশুভ্র মুখে যন্ত্রণার ছায়া। ঝাঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো। অবিন্যস্ত। গায়ে একখানা শ্বেতশুভ্র চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। যেন কে সমাধির উপর মুঠো মুঠো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। ভাবলেশহীন মুখ। চোখের দৃষ্টিতে প্রেতালোকের দূরত্ব। যেন মানুষের চোখ নয়। কালো কাচের চোখ। চোখ চেয়ে আছে। অথচ কিছুই যেন ওর চোখে পড়ছে না। কিছুই যেন ও দেখছে না। ঘরের জানলাগুলো সব বন্ধ। তার চোখ যেন দিনের আলো সহ্য করতে পারছে না। একটা আধ-ভেজানো দরজা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে তার গায়ের সাদা চাদরের উপর আলপনা এঁকেছে। তার মনের স্তব্ধতার মতই ঘরখানায় স্তব্ধতা ঘন হয়ে উঠেছে।

নানী মাঝে মাঝে কাছে এসে বসে। কেশর শূন্য দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চায়। কী যেন দেখে। কী যেন তার মুখে লেখা আছে তাই সে পড়ে। আর ভাবে।

—গা তো বরফের মতো ঠাণ্ডা।

তার বুকে হাত রেখে নানী বলে।

হাত দিয়ে নানীর হাতখানা বুকের উপর চেপে ধরে কেশর।

—বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও নানী। বড়ো যন্ত্রণা!

নানীর স্নেহশীতল স্পর্শে সে চোখ বোঁজে। নানী তার বুকে হাত রেখে ভিজে গলায় প্রশ্ন করে, কোনখানটায় ব্যথা ভাই?

—বুঝতে পারছি না।

চোখ না খুলেই উত্তর দিল কেশর। নানী বলে, কেউ তোকে বান মেরেছে! তোকে যাদু করেছে।

কেশর তার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে, বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশের মাটি।

নানী বললে, তামাসা নয়। বাঙলা তোকে ভর করেছে। বাঙলা তোকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

কেশর নানীর একখানা হাত চেপে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, আর বোধ হয় নিলো না নানী।

নানীকে জড়িয়ে ধরে সারারাত ছটফট করল কেশর। ঘুমোতে পারল না। ঘুম এল না।

তার সমস্ত সত্তা জুড়ে নিষুপ্ত রাত্রির নির্জীব অন্ধকারে একটা চিন্তার আলোড়ন চলল। সে দেবশ্রীর। দূরের দেবশ্রী যোজন পথ অতিক্রম করে তার কাছে এসে বসল। মধুর হাসি হেসে তাকে সান্ত্বনা দিল। তাকে আশ্বাস দিল। তার বিরহ-ব্যথা মুছিয়ে দিল। দেবশ্রীর ধ্যানে সে ডুবে গেল। ধ্যানের মাঝে সে তার নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করল। বেশী করে তাকে কাছে পেল।

কার সাধ্য তাকে তার কাছ ছাড়া করে?

এই দুটি বছর তার জীবনের স্মরণাগারে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত সে নিজের মাঝে তার বলিষ্ঠ উপস্থিতি অনুভব করেছে। তার মধুর স্মৃতি তার জীবনযাত্রার পথকে কুসুমাস্তৃত করেছে। তার মনের পায়ে নূপুর বেঁধে দিয়েছে। তার যৌবনের পল্লবগুলিকে উতরোল করে তুলেছে। তার আত্মার অনাঘ্রাত শাখায় ফুল ফুটিয়েছে। তার দীর্ঘ জীবনের এই দুটি বছরই তার জীবনের গোনা দিন। দেবশ্রীর সঙ্গে পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর সৌন্দর্যের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হল। মনে তার প্রেমের আলো জ্বলল। তার পূর্বে জীবনে স্মরণীয় কিছু নেই। সঙ্গীত সাধনা ছাড়া মনে করে রাখবার মত মধুর কিছু নেই।

দেবশ্রীকে ধ্যান করতে করতে কেশরের মনে হল দেবশ্রীর মত পৃথিবীতে আর কারুর সঙ্গে তার এত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা নেই। দেবশ্রী তার। দেবশ্রী তার আত্মার আত্মীয়। তার জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়। তাকে সে ভুলবে কেমন করে?

তাকে কি ভোলা যায় নাকি?

নানী ডাক্তারকে খবর দিয়েছিল। ডাক্তার এসে দেখে গেল।

নার্ভাস ব্রেকডাউন।

—হঠাৎ এ মনোভঙ্গের কারণ কি? নিশ্চয়ই এর পেছনে আছে কোন নিদারুণ শক। ব্যাপার কি?

ডাক্তার প্রশ্ন করল।

কেশর মৃদু হেসে নিজেকে আড়াল করবার চেষ্টা করল।

ডাক্তার বললে, না না আপনার এই স্পেলেনডিড হেলথ। রাতারাতি এমন ভেঙ্গে পড়বার নিশ্চয়ই গুরুতর কোন কারণ ঘটেছে। নইলে তো এমন হবার কথা নয়। এমন হয় না।

নানী বলে, বলনা কী হয়েছে?

—কী আবার হবে? হয়নি কিছুই।

—তবে?

—তবে আবার কি?

ঝলসে উঠল কেশর।

—সব খুলে না বললে ডাক্তার সায়েব দাওয়াই দেবে কেমন করে?

কেশর মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে বললে, ডাক্তার সায়েব শরীরের দাওয়াই দেন। মনের দাওয়াই দেন না।

হেসে উঠল ডাক্তার: কিন্তু মন ভেঙ্গে পড়লে শরীর দাওয়াইয়ে ভাল হবে না। মন ভাল করতে হবে। মন শক্ত করতে হবে। আর খাওয়া দাওয়া করুন ভাল করে।

প্রবীণ ডাক্তারের বুঝতে বাকি রইল না গোপনে কোন মানসিক ভূমিকম্প তার মনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে।

মনের আকাশে ঘুলিয়ে উঠেছে বিষণ্ণতার করুণ মেঘ। অসহায় বেদনার অপরিসীম ক্লান্তি। ক্ষয়পক্ষের চাঁদের মত কেশর দিন দিন পাণ্ডুর ও শীর্ণতর হতে থাকে। এই ক্লান্তিকর চিন্তাভার তাকে বিবর্ণ ও বিপর্যস্ত করে তোলে। তার মনে হয় জগৎ সংসার তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। তাকে অপমানিত করেছে। তার ভালবাসাকে অপমানিত করেছে। তার মনের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলিকে বিকল ও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে দলিত ফণিণীর মত ফণা তুলে আক্রোশে গর্জন করে। তার প্রেমকে খাটো করে দিল। তাকে হেয় করে দিল।

অশ্বিনীর চিঠিখানা তার মাথার বালিশের নিচেই আছে। পড়ে পড়ে চিঠিখানার প্রতিটি ছত্র তার মুখস্থ হয়ে গেছে। কথাগুলো সর্বক্ষণ তার মগজে পাক খেতে থাকে। তার সর্বাঙ্গে বিছের কামড় দেয়। বিষাক্ত মারণাস্ত্রের মত তার দেহের অনুপরমাণু বিষিয়ে দেয়।

কেশর অশ্বিনীকে দেখেনি। তবে তার মনের পরিচয় পেয়েছে দেবু ও দেবিকার কাছে। শুদ্ধাচারী হিন্দু ব্রাহ্মণ। সনাতন স্থিরপন্থী মন। অতি-নৈষ্ঠিক বলা চলে। সঙ্গীত অনুরাগী পিতা সংসারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়েছিল বলে সঙ্গীত সাধনার উপর তার জাতক্রোধ। পিতার সংসারে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দেবশ্রীকে গোপনে গীতবাদ্যের সাধনা করতে হয়েছে। তার জন্ম অশ্বিনী মনে মনে খুশি ছিল না। বরং মনে একটা আশঙ্কা ছিল। এই গীতবাদ্যের নেশা কালে তার মতিভ্রম ঘটাতে পারে। কেশরের মনে হয় তাদের এই প্রণয়কাহিনী সুনিশ্চিত অশ্বিনীর মনে দৃঢ়মূল প্রত্যয় সৃষ্টি করবে যে এ-টা গীত সাধনার বা শিল্পী-মনের অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। দেবিকা পারবে না তার

কঠোর মনে রেখাপাত করতে। সন্তান বলে দেবুকে ক্ষমা করবে না।

কাজেই বিদ্রোহ করে কোন শুভ ফল হবে না। পিতা-পুত্রে বিরোধ ঘটিয়ে একটা শান্তির সংসারকে আলোড়িত করে তুলতে পারবে না।

না। সে বড় বিশ্রী। তবে মাঝে কোন সৌন্দর্য নেই। সুষমা নেই। নিজের সুখের জন্ম একটা সংসারের সুখ-শান্তি হরণ করতে সে পারবে না। পিতার অভিশাপ, পিতার মনস্তাপ সন্তানের ভবিষ্যত জীবনযাত্রার পথকে ভয়াল ও দুর্গম করে তুলবে।

সে জেনে শুনে দেবশ্রীর মাথায় গুরুজনের অভিশাপ তুলে দিতে পারবে না।

বিভা এসেছে। বাইরে তার গলা শোনা গেল।

...বিভার বুকের নিচে কান্নার অতল সমুদ্র। তবু সে হেসে-খেলে বেড়ায়। উপায় কি? ভালবাসা তো সবার অদৃষ্টে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয় না।...

—হঠাৎ এমন শরীর ভেঙ্গে পড়ল কেন রে?

বিভা তার বিছানার পাশে এসে বসল।

কেশর কুটিল গলার উত্তর দিল, বাঈজী বলে, শরীর তো লোহাপেটা নয়।

হেসে উঠল বিভা: বালাই, লোহাপেটা কেন হতে যাবে গো, এমন ননীর শরীর!

গায়ে হাত রেখে বিভা মৃদু হেসে বললে, কিন্তু এরি মধ্যে গলতে সুরু হলো যে—কিসের তাপে?

এ কি হলো কেশরের? তার চোখ দুটি হঠাৎ ছলছলিয়ে এল। সে বিভার একখানি হাত চেপে ধরে তার মুখের পানে চেয়ে হঠাৎ অশ্রুচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ল। তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। সে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বিভা তার দিকে ঝুঁকে তার কাঁধের উপর হাত রাখল। কান্নার আবেগে তার কাঁধটা ফুলে ফুলে উঠছে। সে কাঁধটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরে কাঠ হয়ে গেল।

কেশরকে সে কাঁদতে কখন দেখেনি। এ যেন কেশরের মত নয়। কুমারী হলেও কেশর সাংসারিক রূঢ়। নিজের সম্বন্ধে সব সময়ই সে সচেতন। বিভা তাই অবাক হয়ে গেল। কেশরের মনের কুল খুঁজে পেল না। কী এমন হলো যে হঠাৎ তাকে এমন আকুল করে তুলল ?

বিভা তার গায়ের উপর একখানি হাত রেখে চুপটি করে বসে রইল। তার কান্নায় বাধা দিল না। কেঁদে তাকে হালকা হতে দিল।

কান্না শেষ করে একসময় কেশর বললে, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে বিভাদি !

—তাতো বুঝেছি। কিন্তু কী এমন ব্যাপার যা কেশরকে এমন ধরাশায়ী করে দিল ?

কেশর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে বিভা-দি ! মেয়ে হয়ে জন্মানোর অভিশাপ।

কেশর মুখ ফুটে কোন কিছু না জানালেও বিভার কাছে অজানা ছিল না দেবশ্রীর প্রতি তার আসক্তির কথা। তবুও কেশরের কাছে আজ নতুন করে শুনল পূর্বরাগের কাহিনী থেকে বিরহ পর্যন্ত। মেয়েদের এ একটা দুরন্ত শখ। বরকনে দেখার মত অনেকটা দুর্নিবার। পরের প্রেমের উপাখ্যান তাদের কাছে পরম উপভোগ্য। অমৃত সমান। তার মাঝে ইতর-বিশেষ নেই। বয়সের তার-তম্য নেই। নাতনি দিদিমা একসঙ্গে শোনে।

কেশর বক্তব্য শেষ করে বালিশের নিচে থেকে অশ্বিনীর চিঠিখানা বের করতে করতে সুর করে গাইল, "পিয়াস লাগিয়া

জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।" এইবার বজ্রের চেহারাটা দেখো। যে বাজ আমার মাথায় পড়বে।

বিভা চিঠিখানা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ল।

দেবুর বাবা ?

প্রশ্ন করল বিভা।

কেশর বললে, হ্যাঁ। আমি চিঠিখানার জবাব দিতে চাই। দেওয়া উচিত নয় বিভাদি ?

বিভা আবার একবার চিঠিখানার উপর দৃষ্টি ঢেলে দিল। কেশরের প্রশ্নের জবাব দিল না।

কেশর তার উত্তরের প্রতীক্ষায় তার মুখপানে চেয়ে রইল।

একটু পরে বিভা প্রশ্ন করল, কী উত্তর দেবে ?

—তাইতো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। তোমাকে মহাভারত শোনালুম, তুমি একটা সৎপরামর্শ দেবে বলে।

—এ ব্যাপারে কী সৎপরামর্শ দোবো বলতো ? দু-কূল রাখা তো চলবে না।

—তা তো চলবেই না।

বিভা চোখ তুলে তার পানে চাইল : শ্যাম ছাড়তে পারবে ?

—না পেরে উপায় কি ?

কেশরের গলার স্বর ভেঙ্গে এল। সে ভগ্নভঙ্গিতে মাথা হেঁট করল।

বিভা তার চিবুকে হাত দিয়ে মাথাটি তুলে ধরল। কেশরের চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল।

বিভা আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, এর মাঝে বাঁচবার মন্ত্র নেই-রে কেশর। ছাড়া এতো সহজ নয়। পারিস সব ছেড়ে তপস্বিনী হ। ত্যাগের মহিমা বাড়াবার জন্যে বা সাময়িক গৌরব কেনবার লোভে এ কাজ করিসনি। সারাজীবন বলে কথা। দু-দুটো প্রাণীর জীবন। সংসারের কথা, সমাজের কথা,

বংশের মান মর্যাদার কথা ভাববে দেবু। তুই কেন ভাবতে যাবি। দেবু গবেট নয়। আর নাবালকও নয়। সব দিক না ভেবে সে কিছু এদিকে পা বাড়ায় নি। তুই কেন নিজে থেকে আগুনে আঙুল দিতে যাবি ?

—তা হলে আমি এখন কি করবো ?

—হাসবি, খেলবি, গান গাইবি আর দেবুকে ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বি। কারুর কথায় কান দিবি না।

—চিঠির কোন জবাব দোব না ?

—দেবু ফিরে না আসা পর্যন্ত, দেবুর মনের কথা না জেনে কোন কিছু করবে না কেশর।

শেষের দিকে নিষেধের ভঙ্গিতে বিভা গলায় জোর দিয়ে কথাগুলো বলল।

কেশর মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল তারপর আরক্তমুখ তুলে গাঢ়স্বরে বললে, তা হয়না বিভাদি। চিঠিখানা তো পড়লে। ওর কোনখানে আদেশ নেই। এক বিচিত্র আবেদনে ভরা চিঠিখানি। আমার বিচার ও সুবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তিনি তাঁর বংশমর্যাদা রক্ষা করতে চান। দেবুর চরিত্রের পবিত্রতা ও শুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখতে চান। বিপন্ন গুরুজন আমার শরণাপন্ন। তাঁর আকুল কান্না আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তিনি শরণাগতের মতো, অসহায়ের মতো আর্তস্বরে প্রার্থনা করেছেন, আমার সন্তান কেড়ে নিও না মা। আমার আশা ভরসা, আমার জীবন সম্বল থেকে বঞ্চিত করো না। না। না আমি তা পারবো না বিভাদি। নিজের সুখের জন্য একটা শান্তির সংসারে অশান্তির ঝড় তুলতে পারবো না। সে বড়ো জঘন্য। ভারি কুৎসিত। শুধু নিজে নয়, দেবুকেও আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে শুধু হাতে। নিজেকে আমি দেবুকে দান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলুম। তা যখন হবার নয় তখন নিজেকে সরিয়ে নেওয়া ভিন্ন

গতি কি? তাদের পারিবারিক মর্যাদাকে আমি বিচলিত করতে পারবো না। আমার জন্যে পিতা-পুত্রে বিরোধ হলে আমি আত্মঘাতী হবো। সে লজ্জা, সে কলঙ্ক আমি সইতে পারবো না। দেবুর সংসার আমায় নিতে পারল না বলে দেবুকে আমি সংসার ছাড়তে বলবো না। আমার জন্যে দেবু বাপ-মা ছাড়বে না কি? তাহলে আমার প্রেমের মূল্য থাকবে না। আমি মাথা উঁচু করে দেবুর পানে কোনদিন চাইতে পারব না।

—কিন্তু তারপর নিজের গতি কি হবে? কেশরের অধরে শীর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে বললে, অর্থাৎ নিজেকে ভুলিয়ে রাখব কি দিয়ে?

বিভা তার কথাগুলোকে উড়িয়ে দিতে পারে না। তার কথায় একটা মুক্তির ইঙ্গিত আছে। সে-টা সে মনে-প্রাণে অনুভব করল। সে ভারাতুর গলায় উত্তর দিল, হ্যাঁ—

কেশর বললে, তুমি যেমন করে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছো—

বিভা স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন গলায় উত্তর দিল, আমি আর পারলুম কই নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে। আমি তাপসকে বিয়ে করছি।

—সত্যি বিভা-দি?

কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ রেখার মত কেশরের মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

॥ পঁচিশ ॥

আরো মাস দুই কেটে গেছে।

সময় তার মনের গুমোট ভাবটা কাটাতে পারেনি। সময়, প্রবহমান আত্মার স্রোত বই তো নয়। সে স্রোত পারে না আত্মার চেহারা বদলে দিতে।

আগেকার মনের প্রসন্ন প্রশান্তি আর নেই। নেই সেই উদার উদ্ধতি। তার স্বভাবের সবুজ কোমলতায় এসেছে পীড়িত হরিদ্রাভ কঠিনতা। বৈরাগ্যের বিবর্ণতা।

অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেছে কেশর এই দুটি মাসে। সে যেন অবসান বেলা। বেলা শেষের রাগিণী। শীতের শীর্ণ নদী। জল সরে গেছে। মাথা উঁচু করে উঠেছে রুক্ষ বালুচর। শরীরের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেছে রহস্যের রূপরেখা। স্বপ্নের আলপনা। জীবনের কোন বিজ্ঞাপন নেই শরীরের মলাটে। বেঁচে থাকার অতিরিক্ত আর কোন উপলব্ধি নেই চেতনার গভীরে।

নিজের জন্য তো কোন কিছু রাখেনি সে। নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে সে দেবুর পিতার চরণে সমর্পণ করেছে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেবুর সঙ্গে কোন কায়িক ও বাচনিক সম্পর্ক রাখবে না। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণ করেছে। দেবুকে ঘিরে নিজের যে পরিচয় সে গড়ে তুলতে চেয়েছিল, যে জীবনের জন্য কেশরের প্রতিটি রক্তবিন্দু পিপাসায় আকুল হয়ে উঠেছিল, সে স্বপ্ন, সে পিপাসা তাকে মুছে ফেলতে হবে নিষ্ঠুর কাঠিন্যে। জীবনে থাকবে না কোন ছায়া। আকণ্ঠ পিপাসায় জর্জরিত হয়ে বৈশাখের রুদ্র রৌদ্রদাহে পুড়ে মরতে হবে। বিচ্ছেদে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। বুক কাঁপলে চলবে না। ব্যথায় কাঁদা চলবে না। নিঃশব্দে,

অশ্রুহীন চোখে, কঠিন হয়ে সহ্য করতে হবে এই মর্মঘাতী বিয়োগ ব্যথা। দেবুর জন্য অন্তরস্থ সমস্ত আসক্তিকে অন্ধকারে গোপন করে নিজেকে চালু রাখতে হবে। সহজ কথা নাকি ?

সহজ হোক, দুরূহ হোক, এ তাকে করতেই হবে। দেবুর কল্যাণের জন্য দেবুকে ভুলতে হবে।

না না। দেবুকে ভোলা অসম্ভব। জ্ঞান না হারালে দেবুকে ভোলা যাবে না। নিজেকে ভুলতে না পারলে দেবুকে ভোলা অসম্ভব। দেবুর সান্নিধ্য ও উপস্থিতিকে সে অস্বীকার করতে পারে কিন্তু সে তার স্মৃতিকে মন থেকে উপড়ে ফেলবে কেমন করে ?

দেবুর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। দেবুকে ধ্যান করতে করতেই তাকে শেষ নিশ্বাস ফেলতে হবে।

নাই পেল সে তাকে দেহে, সে তাকে প্রাণে পেয়েছে। প্রাণের মাঝে সে অমর হয়ে থাকুক। নাই পেল সে তাকে ভোগে, সে তাকে পেয়েছে প্রেমে। কাদা না ঘেঁটে যদি সে তাকে পূজোয় পেয়ে থাকে তাকে সে নামাবে কেন পূজোর বেদি থেকে ? পূজোর মাঝে ও আনন্দ আছে। সৌন্দর্য আছে। তৃপ্তি আছে। দেবুকে সে তার হৃদয়ের সেই নিভৃত মন্দিরে পাষাণ দেবতা করে রেখে দেবে। তার সঙ্গেই সে প্রেমের লীলা করবে। হাসবে, খেলবে, গান গাইবে। সাধবে, কাঁদবে। তাকে নিয়েই সে প্রেমের ক্ষুধা-পিপাসা মেটাবে।

সেই হবে তার পরীক্ষা।

সেই পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। কাঁটা বিঁধে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। আগুনের তাতে হয়তো গা ঝলসে যাবে। তবু তাকে চলতে হবে সেই কাঁটার উপর দিয়ে। বার বার প্রদক্ষিণ করতে হবে সেই অনির্বাণ অনল কুণ্ড।

সহজে পাওয়া গেলেও সহজে ধরে রাখা যায় না। কেশরের মনে হয় কঠিন করে বাঁধতে গিয়েই দেবুকে সে হারাল।

রতন বেড়াতে এসেছে গোয়ালিয়র থেকে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে।

কেশর অবাক হয়ে গেল। রতন বিলেত যাচ্ছে ছেলের সঙ্গে।

—সে কী রে? ছেলে যাচ্ছে পড়তে? তুই যাচ্ছিস কেন? তুই কি করবি বিলেত গিয়ে?

রতন উত্তর দিল: কিছু পয়সা বরবাদ করতে। অনেক পাপের পয়সা হাতে এসেছে।

—তাতো জানি। কিন্তু তার জন্যে বিলেতে কেন? এ-দেশেও তো বরবাদ করবার অনেক পথ আছে।

—তা আছে। একটা নতুন শখ মেটানো হবে। সমুদ্দুরের পৃথিবীটা দেখা হবে।

কেশর ঠোঁট মুচড়ে হাসল: আসল ব্যাপারটা কি বলতো? মনের মানুষটি, কি যে বেশ নামটি,—দিনেশ না কি, যাচ্ছে বুঝি সঙ্গে?

রতন সশব্দে হেসে উঠল। হাসির শব্দটা কিন্তু শোনাল ঠিক কান্নার সুরের মত। হাসির তোড়ে তার দুচোখ ভরে জল এল। কেশর অবাক হয়ে তার পানে চাইল। রতনকে তার সুন্দর মনে হলো। ঘুমের স্পর্শের মত মধুর ও কোমল মনে হলো।

রতন হঠাৎ কেশরকে জড়িয়ে ধরে চাপা ভারাতুর গলায় বললে, না রে, সে সঙ্গে যায় নি। তাকে ভোলবার জন্যেই দেশ ছেড়ে পালাচ্ছি।

—সত্যি?

একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতন জবাব দিল, সত্যি কেশর সত্যি। আমার জীবনের এই একটি মাত্র সত্যি যার আমি গৌরব করতে পারি। জীবনে সত্যিকার প্রেমের দেখা পেয়েছিলুম কেশর। জীবনে নতুন করে সূর্যোদয় হলো। মোহের কুয়াশা-কুহেলি ছিন্ন ভিন্ন করে দেহ মন ও আত্মার ওপর ছড়িয়ে পড়ল এক বিস্ময়কর শুভ্র আলো। মনে হলো নবজন্ম লাভ করলুম। অমৃত-

পান করে অমরত্ব লাভ করলুম। হোমের আগুনে পুড়ে খাঁটি ও শুদ্ধ হলুম।

রতন সগৌরবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করল দিনেশের সঙ্গে তার পরিচয়পর্ব থেকে পার্বণীর জন্য তার মহিমান্বিত আত্মত্যাগের জ্বলন্ত কাহিনী।

বাণীহীন স্তব্ধতায় কেশর কোলের উপর হাত দুটি-জড়ো করে প্রেমের জন্য ত্যাগের মহিমা গান শুনল। আত্মপ্রসাদের গৌরবে রতনের মুখখানি উদ্ভাসিত।

রতন বললে, প্রেম যদি সত্য হয় কেশর, তার জাত মারবে কে? তাকে ছোট করবে কে?

কেশর কি বুঝলে সেই জানে। সে নিঃশব্দে ঘাড়টি দুলিয়ে মাথা কাত করে রতনের পানে তাকিয়ে রইল।

রতনকে তার নতুন মনে হলো।

রতনের দুই চোখে প্রেমের আলো জ্বলছে। আলোর দুটি উজ্জ্বল বিন্দু তীক্ষ্ণ দুটি শলার মত কেশরের মুখের উপর বিঁধে আছে।

রতন অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, পরের সম্পত্তি বুক ফুলিয়ে পরকে ফিরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখনো নিজেকে জয় করতে পারিনি। এখনো ঢেউ কাটিয়ে উঠতে পারিনি রে কেশর। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে বুক ভেঙ্গে যায়। তাই ছেলেকে আড়াল দিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে। তা ছাড়া কোন উপায় নেই। ঠেস না পেলে মেয়ে বাঁচে না। ছেলের ঠেসই এখন জীবনের সম্বল। ছেলেকে ছেড়ে থাকতে আতঙ্ক জাগে। ছেলের হাত ধরেই তীরে উঠতে পারবো। সে ভরসা রাখি।

একটি শব্দও উচ্চারিত হলো না কেশরের কণ্ঠ থেকে। সে পাথরের মূর্তির মত পলকহীন নয়নে রতনের পানে চেয়ে রইল। রতনের ঘোলাটে জীবনের যে-টুকু সৌন্দর্য শুভ্র ও আনন্দে উজ্জ্বল

সেই অংশটুকু দেদীপ্যমান তার মুখের রেখায় রেখায়। অনেক সঙ্কীর্ণ কুৎসিত পথ অতিক্রম করে শেষে সে তীর্থপথের সন্ধান পেয়েছে। দৃঢ় সঙ্কল্পে ও আত্মপ্রত্যয়ে সে জ্বলে উঠেছে। শরতের শুভ্রতায় সে ঝলমল করছে।

কেশরের চোখে সে বিস্ময়।

কেশরের চোখে সে অভিনব।

রতন বললে, প্রেম সত্য বলেই আমার দ্বারা সম্ভব হলো।

অভিভূতের মত অবশ গলায় কেশর বললে, প্রেমের শহীদ হয়ে উঠলি।

রতন হাসল : শহীদ না হলেও একটি মেয়ের জীবনে মূল্যবান হয়ে রইলুম।

কেশর পথ বেছে নিয়েছে। রতনের পথ। পলায়নের পথ। বাঁচতে হলে তাকে পালাতে হবে। দেবশ্রীকে ছেড়ে বাঁচতে হলে যেতে হবে তাকে নাগালের বাইরে। এর আর কোন বিকল্প নেই। দেবুর পক্ষেও সহজ হবে তাকে ভোলা। তার মনোভাব দেবুর কাছে ব্যক্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব। কী বলবে সে? দেবুকে দেখলেই সে বদলে যাবে। দেবুর ইচ্ছাকে অস্বীকার করা কেশরের পক্ষে অসম্ভব। তার চেয়ে নিঃশব্দে পলায়ন করাই শ্রেয়স্কর। দেবুকে সে চিরকালের মৌনতার অন্ধকারে ফেলে এখান থেকে পালাবে।

তা ছাড়া কোন পথ নেই।

দূরের পথ। পরিচিত পৃথিবীর বাইরে সমুদ্রের কোলে জাহাজের বুকে দুলতে দুলতে অপরিচিত বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর সীমাহীন অবারিত আকাশের সীমা খোঁজা। চমৎকার হবে। সমুদ্র আর আকাশের অসীমতায় ডুবে যাবে তলিয়ে

যাবে তার বিরহ ব্যথা। নতুন পৃথিবীর নতুন জঠরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে তার ব্যথাভরা অতীত, তার অপমানিত প্রেম। সে চলে যাবে আত্মার অনমুভূত বিস্মৃতির গভীর অন্ধকারে।

পুরোনো পৃথিবী তার প্রেমকে কোন সম্মান দিল না। ফিরে চাইল না তার জীবন-জোড়া ব্যর্থতার দিকে।

কিসের মায়া? কিসের দ্বিধা?

না। আর প্রতীক্ষা নয়। দেশের মাটি থেকে নিজেকে উৎপাটন করে নিয়ে গিয়ে বিদেশের মাটিতে শিকড় গেড়ে দেবে। নিজেকে বিকীর্ণ করে দেবে নতুন দেশের নতুন পরিবেশে।

সে-দেশের হিমেল হাওয়ায় ধারালো প্রবৃত্তিগুলো নির্জীব ও নিঃসাড় হয়ে যাবে। দেবশ্রী তার মনের তলায় থিতিয়ে যাবে। তার ভালবাসার কোমল অনুভূতিগুলো জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যাবে।

যদি কখন অবার এ-দেশে ফিরে আসে সে নতুন মানুষ হয়ে ফিরে আসবে। তার মাঝের কেশর মেয়েটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

রতন আর প্রভু। তার পুরানো জীবনের স্বাক্ষর বহন করে নিয়ে যাবে। রতন তার সহচরী। প্রভু তাদের সন্তান। তাদের যাত্রা হবে শান্ত, সমাহিত। অবাধ আনন্দময়। কেশরের প্রস্তাবে রতন প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেনি, মনে ভেবেছিল হয়তো প্রভুর সঙ্গে কৌতুক করছে। তখন তো তার অন্তরের ক্ষতটা অনাবৃত করে তাকে সে দেখায় নি। তার অন্তর-বেদনার প্রচ্ছন্ন কাহিনীটা যখন রতনের শ্রুতিগোচর হলো তখন তার মর্মমূল কেঁপে উঠল। তাকে নিজের প্রতিলিপি মনে হলো। ঘনীভূত রাত্রির স্তব্ধতায় কেশর অকপট সারল্যে তার কাছে বিবৃত করল তার প্রেমের মর্মন্তুদ শোচনীয় পরিণতি। কেশর স্পষ্ট স্বীকার করল দেবশ্রীর উপর তার দুরন্ত লোভ। এত কাছে থেকে সে লোভকে জয় করা অসম্ভব। পালাবার অন্তরাল ভিন্ন দেবশ্রীর উপস্থিতিকে প্রতিরোধ

করা দুঃসাধ্য। দেবশ্রীর বলিষ্ঠ উপস্থিতি তার সকল সঙ্কল্পকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। তার প্রতিশ্রুতি ধূলিস্যাৎ করে দেবে। কেশর দেবুকে তার কামনার ধ্যানমূর্তি করে রাখতে চায়। তাকে তার ভোগে পেতে চায় না।...

কেশর ছিল প্রেম সম্বন্ধে চিরদিন উদাস নির্লিপ্ত ও অনুপস্থিত। রতন তাই চমকে গেছে তার উদ্দাম প্রেমের উৎক্ষেপে। তার নির্ভুল উচ্চারণে। তার প্রেম যে এত স্পষ্ট আর এত প্রবল রতন কল্পনা করবে কেমন করে? তার পূর্ববর্তী অতীতে তো প্রেমের কোন স্বাক্ষর নেই। কোন ইতিহাস নেই।

অনেক সংশয়, অনেক জিজ্ঞাসার পর রতন নিঃসংশয় হলো। কেশরের এ স্বেচ্ছা মৃত্যু। তাকে বরণ করে নিতেই হবে।

তাকে যেতেই হবে।

কেশরকে তার যাত্রাপথে সঙ্গী পেয়ে রতন অসহ্য আনন্দে ফেটে পড়ল। প্রভু তার পাসপোর্ট ও প্যাসেজের ব্যবস্থা করে যাত্রাপথকে সুগম করে দেবার ভার নিল।

রতনকে দেখে কেশরের মনে হলো সে একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে। তার এই সন্তান তার হাত ধরে আবিল আবর্তের মধ্যে থেকে তীরে তুলে এনেছে। তার জীবনকে সার্থকতায় ভরিয়ে দিয়েছে। তার অস্বাস্থ্যকর জীবনকে মধুময় ও আনন্দ উজ্জ্বল করে তুলেছে। তার বাৎসল্য তার সকল ক্ষুধা মিটিয়েছে। তাকে শান্ত ও সমাহিত করেছে। আর প্রভু বালক হলেও রতন তাকে তার জীবনের উপর প্রভুত্ব করবার সর্বাধিকার দিয়েছে। প্রভু যেন সবুজ শষ্পাবরণের মত তার জীবনকে সুকোমল করে দিয়েছে। প্রভাত রৌদ্রের মত সন্তানের পরিচ্ছন্ন ও নির্মল উপস্থিতি মায়ের সর্বাঙ্গে।

একদা যে-রতনের সান্নিধ্যকে কেশরের ক্লান্তিকর ও দূষিত মনে হতো আজ তারি মাঝে সে অজস্র মুক্তির সন্ধান পেল। তার

জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি তাকে মুগ্ধ করল। তারি বিস্তৃত উড্ডীন পক্ষপুটের ছায়ায় সে অন্তরাল খুঁজল।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে রতন তাকে বুকে টেনে নিল। অশ্রুর আবেগে তার চোখের পাতা বুজে এল।

কেশর প্রতীক্ষায় কঠিন হয়ে উঠল। দূর তাকে ডাক দিচ্ছে। সুদূরের স্বপ্নে সে বিভোর। পায়ের নিচে পৃথিবী সরে যাচ্ছে। সময়ের স্রোতে সে ভেসে চলেছে। দূর থেকে দূরে। পৃথিবীর ও-পারে। দেবুর পৃথিবীর বাইরে। তার চেতনার পৃথিবীর বাইরে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অজানা অনাবিষ্কৃত দূরদেশ। কুয়াশার দেশ। আকাশে কুয়াশা। সমুদ্রের বুকে কুয়াশা। আতপ্ত রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ নয়। রৌদ্রের আভায় নীল সমুদ্র ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায় না। কুয়াশা ঘন নীল নিথর সমুদ্র। চোখে পড়বে না রহস্য-নিবিড় অরণ্যের বর্ণ-সমারোহ। গায়ে লাগবে না দখিনের ফুলেল হাওয়া। মন উতল হবে না প্রিয়জনের দর্শন আশায়। জীবনে থাকবে না কোন সকাম আবেদন। দেহে জাগবে না কারুর স্পর্শের রোমাঞ্চ।

কেশর নিষ্ঠুর হয়ে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে দেবুর সংস্পর্শ থেকে। দেবিকাকে চিঠি দেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। চিঠি দিলেও তার মাঝে কোন আবেগ উচ্ছ্বাস থাকে না। থাকে না প্রাণের কোন সাড়া শব্দ। সে যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলছে শক্ত বাঁধনটাকে। হাড় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তবু তার চেষ্টার অন্ত নেই।

প্রস্তুতি চলেছে অন্তরে বাহিরে। আবশ্যিক জিনিসপত্র কেনাকাটি পর্যন্ত হচ্ছে। প্রস্তুতির ছাপ পড়ছে কেশরের শরীরে। শরীর শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চোখের নিচে কালিমা পড়ছে। বর্ণ মলিন হচ্ছে। যা কিছু করছে যেন একটা ঝোঁকের মাথায় করে যাচ্ছে। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। এ-দিকে দেবশ্রীর মুক্তির দিন আসন্ন। দেবিকা তাকে কলকাতা যাবার জন্য

বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। দেবুর প্রত্যাগমনের সেই শুভ-দিনটিকে তারা আনন্দ উজ্জ্বল ও উৎসব মুখর করে তুলতে চায়। কেশর তার আমন্ত্রণকে অভিনন্দন জানাল দীর্ঘশ্বাস ভরা দু'ফোঁটা চোখের জলে। সে উৎসবে তার কোন অংশ নেই। দেবুর পূজনীয় পিতার কাছে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দেবুর সঙ্গে সে কোন সম্বন্ধ রাখবে না। দেবুর জীবন যাত্রার পথে তার কোন ছায়া থাকবে না। সে নিষ্ঠুর হাতে নির্মূল করে দিয়েছে নিজের ছায়া পল্লব। সে প্রতিশ্রুতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না।

দেবিকার আমন্ত্রণের সে কোন সাড়া দিল না। প্রয়োজন বিবেচনা করল না। সে নিজেকে সরিয়ে নিল। গুটিয়ে নিল। চোখের পাতা থেকে মুছে ফেলল কলকাতার স্বপ্নকে। মুছে ফেলতে হাত কাঁপে। চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে আসে। তবু সে অটল। অভ্রভেদী তার সঙ্কল্প।

কেউ পারলে না তাকে টলাতে। নানীর অনর্গল অশ্রু। বিভার অনপেক্ষ অনুনয়।

বিভা কিন্তু রীতিমত ভয় পেয়েছে। কেশরের ভাবগতিক তাকে মুষড়ে দিয়েছে। নিজের জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাসের পাতা উলটে তার মনে হয় কেশর আত্মঘাতী হবার পণ করেছে। সে আত্মনাশ করে নিজের প্রেমকে মহিমান্বিত করতে চায়। চোখের সামনে সে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে, আতঙ্কে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে, হাহাকারে শরীর তার ছিঁড়ে পড়ছে তবু সে তার প্রেমের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সতীত্বের মহিমা প্রচার করবার জন্য আগেকার দিনে মেয়েরা যেমন স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতানলে আত্মসমর্পণ করত। বিভার মনে হয় এ-ও এক ধরণের আত্মশ্লাঘা। আত্মগর্বী মনের নিরঙ্কুশ দম্ভ। হয়তো বা আত্মাভিমান।

বিভা কেশরকে প্রশ্ন করেছিল, কার ওপর অভিমান করে ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিস ?

কেশর উত্তর দিয়েছিল, নিজের ওপর ছাড়া অভিমান করবার আর তো কেউ রইল না বিভাদি।

উত্তর দিতে কেশরের গলার স্বর বুঁজে এসেছিল, চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছিল।

বিভা সখেদে বলেছিল, অভিমানের তুষার গলাবার রোদ নেই রে কেশর সে-দেশের আকাশে। হিমেল হাওয়ায় আরো শক্ত হয়ে জমাট বাঁধবে।

কেশর কুটিল চোখে হেসেছিল।

বিভা কিন্তু স্থির থাকতে পারেনি। একমাত্র সেই জানে দেবশ্রীর বাবার চিঠির কথা। সেই জানে তাঁর চিঠির উত্তরে কেশরের আত্মঘাতী প্রতিজ্ঞার কথা।

কেশরকে বিরত করা সাধ্যের অতীত ভেবে বিভা গোপনে দেবশ্রীকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখল। তার পিতার চিঠি থেকে সুরু করে প্রায় এ যাবৎ সর্ববৃত্তান্ত তাকে অবগত করাল। সর্বশেষে কেশরের স্বাস্থ্য ও মনোভঙ্গের কথা উল্লেখ করে তাকে অনতিবিলম্বে লক্ষ্ণৌ আসবার অনুরোধ জানাল।

॥ ছাব্বিশ ॥

জেলের দরজায় দাদার অপ্রসন্ন মুখের পানে চেয়ে দেবিকার বুঝতে বাকি রইল না যে দাদা যাকে সব চেয়ে বেশী দেখতে চায় তাকে দেখতে পাচ্ছে না। তার মুক্তিকে সম্বর্ধনা জানাতে অনেকেই জেলের দরজায় সমবেত হয়েছে। আসেনি লক্ষ্ণৌ থেকে কেশর। লক্ষ্ণৌ দূরপথ হলেও দেবশ্রী প্রত্যাশা করেছিল বই কি যে কেশর আসবে। তার দীর্ঘ মেয়াদের পর এই মুক্তির দিনটিকে আনন্দ উজ্জ্বল করে তোলবার জন্য লক্ষ্ণৌ কেন পৃথিবীর যে-কোন দূরপ্রান্ত থেকে সে ছুটে আসবে।

দেবিকার মনেও সেই আশা ছিল। কেন যে এল না সে ভেবে পায় না। সে তাকে আসতে চিঠি লিখেছিল। এল না। চিঠির উত্তর দিল না। কী যে হলো! দাদার মুখের অপ্রসন্নতা তাকে ব্যথিত করে তুলল। কেশরের উপর তার রাগ হলো।

দেবশ্রীর মনে কিন্তু একটা সংশয় ধুঁইয়ে উঠেছে। একটা কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে তার মনের আকাশকে কালো করে তুলেছে। কালো দম-বন্ধ করা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কেশর সেই ধোঁয়ার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দীর্ঘ ছ-টি মাস কেশরের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ ছিল না। সময়ের এই অতল গহ্বর কেশরকে গ্রাস করে ফেলল নাকি? সময়ের ব্যবধান তাকে যেন অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। চোখ বুজেও যে কেশরকে সে অন্তরের কাছে পেত তাকে সে চোখ চেয়ে হাতড়ে খুঁজে পায় না। কোথায় কি একটা ঘটেছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু কী যে ঘটেছে সে ভেবে কুল কিনারা পায় না। একই কারণে

দেবিকা কেশরের এই দূরত্বটা মনেপ্রাণে অনুভব করেছে। তার যেন মনের সুর কেটে গেছে। দূর থেকেও যাকে অতিনিকটে, অতি পরিচিত অন্তরঙ্গ আত্মীয় ভাবা যেত সে যেন নিঃশব্দে ও নির্বিবাদে নিজেকে সরিয়ে নিল দূর দূরান্তরে। অথচ ভাই বোনে কেউ এর কোন কারণ নির্ণয় করতে পারে না। পায় না কোন পার খুঁজে।

দেবশ্রী মনের মাঝে ছটফট করে। উদ্বেগে, আশঙ্কায় তার মনের আকাশ ধূসর হয়ে ওঠে। অসহায় ক্লান্তিতে সে ভেঙ্গে পড়ে।

শেষ শ্রাবণের আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে। সারারাত অঝোর ধারায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বৃষ্টির শব্দ নিষুতি রাতের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। দেবশ্রীরও চোখে ঘুম আসে না। দীর্ঘ দিনের বন্ধন দশার পর সদ্য-মুক্তির আনন্দ, গৃহকোণের আরাম রমণীয় শয্যা, অবিরাম ধারা পতনের মোহময় সুর কিছুই পারল না তার চোখে তন্দ্রার আবেশ আনতে। মুক্তির আনন্দ নেই তার মনে। মন তার ভারাতুর। বর্ষারাতের মতই বিষণ্ন। ঘোলাটে। কিছুই যেন সে মন দিয়ে ধরতে পারে না। কিছুই যেন তার বোধগম্য হয় না। মনের খটকা তীব্র কাঁটার মত খচ খচ করে বিঁধতে থাকে। অথচ কাঁটাটাকে নিবেশ করতে পারে না। মারাত্মক ভুল একটা হয়েছে। সাঙ্ঘাতিক গলদ একটা ঘটেছে সুনিশ্চিত। নইলে কেশরের মনের সুর কেটে যাবার কথা নয়। কেশর স্পষ্ট। কেশর স্বচ্ছ। তার মাঝে কুয়াশা নেই। সে ঝাপসা নয়।

কেশরকে ঘিরে তার মাঝে চিন্তার আলোড়ন চলতে থাকে। দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতি ও অদর্শন তার প্রতি তার প্রীতি উচ্ছ্বাসকে অনর্গল ও অসংযত করে তুলেছে। মনের গভীরে যে অকৃত্রিম অনুরাগ দিনে দিনে তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়েছিল সেই সুষুপ্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি তীব্র আবেগে তাকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে তুলেছে। বিরহের কাঠফাটা রোদে তার যৌবনের তুষার গলতে সুরু হয়েছে। আর

সে কোন বাধা মানতে চায় না। যত জোরে সে তাকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল তার দ্বিগুণ তেজে সে নিজেকে প্রকাশ করে দিতে চায়। স্রোতের বেগে সে মাটির বুকে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে নবজন্ম লাভ করতে চায়।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। ধারাপতনের শেষ নেই। আর শেষ নেই দেবশ্রীর চিত্তের আকুলতার। বৃষ্টি পতনের ঝম-ঝম শব্দের সঙ্গে তার অন্তরের আর্তনাদগুলি মিলে মিশে এক বিষাদ করুণ রাগিনীর সৃষ্টি করেছে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, দীর্ঘ দূর পথপারে, বিষন্ন বর্ষারাতে গোমতীর বুকে উদ্দাম ধারাপতনের সুরে সুর মিলিয়ে ব্যথিত যৌবনা বিরহিণী কেশর বীণা হাতে নিয়ে মালকোষে গান ধরেছে ঃ

"বাদল গরজ গরজকে তু
পয়গম শুনা দে
ধরতি সে আসমান তক
তুফান মাচা দে॥"

দেবশ্রীর মনে হয় সে কেশরের সামনে বসে সঙ্গত করছে। চোখের সামনে তার কামনার অপ্রাপ্ত দোসর, তার সাধনার সাথি। সুরে রূপে, মিড়ে মুর্চ্ছনায়, কুহক কটাক্ষে সে যেন তার অনাহত যৌবনকে উতল করে তুলছে। দেবশ্রীর মনে পড়ে কেশরের বাড়ির দোতালার সেই ঘরখানি। সকালে কেশর এসে তাকে ঘুম থেকে জাগাত। ঘরের খোলা জানালা দিয়ে গাছের ফাঁকে দেখা যেত গোমতীর বিস্তৃত জলরেখা। পরপারের বালুতট। বুনো গাছের ঝোপঝাড়। মসজিদের চুড়ো। ঢেউ খেলানো শূন্য মাঠ। মাঠের পারে ছোট ছোট গ্রাম। দিগন্তের শ্যামোচ্ছ্বাস। বারান্দায় বুক দিয়ে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গোমতীর বুকে সাদা পালতোলা নৌকো দেখত। দূর দিগন্তের পানে চেয়ে বিস্মৃত অতীতের অস্পষ্ট ছবি দেখত। কেশর ভোরে স্নান করত। পিঠের উপর ভিজে

এলোচুল মেলে দিয়ে দাঁড়াত। তার ভিজে চুলের আর ভিজে গায়ের ভুরভুরে গন্ধে বাতাস ভরে উঠত। দেবশ্রীর মনে হতো সে পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। লক্ষ্ণৌর সেই অপরিচিত বাড়িটিকে কেশর একটি পরিচিত রূপ দিয়ে তার সঙ্গে চেনা করে দিয়েছিল। বাড়িটি তাকে আপন ভেবে হৃদয়ে টেনে নিয়েছিল। মুক্ত আকাশ। বিস্তীর্ণ নির্জনতা। সাধনার পীঠস্থান। দেবশ্রীর ভাল লাগত। শুধু ভাল লাগত নয়, বাড়িখানাকে ভালবেসেছিল দেবশ্রী। সেই তার মুক্তির আকাশ। সেই আকাশের পানে চেয়ে সে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। কেশর তার সেই আকাশের ধ্রুবতারা।

কেশরকে স্বপ্ন দেখে আর কেশরকে ধ্যান করেই তার রাত পোহাল।

আকাশ ধরেছে। বৃষ্টি থেমেছে। সকালের ঝাপসা কোমল আলো তার বিছানার উপর, তার গায়ে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সে উঠে বসে মাথার দিকে জানালাটা খুলে দিল। বাদল হাওয়া আর স্নিগ্ধ আলোর ঢেউ এসে তার গায়ের উপর ছিটিয়ে পড়ল। মনে হলো যেন খিল খিল করে হাসতে হাসতে অতর্কিতে কেশর তার গায়ে লুটিয়ে পড়ল।

ছোট-মা চা দিতে এসে খানিক গল্প করল। প্রশ্ন করল, আপিস যাবি কবে থেকে ?

—দেখি, কবে থেকে যেতে বলে। আপিস তো জেলেও করতে হতো।

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে দেবশ্রী বললে, ভাবছি, দিনকতক একটু ঘুরে এসে কাজে জয়েন করবো।

ছোট-মা তার মুখপানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, এই ভরা বর্ষায় আবার যাবি কোথায়। বর্ষায় বিদেশে সুখ নেই।

—তা নেই সত্যি। তবে পথে বেরুলেই মন সোয়াস্তি পায়। মন মুক্তির স্বাদ পেতে চায়।

—কোথায় যাবি?

কুটিল চোখে চাইল ছোট-মা।

গলায় জোর দিয়ে দেবশ্রী জবাব দিল, হ্যাঁ ছোট-মা। লক্ষ্ণৌ যাবো। তোমাদের কাছে মিথ্যে বলে লাভ কি? লুকিয়ে রাখলে যখন চলবে না তখন লুকোচুরির কোন মানে হয় না। লক্ষ্ণৌই যাবো কেশরকে দেখতে। আসবার পথে বেনারসে নেমে দিদিমাকে দেখে আসবো।

একটু চমকে গেল বইকি ছোটমা তার দৃঢ়তায়। তার প্রকাশভঙ্গির রূঢ়তায়। সে যেন নিজেকে আর অদৃশ্য আড়ালে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায় না। আর সে প্রতীক্ষায় নিজেকে ক্ষয় করতে চায় না।

—তা হলে তুই মন ঠিক করেছিস?

মৃদু হেসে প্রশ্ন করল ছোট-মা।

দেবশ্রী পালটা প্রশ্ন করল, কেন দেবি তোমাদের কিছু বলেনি?

ছোট-মা ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে জবাব দিল, হ্যাঁ বলেছিল বটে, তবে—

—তবে?

—সে নাকি তোর চেয়ে বয়সে বড়ো, আর পেশাদার বাঈজী।

হাসল দেবু: তাই তোমরা তাকে বউ বলে স্বীকার করে নিতে পারবে না?

—আমার কোন স্বাধীন মতামত নেই সে তো তুই জানিস। এ তোর বাবার মনের কথা।

—বেশ তো। সে না হয় এ সংসারে আসবে না। থাকগে সে কথা পরে হবে। আগে দেখে আসি তার মনের চেহারাটা।

ছ-মাস তার কাছ চাড়া। ছ-মাসে অনেক ওলোট-পালোট হয়েছে।
জানি না তার মতের অদল-বদল হয়েছে কিনা।

খণ্টাখানেক পরেই দেবশ্রীর হস্তগত হলো কেশরের সাম্প্রতিক মনের একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য। এঁকেছে বিভা-দি। রেখায় বর্ণে সুস্পষ্ট আলোকময়।

বিভার স্নেহার্দ্র দীর্ঘ লিপি।

দেবশ্রী উর্ধ্বশ্বাসে চিঠিখানা পড়ল।

কেশরের মনের আকস্মিক আবর্তনের একটি ধারাবাহিক বিবরণী। নিপুণ হাতের লিপিকুশলতায় সমুজ্জ্বল। বিভার নারীমনের মমতা-ভরা আকুতি। বিপদাশঙ্কায় উদ্বেল।

দেবশ্রীর সংশয় নিরসন হলো। সব সন্ধানের সমাপ্তি ঘটল। কেশরের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের নির্ভুল উত্তর পেল। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পণ করেছে তার হিতার্থে নিজেকে সে বলি দেবে। পিতার আবেদনে সে সাড়া দিয়েছে। নিজের দুর্বলতাকে রক্ষা করবার জন্য, প্রতিজ্ঞা পালন করবার জন্য সে দেশত্যাগী হবে।

পিতার নিরুপায়তায় সে ব্যথিত হলো। বুদ্ধিতে ও চিন্তায়, জীবনে এবং আচরণে সে চিরদিন মর্যাদাসম্পন্ন। সে সংযত এবং নির্ভীক। অন্তরের সত্যকে সে লোকলজ্জায় বা লোকনিন্দার ভয়ে আবৃত করে রাখতে চায় না। সত্যকে সত্যের মর্যাদা দিতে হবে। সত্যকে শুভ্র চোখে দেখতে হবে। তাকে অযথা অপমানিত হতে দেবে না।

বিভার চিঠিখানা পকেটে নিয়ে দেবশ্রী সরাসরি দেবিকার বাড়ি গিয়ে উঠল। দেবির হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলল, আজই রাত্রে আমি লক্ষ্ণৌ যাবো দেবি।

দেবি চিঠিখানা আদ্যন্ত পড়ে বিস্ময় ভরা ব্যাকুল চোখে দাদার মুখের পানে চাইল।

দেবশ্রী বললে, এখন বুঝতে পারলি কেন সে এতো উদাসীন—কেন সে তোর ডাকে সাড়া দেয়নি ?

বিমর্ষ মলিন মুখে দেবিকা বললে, ভেতরে ভেতরে যে এতো কাণ্ড ঘটে গেছে তা জানবো কেমন করে ? সে তো ঘুণাক্ষরেও বাবার চিঠির কথা উল্লেখ করেনি।

—উল্লেখ করবে কেন ? সে যে প্রেমের শহীদ হতে চায়। নিজেকে বলি দিয়ে আমাদের সাংসারিক অশান্তি বাঁচাতে চায়।

—শুধু নিজেকে বলি দিচ্ছে কই ? সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও যে কতল করছে।

হাসল ভাইবোনে। দেবশ্রী কুটিল চোখে তার পানে চেয়ে বললে, সে বুদ্ধি কি মেয়েদের আছে ?

—নেই-ই তো। কিন্তু তুমি গিয়ে তাকে ফেরাতে পারবে ? যে গোঁয়ার মেয়ে আর যে ভালোবাসে তোমাকে। তোমার ভালো-বাসাকে মর্যাদা দেবার জন্যে আর বাবার ইচ্ছাকে সম্মান দেবার জন্যে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ভোলবার চেষ্টা করছে। তুমি কি তার এতো আয়োজন আয়াসকে উলটে দিতে পারবে ? চিঠিতে লিখছে পাসপোর্ট হয়ে গেছে। টমাস কুকের মারফতে প্যাসেজ পর্যন্ত বুক করা হয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবু বললে, আমার কর্তব্য আমাকে করতে হবে। আমাকে যেতেই হবে।

দেবিকা ঈষৎ হেসে বললে, হ্যাঁ। যেতে হবে। এটা তার নিছক অভিমান। তার ভালোবাসা আহত হয়েছে। অপমানিত হয়েছে।

একটু থেমে দেবিকা বিজ্ঞের মত ঘাড় দুলিয়ে বললে, মেয়েটার বয়স বেড়েছে, বুদ্ধি হয়নি। প্রেমের ব্যাপারে নিরেট আনাড়ি।

দেবু হালকা হাসিতে মুখ ভরে আগেকার দিনের মত তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বসল। বললে, তুই আর বকিস নে দেবি।

দেবু রাত্রের দেরাদুন এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করল।

॥ সাতাশ ॥

এমনি আকুলতা আর উদ্বেগ নিয়ে আর একদিন দেবশ্রী লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেছিল। কেশরের মোকর্দমার খবর শুনে। সেদিনের সঙ্গে আজকের যাত্রার আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখন কেশর গুপ্ত ছিল তার অন্তরের নিভৃত গুহায়। কেশরের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল তার পরিজনদের পরিমণ্ডলে। আজ কেশর সর্বজনপরিচিত। তার এই যাত্রার মাঝে নেই কোন গোপনতা। নেই কোন লুকোচুরি খেলা। বুক ফুলিয়ে সকলকে জানিয়ে সে আজ কেশরের কাছে চলেছে। সকলের চোখে হয়তো এটা দৃষ্টিসুন্দর বা শোভন নয়, তবু সে যে নিঃসঙ্কোচে স্পষ্ট বলতে পেরেছে এতেই সে একটা অসহ্য আনন্দ অনুভব করছে অন্তরে। হয়তো তার যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে একটা বৈদ্যুতিক গুমোট নেমে আসবে। একটা অসন্তোষের আবহাওয়া সৃষ্টি হবে। তবু সে বলতে পেরে, নিজের মনোভাব জানাতে পেরে খুশি হয়েছে। কারুর আর অজানা রইল না। আর কেউ না হোক, দেবি সুখি হয়েছে। সে নিজের গাড়িতে তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেছে। সে নিজের হাতে হোলডল খুলে বার্থে বিছানা পেতে দিয়ে গেছে। এবার আর থার্ড ক্লাস নয়। সেকণ্ড ক্লাশে রিজার্ভ বার্থ। দেবির ব্যবস্থা। দেবিই লোক পাঠিয়ে বার্থ রিজার্ভ করিয়েছে। টিকিট কাটিয়েছে। দেবি কেশরকে শুধু স্বীকার করে নেয়নি, তাকে সে ভালোবেসেছে। সে চাক্ষুস করেছে, সে প্রাণ-মণ দিয়ে অনুভব করেছে দেবুর প্রতি তার নিভৃত নারীসত্তার প্রগাঢ় অনুরাগ।

অন্ধকার মথিত করে ট্রেন ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। আকাশে মেঘ ছুটোছুটি করছে। বর্ষার আকাশ। আকাশে আলো নেই।

রঙ নেই। বিবর্ণ, বিষণ্ণ ধূসর ধূমাভ মেঘে ঢাকা। খাকি-পরা মেঘের পল্টন যেন আকাশকে অবরোধ করেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের অনল শিখায় আকাশ বিদীর্ণ হচ্ছে। বহুদূর দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে আক্রমনের আস্ফালন হুঙ্কার।

মেঘ আর মেঘ।

দেবশ্রী খোলা জানালা দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে দেখে। মেঘ-মেছুর অম্বরের পানে চেয়ে তার বিরহী-চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে। মন তার গতি পায়। চলন্ত ট্রেনের মত, ভাসমান মেঘের মত মন তার উদ্দাম গতিতে বন-বাদার নদী-নালা পেরিয়ে, পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে গোমতী তীরের সেই ছায়াঘন স্বপ্নকুঞ্জের দিকে ছুটে চলে। যেখানে কেশর মেঘদূতের অভিশপ্ত যক্ষের প্রণয়িনীর মত বিরহ তাপে দিন দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অশ্রু বিগলিত নয়নে নিঃসঙ্গ কালযাপন করছে।

কেশর তার মনের মাঝে উত্তাল হয়ে ওঠে। নবিড় মেঘপুঞ্জের পানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে সে কেশরের স্বপ্ন দেখে। অসিতবরণা মেঘদলকে মনে হয় কেশরের ঘনকৃষ্ণ এলায়িত অলকদাম। মুহুঃর্মুহু বিদ্যুৎ চমককে মনে হয় কেশরের হাসির ঝিলিক। তার উদ্দাম কটাক্ষ। ভাসমান পাতলা মেঘকে মনে হয় কেশরের স্খলিত উত্তরীয় বাস।

কেশর! প্রেমাভিমানিনী কেশর। বিরহবিধুরা কেশর তার দুই চোখে ভেসে উঠেছে। ভেসে বেড়াচ্ছে অনন্ত আকাশকোলের মেছুর মেঘের মত। কেশর তার যৌবনের প্রথম কবিতা। প্রেমের প্রথম গান। কেশরের কণ্ঠ তার রক্তের মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে অহোরাত্র। যে কণ্ঠ সুরের মধ্যে দিয়ে বিরহী চিত্তের ব্যাকুল বেদনাকে মূর্ত করে তুলেছে। সেই কণ্ঠ তার তরুণ অন্তরের গহনতম দেশে সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল তার কণ্ঠের প্রথম উচ্চারণে :

"বাবুল মোরি নৌহারা ছুট যায়"

কে জানত সে-দিনের সেই স্বপ্নময়ী কেশর তার জীবনে প্রলয়-রূপিনী কল্পময়ী হয়ে দেখা দেবে। প্রথম দিনের সেই সঙ্গীতরূপিনী কেশরকে তার স্থূল শরীরী মানবী মনে হয়নি। তাকে সে রাগিনীর প্রতিরূপ ভেবেছিল। ভেবেছিল সে একটা সুরের মিড়! একটা মূর্চ্ছনা। যা সূক্ষ্ম অনুভূতিকে ছোঁয়া দিয়ে যায়। মনের অলক্ষ্যপুরে যার অধিষ্ঠান।

কিন্তু এ কেশর কামনাময়ী। এ কেশরের গায়ে পৃথিবীর গন্ধ। শরীরে মনে সে কঠিন ধরণীর মেয়ে। জীবনের কোন অর্থ, কোন রহস্য তার ঝাপসা নয়। অস্পষ্ট নয়। শরীরে তার জীবনের স্বপ্ন ঘুমিয়ে আছে। শরীরের রক্তে আছে কামনাময় জীবনের পিপাসা। পুরুষের জীবনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। পুরুষের বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে ধরা দেবার আকুলতা।

দেবশ্রী তার শরীরে কেশরের কামনার উত্তাপ অনুভব করে। তার ফুলন্ত শরীরের কমনীয় কান্তি থেকে একটা তাপ প্রবাহ বিকীর্ণ হয়ে তার শরীরকে বিদ্যুৎময় করে তোলে। তার অনুভবের আকাশ কামনায় আরক্ত হয়ে ওঠে। অগ্নিময় এই অনুভূতি তার স্নায়ু শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। কামনার আগুন। সে কামনা কেশরের সঙ্গে মিলনের। আদিম নরনারীর মিলনের অদ্ভুত অবর্ণনীয় সে আকাঙ্ক্ষা। অভিজ্ঞতা নেই দেবশ্রীর সে মিলনের। অনন্ত রহস্য-কুহেলি আবৃত সেই মিলনের মাঝে সৃষ্টির পরম রহস্য সঙ্গোপন। সে, সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে চায়। কেশরের কৃচ্ছ-সাধনক্লিষ্ট বিলম্বিত কৌমার্যের অবসান ঘটিয়ে সে তাকে নারীত্বে উত্তীর্ণ করে দিতে চায়। তার পুরুষ হতে চায়। কেশর তার জীবনের নারী। দেহ হবে তার মিলনের নিত্য ক্ষেত্র। কেশরের সঙ্গে সে মিলিত হতে চায়। যুক্ত হতে চায়। কেশরকে ধরিত্রীর মত শস্যশালিনী করতে চায়।

বর্ষার সজলতা ধরিত্রীকে রসময়ী করে তোলে। রসের ঋতু

বর্ষা। বর্ষাসমাগমে জড় প্রকৃতি থেকে জীব-জগতে সকলেই রসরঙ্গে মত্ত হয়ে ওঠে। কঠিন পাষাণ বুকে শ্যাওলা গজায়। শ্যাওলার ফুল ফোটে। কীট-পতঙ্গ থেকে মহামানব পর্যন্ত তনু সম্ভোগ বাসনায় আকুল হয়ে ওঠে। ধারাবর্ষণের আঘাতে যেমন গাছের শাখা পল্লব উতরোল হয়ে ওঠে, মেঘ দেখে ময়ূরী যেমন পুচ্ছ মেলে মিলন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তেমনি বর্ষারাতের অবিরাম বৃষ্টিধারার ঝমঝম শব্দে কিংবা মেঘ-মেদুর আকাশের পানে চেয়ে মানব মনের শাশ্বত কামনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বর্ষার যাদুস্পর্শে জড়জগৎ যেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তেমনি বর্ষার প্রভাবে মানব মনের এই পরমাশ্চর্য দেহ প্রদীপ শিখায় জ্বলে ওঠে। দেহকে অতিক্রম করে প্রেমের কোন রূপ নেই। তাই দেহ বিলাসের সাত্বিক নাম দেহধর্ম।

কেশরের প্রতি দেবশ্রীর নিবিড় ও সূক্ষ্ম অনুরাগ বর্ষার ভরা নদীব মত তার মনের দুকুল ছাপিয়ে দেহতটে এসে অবিরাম আঘাত করতে থাকে। তার অনভিজ্ঞ অনাস্বাদিত দেহ কেশরের দেহের স্বাদ পাবার জন্য উদ্দাম হয়ে ওঠে। হ্যাঁ। কেশরকে সে চায়। মনে প্রাণে তাকে সে পেয়েছে। পেতে হবে তাকে দেহে। তার দেহেব সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে হবে। ঘনিষ্ঠ হতে হবে। একীভূত হতে হবে। হিয়ে হিয়া রাখনু। দুটি দেহ মিলে এক হয়ে যাবে। তাব অনুপম দেহ লালিত্যে সে মুগ্ধ পূর্ব থেকে। আজ সে লুব্ধ। নিজেব দেহেব অনু-পরমানু দিয়ে কেশবের প্রতিটি অঙ্গ সে উপভোগ করতে চায়। আকণ্ঠ পান করতে চায় তার সৌন্দর্য সুষমা। একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় তাব শরীরে কাঁপুনি জাগে। নির্জলা মদের মত এই তীব্র অনুভূতি তাকে মাতাল করে তোলে। সে চলন্ত বিছানার উপব গা ঢেলে দেয়।

কেশরের অঙ্গমাধুর্য তার মগজে পাক খেতে থাকে। তার দেহের মধুর স্পর্শ যেন তাকে জড়িয়ে ধরে। এক অঙ্গে কত রূপ।

দেহ নয় যেন রসের পসরা। বর্ষার নব মেঘ। বিরহী যক্ষের মত তারও মনে হয়ঃ

…'যা তত্র স্যাদযুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ'

কেশরই তার বিধাতার আদি-সৃষ্ট যুবতী। কেশর ষড়ৈশ্বর্যশালিনী ভুবনমোহিনী। অন্ধকার-শাসিত মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির মায়াকাজল আকাশের বুক থেকে কখন মুছে গেছে। ট্রেনের গতিবেগ যেন সময়ের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে দ্রুতগতিতে রাতের দেশ পার করে দিনের দেশে নিয়ে এল। নতুন দিনের সূচনা কিন্তু দেবশ্রীর মনে কোন আশা আশ্বাস বহন করে আনল না। দিনের পৃথিবীর সঙ্গে শুয়ে শুয়ে শুভদৃষ্টি করবার জন্যে চোখ খুলতেই তার শরীরের বৃন্ত থেকে খসে ঝরে পড়ল রাতে-ফোটা স্বপ্নের ফুলের পাপড়িগুলি। দুরন্ত হওয়ায় কদম কেশরের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল কেশরের বিরহব্যথা-স্নিগ্ধ স্বপ্নের মাধুর্য। বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেই একটা দুঃস্বপ্নের ভয়াবহ বিভীষিকা তার শ্বাসরোধ করে দিল। যাত্রিদের মুখে চোখে বিপদের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। স্টেশনেব ভেণ্ডার ও মুটে মজুর সকলের মুখে একটা আতঙ্কের আভাস। কণ্ঠে অস্ফুট উচ্চারিত ভয়ার্ত বাণীঃ দরিয়ায় তুফান এসেছে। গঙ্গার বানে কাশী ডুবু ডুবু। গোমতী অযোধ্যা ভাসিয়ে দেবে। হূহু-চ্ছ্বাসে জল বাড়ছে।

সকলেরি কথার অন্তঃপ্রবাহে আতঙ্ক আর হতাশার দীর্ঘশ্বাস। প্রকৃতির বিপর্যয়। মানুষ যেখানে অসহায়।

বিপদের ভয়াল মূর্তিটা কল্পনা করে সকলে শিউরে উঠেছে। সকলেই যেন স্তিমিত, মুহ্যমান। সকলেই যেন সংশয়ের ব্যথায় আধমরা। মুখে রক্ত নেই। বিবর্ণ পাংশু। কথা বলার শক্তি নেই। নিষ্ঠুর প্রকৃতির পাশব শক্তির কাছে ভেঙ্গে পড়বার জন্য সকলেই যেন উচ্চকিত। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বা জয়ী হবার শক্তি তো কারুর নেই। প্রাত্যহিক কর্মসূচীর বাইরে সকলেই যেন টলমল করছে। সকলের মুখেই ঐ এক কথাঃ দরিয়া আর

তুফান। গঙ্গা আর গোমতী। ক্রোধে অন্ধ উন্মাদ্দিনীর মত ছুটে আসছে। পৃথিবীকে ভাসিয়ে ডুবিয়ে দেবে। কারুর রক্ষা নেই।

দেবশ্রীর স্বপ্ন ভঙ্গ হতেই প্রথমটা সে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল সে কেশরের ঘরে খিল এঁটে দিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। অনর্থক চেঁচামেচি করে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। তাকে বন্ধ ঘরের খিল খোলাল। সে সংবাদটাকে হৈ চৈ ভেবেই প্রাধান্য দেয়নি। এর মাঝে আবার নতুনত্বটা কি? বর্ষার নদী ফুলে ফেঁপে কানায় কানায় ভরে উঠবে বই কি! তটভেঙ্গে কুল ছাপিয়ে যদি মাঠ ঘাটে উপচে পড়ে তাতেই বা ক্ষতি কি? সেই তো বর্ষানদীর যৌবন চাঞ্চল্য। প্রাণরসোচ্ছল যুবতির আকুলতা অধীরতা। সেই তো ভরা যৌবনের চোখ জুড়ানো রূপ।

কিন্তু দেবশ্রীর বুক দমে গেল যখন ট্রেনখানা কাশী ব্রিজের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ট্রেনের সমস্ত যাত্রি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে। একটা বিপদের বার্তা যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। যাত্রি জনতা স্তব্ধীভূত। ভয়ে রুদ্ধশ্বাস। রেল লাইনের জাঙ্গালের দু-পাশের মাঠ গঙ্গাব গেরুয়া জলে ভরে গেছে। মা গঙ্গা কুলতট টপকে অন্তত দু-মাইল চড়াও হয়ে এসেছেন।

ধীর মন্থর গতিতে তীব্র হুইসেল দিতে দিতে গাড়ীখানা ব্রিজের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলল। দেবশ্রী ঊর্ধ্বশ্বাসে চেয়ে দেখছে গঙ্গার পানে। দেখছে না। খুঁজছে। খুঁজে পাচ্ছে না তার কাশীর চেনা গঙ্গাকে। হারিয়ে গেছে শঙ্কর-মৌলি নিবাসিনি অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার অমল ধবল তরঙ্গ এক বিশ্বগ্রাসী উত্তাল জলরাক্ষসীর ক্ষুধিত জঠরে। গঙ্গা কোথায়? কোথায় সেই ত্রিভুবনধন্যা ভীষ্মজননী, কোথায় সেই মুনিবর জহ্নু কন্যা ত্রিলোকপূজিতা জাহ্নবী। গঙ্গার একি প্রলয়ঙ্করী বিভীষণা রূপ? যাঁর চরণকমলপাতে কাশী হল যুগযুগান্তের পুণ্যতীর্থ, কাশীর সেই পূর্ণরূপা, শঙ্করের প্রাণপ্রিয়া অন্নপূর্ণার এ কি করালী চণ্ডালিনী রূপ! দেবশ্রীর বুক কাঁপে

গুরু গুরু। তার চোখ জ্বালা করে। সে চোখ চেয়ে দেখতে পারে না সেই সর্বনাশা দিকচিহ্নহীন উত্তাল জলরাশির পানে। এ জল নয়, গালিত গৈরিকের অনন্ত নিঃস্রাব। পৃথিবীকে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

মাঝগঙ্গা পার হবার সময় উত্তাল তরঙ্গদলের অন্ধ আক্রোশ ও উন্মত্ত দাপাদাপি দেখে দেবশ্রীর মনে হলো চোখের পলকে এই বিশাল জলস্তম্ভ সেতুর উপর উল্লম্ফন করে এই অসংখ্য যাত্রীবাহী গাড়িখানাকে গ্রাস করবে।

সে সভয়ে কম্পিত বক্ষে বিছানার উপর বসে পড়ল।

মুমূর্ষু গাড়িখানা ধিকিয়ে ধিকিয়ে ব্রীজ পার হয়ে এল। রুদ্ধশ্বাস মরণাপন্ন যাত্রিদল বিপদ এলেকা পার হয়ে এসে মা গঙ্গার জয়ধ্বনি করে উঠল ঃ গঙ্গা মায়িকী জয়। কাশী বিশ্বনাথ কি জয়!

বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে গাড়ি থামলে দেবশ্রী গা-ঝাড়া দিয়ে প্লাটফর্মে নেমে পড়ল। মৃত্যুর দেশ থেকে জীবিতের দেশে ফিরে এল। কর্মচঞ্চল জনস্রোতের মাঝে সে জীবিতের প্রাণস্পর্শ পেতে চাইলে। সে একটা কেলনারের বয়কে খাবারের অর্ডার দিল।

একটা অদ্ভুত হাওয়া বইছে। হাওয়াটা যেন মাটির নীচে থেকে উঠে উপর পানে ছুটে যাছে। গাছের মাথায় ধাক্কা দিয়ে আকাশের মেঘকে তাড়া করছে। মেঘগুলো তাড়া খাওয়া মোষের মত ছুটোছুটি করছে। দুপুরটি মনোরম মনে হলো দেবশ্রীর। ছায়াঘের স্নিগ্ধ। মেঘ আছে। বৃষ্টি নেই। বাতাস বইছে জোরে। ঝড়ো হাওয়ায় গাছের শুকনো পাতা খসে এসে ট্রেনের ভিতর তার কোলের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। বাইরে বাতাসের ঘূর্ণিতে পড়ে শুকনো পাতার স্তম্ভ পাক খাচ্ছে। প্রকৃতি যেন উল্লাসে বন্য হয়ে উঠেছে।

ভৈরবী গঙ্গাকে পেছনে ফেলে ভয়ার্ত কম্পিত বুকে দেবশ্রী এগিয়ে চলেছে পুণ্যোদকা গোমতী তীরের প্রেমতীর্থে।

॥ আটাশ ॥

তিনদিন অশ্রান্ত বর্ষণের পর আজ সকাল থেকে বৃষ্টি ধরেছে। বর্ষণক্ষান্ত মেঘলা আকাশে রোদ দেখা দিয়েছে। প্রশান্ত আকাশে প্রসন্ন রৌদ্রধারা। কেশরের মনের গুমোট কাটল। পাখির স্তব্ধগলায় কলকূজনের মত অন্তরের গুঞ্জরিত গান প্রাণ পেল তার কণ্ঠে। জলে-ভেজা পাখি যেমন অপরূপ ভঙ্গিতে রোদে ডানা মেলে দিয়ে ভিজে পাখা শুকিয়ে নেয় কেশরও তেমনি এলোচুল এলিয়ে দিয়ে বারান্দায় বুক দিয়ে দাঁড়াল। কণ্ঠে গুনগুনিয়ে উঠল ঃ

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি
সখি জাগো। জাগো।"

তিন দিন সে ঘর থেকে বেরুতে পায় নি। আকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণ আর দুকুল-ভরা গোমতীর পানে চেয়ে চেয়ে সারা দিনমান কেটেছে। নানী ছাড়া অন্য কারুর মুখ দেখেনি। কখন একা একা বসে গান গেয়েছে। কখন শুয়ে শুয়ে দেবশ্রীকে ভেবেছে। ভেবেছে আর চোখের জল মুছেছে। দেবশ্রীকে ভাবা তো তার চিরদিনের। তার শেষ নেই। তার সজীব মূর্তিকে অন্তরের মাঝে বসিয়ে তাকে আত্মনিবেদন করে সে তার যৌবনের ক্ষুধা মেটায়।

তার চেতনার মাঝে দেবু অমর হয়ে থাকবে। তার জীবনে না পৌঁছতে পারলেও তাকে পাবার এই আকুলতাই হবে তার প্রাত্যহিকতা। তার জীবনের প্রচণ্ড লালসা। যেখানেই সে থাক, বিলেতেই হোক আর ভারতেই হোক, স্বর্গেই হোক আর পাতালেই হোক আত্মা তার সদাসর্বদা দেবশ্রীর কাছেই থাকবে। দেবশ্রীই তার নিরাপদ গৃহকোণ। দেবশ্রীই তার অস্তিত্ব রক্ষার অবস্থান। দেবশ্রীই তার চেতনা জুড়ে পাক খাচ্ছিল। সে জানতে পারেনি

সূর্য কখন মেঘে ঢাকা পড়েছে। অস্পষ্টভাবে আকাশের পানে চোখ তুলে তাকাল একবার। আকাশে মেঘ জমেছে। চোখ নামিয়ে দেবদারুর ফাঁকে নদীজলের পানে চাইল। কেশরের মনে হলো হঠাৎ যেন ক্রুদ্ধা নদী তীব্রভাবে ধারা বদলে পশ্চিম মুখে ছুটেছে। নদীর প্রবাহিত ধারায় মাঠ-ঘাট বনভূমি কাদা গোলা অস্বাভাবিক উত্তাল জলরাশিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

—কেশর!

ঘর থেকে ডাক দিল নানী।

কেশর ঘরের ভিতর গেল।

নানী বললে, তুই চা খেয়ে নিস। আমি দাইকে নিয়ে একবার শব্জী বাজারে যাচ্ছি। ঘরের রসদ ফুরিয়েছে। তিনদিন বাজার হয়নি। আমি সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবো।

কেশর গোমতীর পানে চেয়ে বললে, তোমাব গোমতীর মূর্তি দেখেছো নানী? হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠলো কেন? আক্রোশে গজরাচ্ছে। কিসের আক্ষেপ?

নানী তার গাল টিপে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, তোরই মতো যৌবনের আক্ষেপ।

—যৌবনের আক্ষেপে এমন সর্বগ্রাসী মূর্তি?

—তাই নিয়ম।

হাসতে হাসতে নানী গায়ে ওড়না জড়িয়ে নিচে নেমে গেল।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কেশর বললে, দেরী করোনা। একা রইলুম।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নানী বললে, তুফান এলেও আমাদের এখানে পানি উঠবে না। অনেক তুফান দেখেছি। ভয় নেই। কেশর চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নদীর দিকে তাকাল। সকলেই তাই বলে। গোমতীর বন্যায় কখন তার বাড়িতে জল ওঠেনি। নদীর গর্ভ থেকে বাড়িটা অনেক উঁচুতে

এবং অন্তত পাঁচশো গজ দূরে। বাড়ির পেছনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমিতে শব্জীর আর ফুলের বাগান। তারপর উঁচু ঢিবিতে সারি সারি কতকগুলো দেবদারু আর বুনো ঝাউ গাছ। তার নীচে নদী। নদী কিন্তু ফেঁপে ফুলে অনেক উঁচুতে উঠেছে। ক্রীড়াশীল বালিকার মত দৌড়তে দৌড়তে হাত বাড়িয়ে দেবদারুর গুঁড়ি ছুয়ে যাচ্ছে। আর হেসে ফেটে পড়ছে।

চা খেতে খেতে কেশরের মনে হলো সে যেন অত্যন্ত অলস হয়ে পড়ছে। অলস আর নির্জীব। নিঃসঙ্গতা তাকে নির্জীব করে দিচ্ছে। অকাল জড়তা তার দেহমনে বাসা বাঁধছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো পাট করতে করতে তার মনে হল জীবনের উপর অভিমান করে সে জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুপুররাতের ঘন অন্ধকারের মত মিশমিশে কাল চুলগুলো অযত্নে কটা হয়ে যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন চোখে সে নিজের প্রতিবিম্বের পানে চেয়ে রইল। রুটির সঙ্গে ঝগড়া করার মত জীবনের সঙ্গে ঝগড়া করে বাঁচা চলে না। অনর্থক অভিমান। অনর্থক কলহ। নিজের প্রসাধিত সুন্দর কান্তির পানে সে একদৃষ্টে চেয়ে দেখল। সদ্য-বিকশিত ফুলের গন্ধের মত একটা মধুর সৌরভ তার কুচযুগল থেকে নাকে ভেসে এল। কস্তুরী মৃগের মত সে চঞ্চল ও অধীর হয়ে উঠল।

বুকে সাহস আনতে হবে। তাকে বাঁচতে হবে। সাহস হারালেই ভাগ্য হারাতে হবে।

আবার সে নিজের পানে তাকাল। নিজেকে ফিটফাট করে নিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে গেল। কে যেন তার হাত ধরে ডেকে নিয়ে গেল ঃ দেখবি আয়।

সে সোজা গিয়ে একটা ফুল তুলে এলো খোঁপায় গুঁজে দিল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে নদীর দিকে এগিয়ে গেল পাগলী গোমতীর গান শুনতে।

মেঘ ফুঁড়ে হলুদরঙা নিষ্প্রভ সূর্য উঁকি মেরে পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখছে। ঘরানা মেয়ে গোমতীর এই আকস্মিক স্বেচ্ছাচার দেখে যেন সে লজ্জা পেয়েছে। স্বেচ্ছাচার বই কি। প্রকৃতির ব্যভিচার। নিষ্ঠাবতী বৈরাগী মেয়ের নিছক বেলেল্লামী।

নদীবুকেও সেই উর্ধ্বমুখী ঘূর্ণি হাওয়া। ধূলো-বালি আর শুকনো পাতা উড়িয়ে সজীব স্তম্ভের মত পাক খেতে খেতে উপরে উঠছে। পাগলি মেয়ে যেন ফুৎকারে শুকনো পাতা-কাঠি উড়িয়ে দিচ্ছে।

স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মত কেশর ক্রুদ্ধা গোমতীর অস্বাভাবিক বিস্ফার ও স্বেচ্ছাচার দেখতে দেখতে বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছিল। সে এই বিপুল জলোচ্ছ্বাসের অমিত বিস্তার ও ভয়-ভীষণ আস্ফালন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে অভিভূতের মত তন্ময় হয়ে প্রকৃতির এই ভয়াল সৌন্দর্য দেখছিল।

কতক্ষণ পরে কে জানে হঠাৎ তার চেতনা ফিরে এল শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত এক অদ্ভূত আর্তকলরবে।

এও কি উন্মত্ত নদী জলের পৈশাচিক কলরোল? না কোন অদৃশ্য ভগিরথের মন্ত্রপূতঃ শঙ্খধ্বনি? উন্মাদিনী নদীকে শান্ত হতে বলছে?

কিন্তু না তো। হুড়োহুড়ি করে লোক ছুটছে। আকাশ বাতাস ভরে গেছে ত্রাসিতের আর্তনাদে। শঙ্খনাদ বিপদ-সঙ্কেত।

দূরে লোক ছুটেছে। পেছনের সড়কে উর্ধ্বশ্বাসে টাঙা ছুটেছে। কলরব মিশ্রিত ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

কেশরের মনে হলো এক বিপুল জলোচ্ছ্বাস তাদের তাড়া করছে।

কেশর ভয় পেল।

এত দূরে আসা তার উচিত হয়নি মনে হলো।

সে ক্ষিপ্র পায়ে বাড়ির দিগে এগিয়ে চলল।

বাড়ি থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে মনে হলো। সে বাড়ির দিকে ফিরে তাকাল। চীৎকার করে সাড়া দিল, নানী! নানী—এই যে আমি।

সঙ্গে সঙ্গে কর্ণবধির-করা একটা তুমুল গর্জন সমস্ত কোলাহল কলরব ডুবিয়ে দিল। মুছে দিল ধরণীর আর্তরব।

কেশরের পা মাটিতে বসে গেল। সে নড়তে পারল না।

কেশর! কেশর!

কেশর বাগানের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে বজ্রাহতের মত। বিস্ময়ে ও ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে নদী বুক থেকে কেশর ফুলিয়ে লাফিয়ে উঠছে কপিশবর্ণ অগণিত জলসিংহ—শ্রেণীবদ্ধ সিংহদল দেয়ালের মত হুহুঙ্কারে এগিয়ে আসছে। সে বিস্ময়াহত মূর্চ্ছিতের মত সেই দিকে চেয়ে রইল। চোখ ফেরাবার শক্তি রইল না।

চোখের পলকে পর্বত প্রমাণ উত্তুঙ্গ জলরাশি গর্জন করতে করতে তার দিকে তাড়া করে এল। সে ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়। বিবশ হয়ে গেল।

—কেশর! কেশর!

দেবশ্রীর আর্ত চীৎকার!

বিভ্রান্তের মত চোখ তুলতেই চীৎকার করতে করতে দেবশ্রী ছুটে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবলে তার হাত চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল, পালিয়ে এসো।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাক্ষসী তরঙ্গ তাদের উদরস্থ করে ফেলল। তারা জড়াজড়ি করে তলিয়ে গেল অন্ধকার জলতলে। এক স্পন্দহীন সর্বগ্রাসী মুহূর্ত! মুহূর্তের উত্তাল স্রোত তাদের মাথা ডিঙ্গিয়ে দূরে চলে গেছে। ছিন্নমূল পাদপের মত তাদের গড়িয়ে নিয়ে গেছে অনেকখানি। দেবশ্রী পায়ে সর্বশক্তি জড়ো করে কেশরকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। কেশর কিন্তু ভারী হয়ে উঠেছে। তার দাঁড়াবার শক্তি নেই। সে মূর্চ্ছা গেছে।

দেবশ্রী তাকে বুকে তুলে নিয়ে হাঁটু জলের মধ্যে দিয়ে টলতে টলতে চাতালের দিকে এগিয়ে গেল। স্রোতের খরবেগে মাটিতে পা রাখা যায় না। গল গল করে জল বাড়ছে। বাড়িতে এক কোমর জল। কেশরকে বুকে ঝুলিয়ে পা-পা করে দেবশ্রী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু সিঁড়ির মুখে পৌছবার আগেই আবার একটা উত্তাল তরঙ্গ এসে তাদের গ্রাস করল। প্রচণ্ড আঘাতে দেবশ্রী কেশরকে নিয়ে আছড়ে পড়ল। দুজনেই অথৈ ঘূর্ণি-জলে তলিয়ে গেল। জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে তারা দেওয়ালে এসে আটকে গেল। প্রাণপণ শক্তিতে দেবশ্রী কেশরকে আঁকড়ে ধরে আছে। তরঙ্গের আঘাতে দেয়ালে পিষে গেল মনে হল। দেওয়াল আশ্রয় করে দেবশ্রী আবার শক্ত হাতে কেশরকে তুলে ধরল। জলের উপর মাথা তুলে কেশর একটা নিশ্বাস ফেলে হাঁপ ছাড়ল। মুখ থেকে জল ফেলে দিল। কেশরের কপালের কোণটা থেঁতো হয়ে গেছে। রক্ত গড়াচ্ছে। দেবশ্রীর মাথায় ও প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। সে কোনরকমে কেশরকে উপরে তুলে নিয়ে.যেতে চায়। সে স্খলিত পায়ে কেশরকে ঝুলিয়ে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে তাকে সিঁড়িতে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসল। কেশর তার গায়ে ঠেস দিয়ে বসল। দেবশ্রী তার গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে ডাকল, কেশর! কেশর!

দেবশ্রীর শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তার মাথার ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা। তার মনে হলো তাকে যেন ছিঁড়ে দু-টুকরো করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে তো অপেক্ষা করা চলে না। আর একটা জলোচ্ছ্বাস এলেই সিঁড়িগুলোকে ডুবিয়ে দেবে। সে এক হাতে কেশরের কোমরটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আর এক হাতে সিঁড়ির আলসে ধরে বললে, কেশর, যেমন করে হোক ওপরে উঠে চলো। আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াও। কেশর কাঁপছে। তার কালো

ভিজে চুলগুলো মুখের ওপর জটার মত ঝুলছে। ভিজে চুল থেকে মুখের উপর জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কেশর কাঁপতে কাঁপতে প্রেতায়িত দৃষ্টিতে দেবশ্রীর মুখের পানে তাকাল।

দেবশ্রী তাকে শক্ত করে চেপে ধরে বললে, ওপরে উঠে চলো।

কেশর সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে মনে হলো। সে এক হাতে দেবশ্রীর কাঁধে হাত দিয়ে, আরেক হাতে দেয়াল ধরে তিন চারটে সিঁড়ি উঠল। সেই সময় উন্মত্ত গর্জন করতে করতে একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস এসে সবলে বাড়ির দেয়ালে আঘাত করল। সাড়া বাড়িখানা দুলে উঠল। চোখের সামনে ক-টা বিরাট গাছ হুমড়ি খেয়ে উলটে পড়ল। কেশর সভয়ে চোখ বুজল। দেবশ্রীর মনে হলো সে পড়ে যাবে। দেবশ্রী তাকে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরল। কেশরের কণ্ঠ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তস্বর নির্গত হলো। ভয়ার্ত বন্য পশুর মত তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

—কেশর, ওপরে চলো। আমরা মরবো না। মরলে আমাদের চলবে না।

কেশর তার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল। দেবশ্রীর চোখ দুটো বাঘের চোখের মত লোলুপ হয়ে উঠল। সে মুখ নিচু করে কেশরের গালে মুখে অজস্র চুম্বন করে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। তার মাঝে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে চাইল। কেশর চোখ বুজল।

হঠাৎ দেবশ্রী শরীরে অসুরের শক্তি পেল। অমিত শক্তিতে সে সহসা দুহাতে কেশরকে তুলে নিয়ে উপরে উঠে গেল। একটা বাঘ যেন হরিণী শিকার করে তার নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেল।

বজ্রপতনের শব্দের মত আবার একটা শব্দ হলো। প্রচণ্ড আঘাতে বাড়িখানা থর-থর করে কেঁপে উঠল। দেবশ্রী থমকে দাঁড়াল ঘরের দরজার কাছে ল্যাণ্ডিং-এর উপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক ঝুপ-ঝাপ পতন শব্দে তাদের কাঁপিয়ে তুলল।

দেবশ্রী ফিরে তাকাল না। তার সাহস হলো না। সে অন্ধ,

অচেতন ক্ষিপ্তের মত কেশরকে বহন করে নিয়ে ঘরে ঢুকল। সেই ঘর। যে ঘরে সে বাস করে গেছে। এই ঘরের সংলগ্ন কেশরের রেওয়াজ ঘর। মাঝখানে সিড়ি দুপাশে ঘর। সিঁড়ির ও-পাশে কেশরের আর নানীর শোবার ঘর। এ-দিকের ঘর দুখানা নতুন। কেশরের আমলের।

কেশরকে ঘরের মাঝে নামিয়ে দিয়ে দেবশ্রী দরজার কাছে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে জলের মাঝে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। সিঁড়ির ও-দিকের ঘর দুখানাকে একটা প্রচণ্ড তরঙ্গ এসে গ্রাস করল। তখন বারান্দাটা খসে পড়েছিল এখন ও-দিকের অংশটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে জলের তলায় তলিয়ে গেল।

এখনো দিনের আলো নিভে যায়নি। দিনের স্তিমিত আলোয় দেবশ্রীর মনে হলো অনন্ত সমুদ্রের মাঝে একটা জলটুঙিতে কেশরকে নিয়ে সে বাস করছে। চারিদিকে শুধু উন্মত্ত জলঝঞ্ঝা। গাছের পর গাছ নির্মূল করে প্রলয়ঙ্কর তরঙ্গমালা ছুটে আসছে।

বিবর্ণ মুখে বশ্যতার দৃষ্টি দিয়ে সে কেশরের পানে ফিরে তাকাল। কেশর মূর্চ্ছাহতের মত অর্ধচেতন অবস্থায় কাঁপছে থর থর করে।

—কেশর!

মুখের উপর থেকে ভিজে চুলগুলো সরাতে সরাতে দেবশ্রী কম্পিত আর্তস্বরে ডাকল: কেশর! কেশর! কথা কও। চোখ খোল।

কেশর শূন্য দৃষ্টিতে তার পানে মুহূর্ত চেয়ে আবার চোখ বুজল। তার কপালের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে এসে ভুরুতে জমাট বেঁধেছে। দেবশ্রী নিজের জামা গেঞ্জিটা খুলে ফেলে ভিজে কাপড়ের খুঁট দিয়ে কেশরের মুখের রক্ত মুছে দিল। তারপর একটি একটি করে কেশরের ভিজে জামা কাপড়গুলো টেনে খুলে নিল।

কেশর কথা বলল না। উদভ্রান্তের মত শূন্য দৃষ্টিতে তার পানে

চাইল। বিস্ময়ের প্রচণ্ড আঘাতে সে যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

এ ঘরে কোন কিছু নেই। হাত বাড়ালে একখানা গামছা তোয়ালে নেই। কেশরের পরিবর্তনের দ্বিতীয় একখানা শাড়ি নেই। ব্লাউজ সায়া নেই। কোথাও আর নেই। যেখানে, যে-ঘরে ছিল সে ঘর চূর্ণ চূর্ণ হয়ে জলের নিচে তলিয়ে গেছে।

দেবশ্রী বিভ্রান্তের মত অসহায় দৃষ্টি দিয়ে কেশরের জলসিক্ত নগ্ন দেহটার পানে চেয়ে দেখল। মাথার চুল থেকে জল গড়িয়ে শুভ্র দেহের উপর অজস্র ধারা নেমেছে। তার গা-মাথা শুকিয়ে দিতে না পারলে নয়। ঘরে একখানা খাট আছে। তার উপর বিছানা নেই। খাটখানা দেবশ্রীর জন্যই এ-ঘরে আনা হয়েছিল। সেই থেকেই এখানে আছে। তার উপর স্তুপীকৃত বই খাতা। কোথাও একখানা শুকনো ন্যাকড়া পর্যন্ত নেই। হঠাৎ দেবশ্রী লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে পড়ল তার নিজের হোলডল স্যুটকেশের কথা। সে বাড়িতে পৌঁছেই উপরে উঠেছিল এবং কেশরের রেওয়াজ ঘরের দোরে স্যুটকেশ হোলডল রেখে কেশরের সন্ধানে ছুটেছিল।

হোলডল থেকে বড় একখানা তোয়ালে বের করে নিজের ভিজে ধুতিখানা ফেলে দিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল এবং আরেক খানা ধপধপে পাট করা তোয়ালে নিয়ে এসে কেশরের গা মুছিয়ে মাথার জটপাকানো চুলগুলো মুছিয়ে সযত্নে ঝেড়ে ঝেড়ে দুদিকে বিভক্ত করে ছড়িয়ে দিল। চুলের মাঝে অসংখ্য কুটো মাটি। গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলগুলো দুপাশের কাঁধ বেয়ে হাতের উপর লুটিয়ে পড়ল। কপালের ক্ষতচিহ্নটার উপর আলতোভাবে তোয়ালেটা চেপে শুকিয়ে দিল। তরপর আর একবার মুখখানি ভাল করে মুছিয়ে দিল। কেশর উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেবশ্রীর পানে তাকাল। তার চোখদুটি ছলছলিয়ে এলো মনে হল।

দেবশ্রী এইবার তার সায়ার দড়ির ফাঁসটা খোলবার জন্য

টানাটানি করতে লাগল। ভিজে দড়িটা নাভি নিম্নে তীব্র ভাবে বসে গেছে। ফাঁসটাও আঁট হয়ে গেছে। ফাঁসটা খুলে সে সায়াটা নিচে থেকে খুঁট ধরে টেনে নিল। কেশর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল। তার নিম্নাঙ্গের নিরাবরণ শুভ্রতা ও জানু জঙ্ঘার নিটোল সুকুমার গঠন দেখে দেবশ্রী মুগ্ধ হলো। তার মুগ্ধ চোখের প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিতলে একটা কঠিন লিপ্সার ভাব ফুটে উঠল। অথচ সে স্বচ্ছন্দে নির্লিপ্তের মত তোয়ালে দিয়ে তার গা থেকে কোমর পর্যন্ত সযত্নে সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিল। কেশরের মুখে একটা আপত্তি, লজ্জা ও বাধা ভাব ফুটে উঠে বিদ্যুতের মত মিলিয়ে গেল। দেবশ্রীর মনে হল কেশর সব কিছু দেখছে, বুঝছে, অনুভবও করছে, কিছুই প্রকাশ করতে পারছে না।

হ্যাঁ। সে দেখছে বই কি! দুচোখ ভরে দেবশ্রীকে দেখছে। অনুভব করছে বইকি দেবশ্রী তাকে পরলোকের ওপার থেকে মৃত্যুর করাল কবল থেকে ছিনিয়ে এনে তার গা থেকে মৃত্যুর নখর স্পর্শগুলো মুছিয়ে দিচ্ছে। বিস্মিত হচ্ছে ওর এই নগ্নতায় তাদের দুজনের কেউ লজ্জা পাচ্ছে না। কেউ সঙ্কুচিত হচ্ছে না। এটা যেন তাদের দৈনন্দিনতা। তারা যেন এতে অভ্যস্ত। এর মাঝে নতুনত্ব কিছু নেই। আর লজ্জা পাবেই বা কেন? এ দেহ তো তার নয়। বহু পূর্বেই এ দেহ সে মনেপ্রাণে দেবুকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। শুধু সুযোগ হয়নি নগ্ন দেহটা তাকে উপহার দেবার। তার ভোগের নৈবেদ্য করবার।

কেশর অপলকে দেবশ্রীর মুখের পানে চেয়ে আছে। দেবশ্রী তার নগ্ন দেহের সৌন্দর্যে ও স্পর্শে নিজের শীতল ও অবশ শরীরে একটা কাঁপুনি অনুভব করছে। অথচ তার দেহের উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। তার নিরাবরণ দেহের এ অনুপম সুষমা তো কোনদিন তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। হঠাৎ কেশরের চোখ দুটি জলে ভরে এলো। সে যেন নিজের অবস্থাটা সমস্ত বুঝতে

পেরে লজ্জায় দিশেহারা হয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, দেবু! দেবু!

সঙ্গে সঙ্গে আবরণের মত দেবশ্রীকে জড়িয়ে ধরে সে লজ্জা নিবারণ করতে চাইল।

দেবশ্রী তাকে বুকে চেপে ধরে আশ্বাসের গুঞ্জন তুলল, আমি—আমি কেশর!

সঙ্গে সঙ্গে কেশর তার হাত থেকে তোয়ালে খানা টেনে নিয়ে নিজের নাভি নিম্নে চাপা দিল।

দেবশ্রী তার বগলে হাত দিয়ে আকর্ষণ করে বুকে তুলে নিতে গেল, বললে, চলো ও-ঘরে গিয়ে তোমায় চাপা দিয়ে ফরাশে শুইয়ে দিই।

কেশর তার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, চলো, আমি যেতে পারবো।

নিঃশব্দে যুগল অরণ্য দম্পতির মত আধ-আঁধার ঘর পেরিয়ে ছুজনে রেওয়াজ ঘরে গিয়ে ঢুকল।

নিচে পৈশাচিক অট্টহাসির মত অশ্রান্ত জলকল্লোল শোনা যাচ্ছে। বজ্রপতন শব্দের মত আবার একটা প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আঘাতে বাড়িখানা ছুলে উঠল। একসঙ্গে এক পাল জলহস্তি যেন বাড়িটার গায়ে ধাক্কা দিল। বাড়িখানার অস্থিপঞ্জর গুড়িয়ে গেল মনে হলো। খোলা দরজা জানালা দিয়ে জলকণা এসে তাদের গায়ে ছড়িয়ে পড়ল।

কেশর একটা আর্তস্বরে দেবশ্রীকে জড়িয়ে ধরল। সে কাঁপছে। তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। কাঁপছে তার দেহের অনুপরমানু।

—বাড়িখানা পড়ে যাবে নাকি?

—বলা যায় না। যেতেও পারে। নাও পারে। এ-দিকটা মজবুত। আমাদের পরমায়ু থাকলে বাড়ি আমাদের অটুট থাকবে। আমরা বাঁচবো। কিন্তু আমাদের ছুয়ের জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।